# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৯

দ্বাবিংশতি বর্ষ : জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-০৬৬০

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

## বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৯

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

## ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

### জানুয়ারী হইতে জুন ১৯৬৯

## চিত্র-সূচী

# বিবিধ

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা সানন্দে জানাইতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য **'বিজ্ঞান-বিকাশ'** নামক সাধারণ বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যপুস্তক বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক রচিত হইয়াছে এবং ইহা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের যে আদর্শ পালনে পরিষদ নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহারই সফল রূপায়নের পরিপূরক হিসাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হইয়াছে। পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা সম্বলিত এই পুস্তকে পাঠ্য বিষয়গুলি যথোচিত সরল ভাষায় ও সহজভাবে পরিবেশিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, ইহার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা কৈশোরেই বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় লাভ করিতে পারিবে।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান মেসার্স ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং পাঠ্য পুস্তকখানার প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। মূল্য ধার্য হইয়াছে প্রতি কপি ৪'০০ (চার) টাকা মাত্র।

পরিষদের সভ্য-সভ্যা, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা এবং বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন পরিষদের এই শুভ প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ প্রকাশিত উক্ত পুস্তকটির প্রচার ও প্রসারের জন্য সাধ্যানুসারে উদ্যোগী হন এবং পুস্তকটি সম্পর্কে তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত জানাইয়া পরবর্তী সংস্করণে ইহার মানোন্নয়নে পরিষদ-কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেন। ইতি—

পরিষদ কার্যালয়
২৯৪/২/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯ (ফোন: ৩৫-২৯১৪)
১লা জানুয়ারী, ১৯৬৯

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৬৯ | প্রথম সংখ্যা


## নববর্ষের নিবেদন

মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়া ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তদবধি সীমিত ক্ষমতা এবং নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আনন্দের কথা এই যে, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' একবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া বর্তমান বর্ষে দ্বাবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষ্যে আমরা সভ্য-সভ্যা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদিগকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে গঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের যে সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশ করিয়াছিল. আজ দীর্ঘ দুই দশক পরে দেশের অধিকাংশ লোক, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার সেই আদর্শের অনুবর্তী হইয়াছেন। সরকারী উদ্যোগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহযোগিতায় উচ্চস্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন এবং তাহা প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিলম্বে হইলেও এই মহান প্রচেষ্টায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', তথা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শেরই জয়ই সূচিত হইতেছে।

এই কথা বোধ হয় এখন আর কেহই

অস্বীকার করিবেন না যে, বর্তমান যুগে কোন দেশের উন্নতির জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন এবং এই শিক্ষার সর্বস্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হইতেছে মাতৃভাষা। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের উন্নতির যে সকল কারণ দেখা যায়—তন্মধ্যে অন্যতম হইতেছে ব্যাপক বিজ্ঞান-শিক্ষা এবং জ্ঞান বিস্তারের সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার। অধুনা পৃথিবীর অনেক পশ্চাদপদ দেশেও সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। আমাদের দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার আদর্শ নীতিগতভাবে কেহ কেহ গ্রহণ করিলেও এতদিন পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। আর এখন পর্যন্তও বাধ্যতামূলকভাবে মাতৃভাষা, তথা বাংলা ভাষায় উচ্চস্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়ায় মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্ভব নহে, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ এই আদর্শের প্রতি উদাসীন বা উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাধ্যতামূলক না করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন বা নূতন কিছুর প্রচলন করিলে কেবলমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের আদর্শগত প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহা তাহা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিতে চায় না। অবশ্য পরিবর্তন বা নূতন কিছু প্রচলন করিবার পূর্বে সর্বাগ্রে সেই সম্পর্কিত অসুবিধাগুলি দূরীকরণের উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

একবিংশতি বর্ষ যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রচার-সংখ্যা ব্যাপকভাবে না হইলেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। স্কুল, কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতির গ্রাহক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ছাত্র-ছাত্রী এবং বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর ক্রমবর্ধমান সমাদর লক্ষণীয়। এই পত্রিকার প্রবন্ধাদির উৎকর্ষে আকৃষ্ট হইয়া ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের NCERT সংস্থা ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব এড়ুকেশন-এর 'স্কুল সায়েন্স' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' হইতে একটি করিয়া প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত লোকরঞ্জক পুস্তকাবলীর সমাদরও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' পুস্তকের অংশবিশেষ স্কুলপাঠ্য বিষয়বস্তুর অন্যতম হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান পরিষদ এই বৎসর 'বিজ্ঞান-বিকাশ' নামক যে পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন, আমরা আশা করি তাহাও শিক্ষাবিদ্‌গণের সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান-শিক্ষার পথ কিছুটা অন্ততঃ সুগম করিবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর লেখক-লেখিকাদের প্রতি পুনরায় একটি আবেদন জানাইতেছি— 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মূলতঃ সাধারণ লোকের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের গবেষণা-পত্র প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষায় কোন পত্রিকা না থাকায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' কখনও কখনও এইরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, তবে কেবলমাত্র বিশেষ উপলক্ষে বা বিশেষ ক্ষেত্রেই তাহা করা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ এমনভাবে নির্বাচন করা প্রয়োজন—যাহাতে পাঠক-পাঠিকারা সহজেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। প্রবন্ধের ভাষা অবশ্যই জটিলতাবর্জিত এবং সহজ-সরল হওয়া প্রয়োজন।

অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমরা জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইব না—ইহা আমরা একান্তভাবে কামনা করি। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই আমাদের যাত্রাপথের পাথেয়।

# জীবন-রহস্য সমাধানে খোরানার অবদান

রাধাকান্ত মণ্ডল

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা, ডক্টর মার্শাল নিরেনবার্গ ও ডক্টর রবার্ট হলি ১৯৬৮ সালে শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। যদিও এঁরা তিনজনেই মার্কিন নাগরিক, তবুও ডক্টর খোরানা ভারতীয় বলে আমরা গর্ববোধ করছি, কারণ তাঁর জন্ম ও শিক্ষালাভ ভারতেই হয়েছিল। ডক্টর খোরানা এক সময়ে উপযুক্ত চাকুরী না পেয়ে এদেশ ত্যাগ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি দেশে থাকলে হয়তো তাঁর গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা ভারতের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হতো না। ফলে তিনি আজ যে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অবদান রাখতে পেরেছেন তাও সম্ভব হতো না। তাই তাঁর বিদেশ গমনের জন্যে দুঃখ না করে যে সব বৈজ্ঞানিক এদেশে আছেন তাঁরা যদি প্রেরণা পান ডক্টর খোরানার সাধনা থেকে এবং দেশে যাঁরা বিজ্ঞান-গবেষণার নীতি ইত্যাদি নির্ধারণ করেন, সেই কর্ণধারগণ যদি যথাযোগ্য পন্থা অবলম্বন করেন তবেই ডক্টর খোরানাকে সম্মান দেখানো হবে। শুধু অভিনন্দন বা তারবার্তা পাঠিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না।

এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বিজ্ঞানী তিনজনের জীবনী আলোচনা করবো না. শুধু তাঁদের বৈজ্ঞানিক অবদান সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো। এঁদের কাজ, বিশেষ করে ডাঃ খোরানার কাজ ও তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল বুঝতে হলে আমাদের আরও অনেক আগে থেকে সুরু করতে হবে। আরও অনেক রাসায়নিক ও জীব-বিজ্ঞানীর কাজের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে এঁদের কাজ দেখলে বুঝতে সুবিধা হবে।

তাহলে সুরু করা যাক এই শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে। তার আগেই জানা ছিল যে, কোন জীব এক বা একাধিক কোষের সমষ্টি। একটা বহুকোষী জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণী) সবকিছু নির্ভর করে তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষগুলির সুনিয়ন্ত্রিত কর্মধারার উপর। আবার জীবকোষ, তথা সমগ্র জীবের কার্যাবলী—বৃদ্ধি, পুষ্টি, প্রজনন, বংশানুক্রমিতা প্রভৃতি নির্ধারিত হচ্ছে জীবকোষে অবস্থিত জিন বা বংশগতি-নিয়ামক দ্বারা। এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী বিজ্ঞানী অ্যাভারি, বিড্‌ল্, টেটুম ও লেডারবার্গের গবেষণার ফলে এটা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ জিন বা বংশগতি-নিয়ামক হচ্ছে জীবকোষে অবস্থিত একটি অম্লধর্মী যৌগ। নাম ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic acid) বা সংক্ষেপে DNA (কোষের কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে থাকে বলেই নাম নিউক্লিক অ্যাসিড)। কোন জীবের জন্মের সুরুতে যে একটি মাত্র ডিম্বাণু ও একটি মাত্র শুক্রাণুর মিলনে একটি নিষিক্ত কোষ উৎপন্ন হয় তাতেও মাতৃজিন ও পিতৃ-জিনের মিলন, আসলে DNA-এরই মিলন। এই মিলিত জিন সমষ্টি বা DNA নির্ধারণ করবে ঐ এক কোষ থেকে বহুকোষী পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হওয়া ও তার আকৃতি ও গুণা-গুণের বৈশিষ্ট্য, যেগুলিকে আমরা বলি উত্তরাধি-কার সূত্রে প্রাপ্ত। DNA-এর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের আবিষ্কার এত দেরীতে হলেও এর

অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়েছিল কিন্তু অনেক আগে; ১৮৭০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী মিশার এই আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৪০ সালের আগে ও পরে বিজ্ঞানী সার্গাফ ও আরও অনেকের কাজের ফলে বিভিন্ন জীবকোষ থেকে প্রাপ্ত DNA-এর রাসায়নিক বিশ্লেষণ বিশদভাবে জানা যায়।

tide)। একটি নিউক্লিওটাইডে থাকে একটি জৈব ক্ষারক, একটি পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা (Deoxyribose) ও একটি ফস্‌ফরিক অ্যাসিড অণু। ফস্‌ফরিক অ্যাসিড পাশাপাশি দুটি নিউক্লিওটাইডের শর্করাকে ডাইএষ্টার (Diester) বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। এই ভাবে অনেক নিউ-
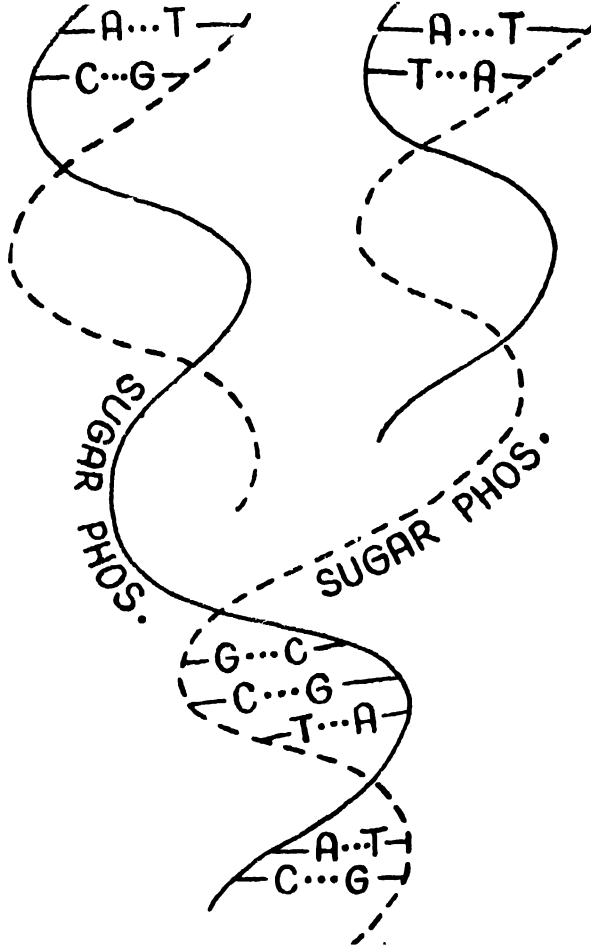
১নং চিত্র

একটি দ্বিশৃঙ্খল DNA থেকে দুটি অনুরূপ দ্বিশৃঙ্খল হবার কৌশল।

DNA হচ্ছে একটি অতিকায় অণু (Macromolecule), যেটা আবার হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক অণুর সমষ্টি। এই ক্ষুদ্র একক অণুগুলিকে বলা হয় নিউক্লিওটাইড (Nucleo-

ক্লিওটাইড পর পর জুড়ে থাকে। DNA-তে থাকে চার রকমের জৈব ক্ষারক—অ্যাডেনিন (A), গুয়েনিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T)। এই ক্ষারকগুলির বিশেষত্ব

হলো এই যে, A সব সময় T-র সঙ্গে এবং G সব সময় C-র সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। ক্ষারকগুলির এই ধর্ম, DNA-তে A-T ও G-C যুগলের ক্ষারকগুলির সমতুল্য পরিমাণে অবস্থিতি (অর্থাৎ A-র পরিমাণ সব সময় T-র সমান) এবং উইলকিন্স কর্তৃক DNA-র এক্স-রে বিশ্লেষণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক যৌথভাবে DNA-এর এক যুগান্তকারী গঠন-বৈচিত্র্য বা মডেলের প্রস্তাব করেন। এই মডেলের নাম Double-helix বা দ্বিশৃঙ্খল কুণ্ডলী। এই কাজের জন্যে পরে ওয়াটসন-ক্রিক-উইলকিন্সকে মিলিতভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই ত্রিমাত্রিক মডেল অনুযায়ী দ্বিশৃঙ্খল DNA-এর প্রধান সূত্র দুটি তৈরি—শর্করা. ফস্‌ফেট-শর্করা-ফস্‌ফেট—এই বন্ধন দিয়ে। আর ঘোরানো সিঁড়ির মত একের উপরে অপরে জড়ানো এই সূত্র দুটি আড়াআড়িভাবে পর পর A-T বা G-C ক্ষারকযুগ্ম দিয়ে যুক্ত। এই DNA-এর একটি শৃঙ্খল অপরটির ঠিক অনুপূরক প্রতিলিপি। তাই এই মডেল অনুযায়ী কোষ বিভাজনের সময় একটা DNA থেকে ঠিক ঠিক দুটি প্রতিরূপ তৈরি হতে বিশেষ ভুল হবে না। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আগেই বলা হয়েছে—একটি জীবকোষ বা পুরো জীবটির সমস্ত কাজ DNA-এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। সেটা কি ভাবে হয় দেখা যাক। DNA কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নিজে নিজে সব কাজ করে না। জীবদেহে সমস্ত কাজ, তথা রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংঘটিত হয় বিশেষ বিশেষ জৈব অনুঘটক বা এন্‌জাইমের সহায়তায়। এই এন্‌জাইমগুলি হচ্ছে প্রোটিন আবার এন্‌জাইমের ক্ষমতাবিহীন গঠনমূলক প্রোটিনও জীবদেহে প্রয়োজন, যেমন—আমাদের চুল, মাংসপেশী বা তন্তুর প্রোটিন ইত্যাদি। সব রকম প্রোটিনই অতিকায় অণু (অবশ্য DNA থেকে অনেক ছোট) এবং কুড়িটি প্রাকৃতিক অ্যামিনো অ্যাসিড মিলে তৈরি হয়। কোন প্রোটিনে গ্লাইসিন, লাইসিন, লিউসিন প্রভৃতি কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ ও বিশেষ করে তাদের পর পর সজ্জাক্রমের (Sequence) উপর ঐ প্রোটিনের ধর্ম ও কার্যকারিতা নির্ভর করে। DNA-ই সব সময় ঠিক করবে দেহের কোষে কখন কোথায় কোন্ এন্‌জাইম কতটা তৈরি হবে ও কতক্ষণ কি হারে কাজ করবে—ইত্যাদি; অর্থাৎ এক কথায় সমগ্র জীবদেহের কাজ মিলে একটা অর্কেষ্ট্রা হলে বিভিন্ন এন্‌জাইম প্রোটিন হচ্ছে বিভিন্ন যন্ত্রী আর DNA হচ্ছে ব্যাণ্ড মাষ্টার বা পরিচালক। এই এন্‌জাইম ও অন্যান্য প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রম নির্ধারিত হয় DNA-এর দ্বারা। DNA-এর মধ্যেই এদের নিজ নিজ স্থান নির্ধারণের রাসায়নিক সঙ্কেত নিহিত আছে। জিনের এই গোপন সাঙ্কেতিক ভাষাই হচ্ছে জেনেটিক কোড (Genetic code)।

একটি বিশুদ্ধিকৃত প্রোটিনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সজ্জাক্রম রাসায়নিক উপায়ে বের করবার পদ্ধতি এই শতকের ষষ্ঠ দশকেই আবিষ্কৃত হয়। সর্বপ্রথম ইনসুলিন নামক হর্মোন প্রোটিনের এই সজ্জাক্রম আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার পান বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যাঙ্গার। আবার প্রোটিনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির দ্বিমাত্রিক সংগঠন আবিষ্কার করে আমেরিকার পাউলিং (যিনি পরে আর একবার শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কারও পান) রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। অল্প পরেই বৃটিশ বিজ্ঞানী কেনড্ ও পেরুৎস প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক সংগঠন আবিষ্কার করে এই পুরস্কারে ভূষিত হন। এই দশকেরই শেষদিকে জীবকোষ থেকে প্রয়োজনীয় এন্‌জাইম ও কণিকাসমূহ নিয়ে পরীক্ষাগারে

প্রোটিন সংশ্লেষণের কৌশল আয়ত্ত হয় হোগল্যাণ্ড, জামেসনিক প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চেষ্টায়। এঁদের কাজের ফলে জানা যায়, পরীক্ষানলে প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্যে প্রয়োজন রাইবোজোম কণিকা, প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড, এন্‌জাইম ইত্যাদি ও তাছাড়াও এক ধরণের ছোট ছোট নিউক্লিক অ্যাসিড যা থাকে কোষের কণিকাবিহীন দ্রবীভূত অংশে। এদের নাম দ্রবণীয় RNA বা sRNA (soluble ribonucleic acid)। এই RNA-ও অনেকটা DNA-গোত্রীয় অতিকায় অণু (যদিও আকারে অনেক ছোট—আশীটির মত নিউক্লিওটাইড জুড়ে তৈরি)। আর এই RNA-তে আছে ডিঅক্সিরাইবোজের বদলে রাইবোজ ও একটি ক্ষারক থাইমিনের বদলে ইউরাসিল (U)। অবশ্য ইউরাসিলের হাইড্রোজেন বন্ধনী ধর্ম T-র মতই অর্থাৎ U শুধু A-র সঙ্গেই আবদ্ধ হতে পারে। পরে আমরা দেখবো এই sRNAগুলি এক-একটা অ্যামিনো অ্যাসিডকে বেঁধে রাইবোজোমের গায়ে নিয়ে যায়। তাই এদের নাম বাহক RNA হতে পারে। এন্‌জাইমের উপস্থিতিতে একটা বিশেষ sRNA একটা বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডকেই বেঁধে নিতে পারে। তাই ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রত্যেকের জন্যে বিশেষ sRNA আছে।

ষষ্ঠ দশকেই আবিষ্কৃত হলো দুটি গুরুত্বপূর্ণ এন্‌জাইম। আমেরিকায় কর্ণবার্গ আবিষ্কার করলেন DNA পলিমারেজ, যা ঐ ক্ষুদ্র নিউক্লিওটাইডগুলি থেকে একটি ছাঁচের অনুরূপ DNA পরীক্ষানলে তৈরি করতে পারে। আর ওচোয়া আবিষ্কার করলেন পলিনিউক্লিওটাইড ফস্‌ফরিলেজ—যা RNA-এর উপাদান নিউক্লিওটাইডগুলিকে জুড়ে দিয়ে RNA-এর মত বিভিন্ন বৃহৎ অণু তৈরি করতে পারে। এই কাজের জন্যে ওচোয়া ও কর্ণবার্গকে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯৫৯ সালে। তখন পর্যন্ত কিন্তু DNA থেকে প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম নির্ধারণের বার্তা কি করে আসছে, তা জানা যায় নি। তাই আর একরকম RNA-এর ডাক পড়লো মধ্যস্থ হিসাবে, যার নাম দেওয়া হলো বার্তাবহ RNA বা mRNA (messenger)। এই বার্তাবহ RNA DNA-এর ছাঁচ থেকে বেস পেয়ারিং (Base piaring) পদ্ধতিতে অনুরূপ রাসায়নিক সঙ্কেত নিয়ে আসবে রাইবোজোম কণায়। এই RNA-তে তিনটি তিনটি নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম (যা DNA-তে কোন অংশে অনুরূপ ছিল) ঠিক করবে এক-একটা অ্যামিনো অ্যাসিডের দাঁড়াবার জায়গা। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি আবার আসবে sRNA-র কাঁধে ভর করে। m-RNA-তে সাজানো থাকবে পর পর ত্রয়ী কোড। আর sRNA-এর কোন অংশে থাকবে বিপরীত ত্রয়ী অর্থাৎ anticode। প্রতিসঙ্কেত সঙ্কেতের জায়গায় দাঁড়াবেই রাসায়নিক বার্তার নির্ভুল পাঠোদ্ধার হবে। ২নং চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। DNA থেকে RNA-তে সঙ্কেত গ্রহণের এই প্রথম ধাপের নাম প্রতিলেখন (Transcription) এবং RNA থেকে sRNA-এর মাধ্যমে অ্যামিনো অ্যাসিডের স্থান নিরূপণ হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ অনুবাদকরণ (Translation)।

১৯৬১ সালে আমেরিকার কয়েকটি পরীক্ষাগারে একই সঙ্গে প্রতিলেখন বা প্রথম ধাপের জন্যে দায়ী এন্‌জাইম RNA পলিমারেজ আবিষ্কৃত হলো, যা DNA থেকে অনুরূপ বার্তা নিয়ে বার্তাবহ RNA তৈরি করতে পারে। আরও বিশদভাবে পরীক্ষানলে প্রোটিন সংশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমেরিকার ন্যাশান্যাল হার্ট ইনষ্টিউটের মার্শাল নিরেনবার্গ দেখলেন রাইবোজোম, sRNA ইত্যাদি ছাড়াও এই m-RNA না হলে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি জুড়ে প্রোটিন তৈরি হয় না। তিনি পরীক্ষানলে

প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণের সঙ্গে শুধু U-নিউক্লিওটাইড নিয়ে তৈরি অতিকায় Poly U (RNA-এর মত পদার্থ, যাতে পর পর···UUU···নিউক্লিওটাইডই আছে) দিয়ে দেখলেন সে ক্ষেত্রে মাত্র একটিমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড ফিনাইলঅ্যালানিন পর পর জুড়ে প্রোটিনের মত বস্তু পলিফিনাইল অ্যালানিন তৈরি হয়। ১৯৬১ সালের অগাষ্ট মাসে মস্কোতে পঞ্চম নিরেনবার্গ দিলেন প্রথম সঙ্কেতের সন্ধান—UUU ত্রয়ী হচ্ছে ফিনাইল অ্যালানিনের সঙ্কেত।

এর পরে ওচোয়ার আবিষ্কৃত এনজাইম পলিনিউক্লিওটাইড ফস্‌ফরিলেজের সহায়তায় RNA-এর চারটি নিউক্লিওটাইডের এক বা একাধিকের সমন্বয়ে অনেক কৃত্রিম RNA তৈরি হলো এবং ওচোয়া ও নিরেনবার্গের পরীক্ষাগারে পৃথকভাবে সেগুলি দিয়ে প্রোটিন সংশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ
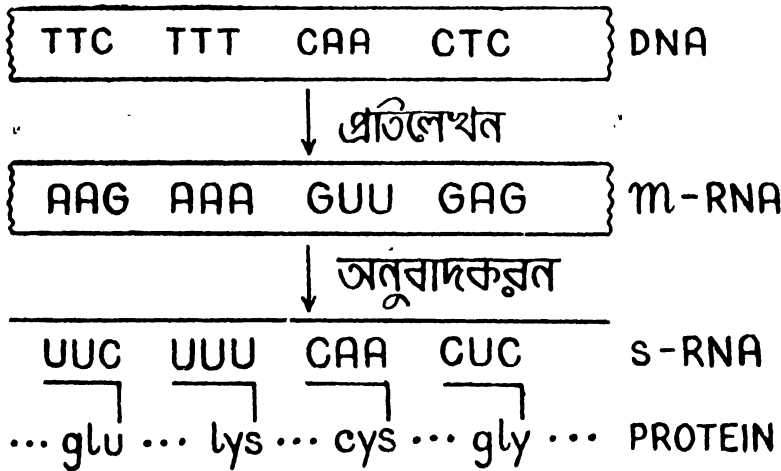
২নং চিত্র
জিনের বার্তা-সঙ্কেতের পাঠোদ্ধার।

আন্তর্জাতিক প্রাণরসায়ন কংগ্রেসে (এটা তিন বছর অন্তর অনেকটা অলিম্পিকের মত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়) নিরেনবার্গ যখন এই বার্তা ঘোষণা করলেন, তখনই বিশ্বের জীব-বিজ্ঞানীরা বুঝলেন Genetic code বা জিনের সঙ্কেত বোঝবার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হলো। এই স্বল্পখ্যাত তরুণ বৈজ্ঞানিক সেদিনই জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন। এর আগেই অনেক রকম অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে মনে করা হয়েছিল, একটি অ্যামিনো অসিডের কোড হবে নিউক্লিওটাইডের ত্রয়ী (Triplet)। অতএব করে প্রায় প্রত্যেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্কেতের ত্রয়ীর সন্ধান মিললো। তখনও কিন্তু ত্রয়ীগুলিতে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম জানবার উপায় বের হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, AUU তিনটি মিলে লিউসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের কোড এটা জানা গেল। কিন্তু এরা AUU, UUA না UAU হয়ে সাজানো থাকবে, তা জান যায় নি। ১৯৬৪ সালে নিরেনবার্গ আর একটা পদ্ধতি বের করলেন, যাতে বড় RNA-এর বদলে জানা সজ্জাক্রমযুক্ত শুধুমাত্র ত্রয়ীর সাহায্যে রাইবোজোমের গায়ে একটা sRNA-বাঁধা

অ্যামিনো অ্যাসিডকে টেনে আনা যায়। এই-ভাবে কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের কোডের সজ্জাক্রমও জানা গেল। ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বায়োকেমিষ্ট্রি কংগ্রেসে প্রায় সবকয়টি সম্ভাব্য কোডই জানা গেছে—খবর পাওয়া গেল, কিন্তু তখনও বেশীর ভাগ কোডের সজ্জাক্রম জানা যায় নি।

আমরা আগেই ধরে নিয়েছি, কোডের উল্টো সঙ্কেত (Anticode) থাকবে sRNA-তে, যেটা অ্যামিনো অ্যাসিডের স্থান নির্ণয় করবে। কিন্তু কোন প্রাকৃতিক RNA-এর নিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রম বের করবার কোন উপায় না থাকায় এর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। ষষ্ঠ দশকের শেষার্ধ থেকে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্পখ্যাত প্রচারবিমুখ বিজ্ঞানী রবার্ট হলি প্রায় আট বছর ধরে নীরবে কাজ করে আস-ছিলেন—কোন একটি sRNA-এর নিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রম পুরাপুরিভাবে জানতে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ একটি sRNA আলাদা করবার জন্যে তিনি বিপরীতমুখী স্রোতে দ্রাবক নিষ্কাশন (Counter-current extraction) পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার করে বিশুদ্ধ অ্যালানিন অ্যামিনো অ্যাসিডের বাহক sRNA প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। এটাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কঠোর অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এই sRNA-এর সজ্জাক্রম বের করেন। ১৯৬৫ সালে 'সায়েন্স' পত্রিকায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মাধ্যমে বিশ্ববাসী জানলো—এই প্রথম একটি প্রাকৃতিক নিউক্লিক অ্যাসিডের সজ্জাক্রম জানা হয়ে গেছে। মনে আছে, ঐ সময় আমি পিটস্‌বার্গে, এক রবিবার সকালে 'সায়েন্স' পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধ দেখি, শনিবারের শেষ বোধ হয় ওখানা এসে থাকবে। ওটা পড়ে খবর দিতে অধ্যাপকের ঘরে গেলাম, তাঁর চমক ও উত্তেজনা দেখে বোঝলাম, আমি যতটা বুঝেছি, তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব এই কাজের। তবুও রবার্ট হলি সে সময় এত অল্পখ্যাত যে, ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত আমেরিকার জীব-বিজ্ঞান সমিতিগুলির বার্ষিক যৌথ অধিবেশনে নিউক্লিক অ্যাসিড সম্বন্ধীয় বিশেষ আলোচনা চক্রে তাঁর নাম ছিল না। খোরানার নাম বক্তৃতা-সূচীতে অবশ্যই ছিল। তাড়াতাড়ি সম্মিলিত বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে হলিকে বিশেষ বক্তা হিসাবে এই সভায় তাঁর ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানান। তখন হলিকে দেখে মনে হয়েছিল, এক অতি সাধারণ অমায়িক স্বল্পভাষী ভদ্রলোক, যেন কোন নিরীহ স্কুল-শিক্ষক, কোন আড়ম্বর নেই, কোন দাবী নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে—মাত্র গত বছরই হলিকে আমেরিকার ন্যাশান্যাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। হলির প্রথম আবিষ্কারের পরে অবশ্য আরও অনেকগুলি sRNA-এর সজ্জাক্রম জানা হয়ে গেছে। এদের মধ্যে নিউক্লিওটাইডগুলির বিশেষ সজ্জাক্রম থেকে sRNA-এর একটি আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে এক জায়গায় কোডের উল্টো প্রতিসঙ্কেত ত্রয়ী আছে।

জেনেটিক কোডের পুরাপুরি এবং নির্ভুল-ভাবে পাঠোদ্ধার করলেন খোরানা। বৃটিশ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী সার আলেক-জাণ্ডার টডের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডক্টর খোরানা কয়েক বছর ক্যানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কাটিয়ে পাকাপাকিভাবে এলেন আমেরিকার উইস্‌কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্‌জাইম রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অন্যতম ডিরেক্টর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে। ইতিমধ্যে তিনি অল্প কয়েকটি নিউক্লিওটাইড জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে জুড়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। চেষ্টা চললো, ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সজ্জাক্রমের বড় বড় কৃত্রিম বার্তাবহ RNA তৈরি করবার। জৈবরাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তিনি পুনরাবৃত্ত

সজ্জাক্রমের (Repeating sequence) ছোট ছোট DNA তৈরি করলেন, যাতে দশ থেকে ষোলটি নিউক্লিওটাইড-যুগল আছে। পরে এন্‌জাইম DNA পলিমারেজের সহায়তায় এই ছোট DNA-এর ছাঁচে অনেক বড় বড় DNA তৈরি করলেন, যার মধ্যেও ঐ পুনরাবৃত্ত সজ্জাক্রম বর্তমান। এখন ঐ বড় বড় DNA-কে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করে এন্‌জাইম RNA পলিমারেজের সাহায্যে কৃত্রিম বার্তাবহ RNA তৈরি হলো, যাদের মধ্যে ঐ জানা পুনরাবৃত্ত সজ্জাক্রম বর্তমান। এখন এদের সাহায্যে এই পথে অগ্রসর হয়ে সম্পূর্ণ কোড জানবার চেষ্টার কথা ঘোষণা করেন। দু-বছরের মধ্যেই ১৯৬৭ সালের অগাষ্ট মাসে টোকিওতে অনুষ্ঠিত সপ্তম আন্তর্জাতিক বায়োকেমিষ্ট্রি কংগ্রেসে তাঁর বিশেষ বক্তৃতায় শোনলাম এই ভাবে পুনরাবৃত্ত দুই, তিন ও চার নিউক্লিওটাইড সমন্বিত বিভিন্ন কৃত্রিম বার্তাবহ RNA-এর সাহায্যে পূর্ব ধারণানুযায়ী সব কয়টি অ্যামিনো অ্যাসিডের সবকয়টি সম্ভাব্য কোডের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার শেষাংশে আরও একটি চমকপ্রদ খবর অপেক্ষা করছিল। খুব হাল্কা সুরেই তিনি তাঁর সাম্প্রতিক-

```
    1      2      1      2
•••UCU   CUC   UCU   CUC•••
                ↓
•••ser•••leu•••ser•••leu•••
```
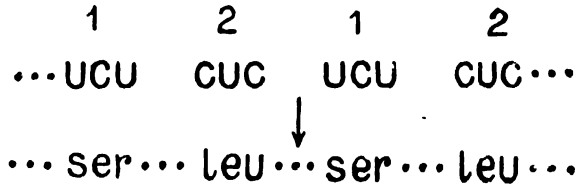
৩নং চিত্র

পুনরাবৃত্ত দ্বিনিউক্লিওটাইড RNA দিয়ে দুই অ্যামিনো অ্যাসিডযুক্ত প্রোটিন সংশ্লেষণ।

পরীক্ষাগারে প্রোটিন তৈরি করে তাদের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম বিশ্লেষণ করতে পারলে RNA-এর কোন্ সজ্জাক্রমের নির্দেশে কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিড স্থান নিয়েছে জানা যাবে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ধরা যাক, একটা পুনরাবৃত্ত দ্বিনিউক্লিওটাইড সজ্জাক্রমযুক্ত RNA ...UCUCUC. দিয়ে প্রোটিন তৈরি করা হলো। এতে UCU এবং CUC এই দুটিমাত্র সম্ভব সজ্জাক্রম পুনরাবৃত্ত আছে। পরীক্ষায় দেখা গেল, এই RNA দিয়ে সংশ্লেষিত প্রোটিনে শুধু অ্যামিনো অ্যাসিড সেরিন এবং লিউসিন পর পর থাকে (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

অতএব সেরিন ও লিউসিনের সঙ্কেতের সজ্জাক্রম নির্ভুলভাবে জানা গেল। ১৯৬৫ সালের ফেডারেশন মিটিং-এর আলোচনা-চক্রে খোরানা



তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার কথা বললেন। সেটা হচ্ছে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে একটি অর্থবহ সম্পূর্ণ জিন তৈরি করা। প্রথম চেষ্টা হিসেবে এর জন্যে তিনি বেছে নিয়েছেন একটি ছোট জিন (যা অ্যালানিন-sRNA তৈরির ছাঁচ)। এই RNA-এর কতকগুলি টুকরার অনুরূপ DNA তিনি জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে তৈরি করে পরে এন্‌জাইমের সহায়তায় জুড়ে দিয়ে পুরা DNA তৈরি করবেন। এই পথে তিনি অনেকটা অগ্রসরও হয়েছেন। খুব শীঘ্রই আমরা জানতে পারবো, পরীক্ষাগারে প্রাকৃতিক জিন প্রস্তুত সম্ভব হয়েছে।

এখন এই আবিষ্কারের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে শেষ করছি। ভবিষ্যতে এইভাবে আরও অনেক জিন পরীক্ষাগারে তৈরি করা সম্ভব হবে। এভাবে প্রস্তুত সুস্থ ও

স্বাভাবিক জিন মানুষের ( বা অন্য জীবের ) দেহে ঢুকিয়ে অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটির প্রতিকার সম্ভব হবে। এটারই নাম দেওয়া হয়েছে 'জেনেটিক সার্জারি'। নিরেনবার্গের মতে—পঁচিশ বছরের মধ্যেই এভাবে কৃত্রিম বা স্বাভাবিক জিনের প্রয়োগ মানুষের আয়ত্তে আসবে। জিনের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণের কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্তে এলে এখনও পর্যন্ত দুর্জ্ঞেয় জিনের বিনিয়ন্ত্রণ ( যার ফলে ক্যান্সার জন্মায় মনে করা হচ্ছে )—রোধ করা যাবে। এরূপ আরও অনেক মঙ্গলকর কাজে এই আবিষ্কারকে লাগানো যাবে। তবে এর অপব্যবহারের সম্ভাবনাও আছে। পারমাণবিক শক্তি যেমন মানুষ শান্তির কাজে লাগিয়েছে, তেমনি ধ্বংসের কাজেও লাগিয়েছে। তেমনি ভবিষ্যতে মানুষ ইচ্ছামত জীবজগতের ও মানুষের জিন, এককথায় তার কর্ম-ভাবনা সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তখন হিটলারী মনোভাবসম্পন্ন কোন এক নায়ক বা সমাজ-বিজ্ঞানী একটা পুরা মানব-গোষ্ঠীর দেহ ও মন নিয়ে যা ইচ্ছা খেলা করতে পারবে। তবে আমরা আশা করবো, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও সমাজবিদ্গণ এই বিষয়ে এখন থেকেই যথেষ্ট অবহিত হয়ে এই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা যাতে চিরতরে দূরীভূত হয়, তার জন্যে সচেষ্ট হবেন।

# আমাদের খাদ্যে শাক-সব্জি ও ফল-মূল

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

বর্তমান যুগে অবস্থার চাপে বাঙালীর দৈনন্দিন খাদ্যে উদ্ভিজ্জ খাদ্যগুলিই মুখ্য উপাদান। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রিয় এবং সর্বকালীন অভ্যস্ত উপাদানগুলি আজকাল দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হবার ফলে বাঙালী জনসাধারণের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সেগুলি প্রায় আকাশ-কুসুমেরই মত। তাই তাদের আজ সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করতে হয় উদ্ভিজ্জ উপাদান—চাল, গম, চিনি ও তরিতরকারীর উপর। এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি আবার রেশনের আওতায় থাকায়, খোলা বাজারে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং বাকী থাকে যে তরিতরকারী ও ফল-মূল, সেগুলি অগ্নিমূল্য হলেও দুষ্প্রাপ্য নয় বলে আমাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্যে বহুলাংশেই নির্ভর করতে হয় ঐ জাতীয় খাদ্যের উপর। সে জন্যেই তাদের পৌষ্টিক মূল্য সম্বন্ধে কতকটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

অনেকের ধারণা, শাক-সব্জি ও ফল মূলের বিশেষ কোন পৌষ্টিক মূল্যই নেই, কেন না—মাংসাশী বাঘ, সিংহের তুলনায় তৃণভোজী গরু, ছাগল প্রভৃতি দৈহিক শক্তিতে অনেকটা নিকৃষ্ট এবং স্বভাবেও কতকটা গোবেচারী ধরণের হতে বাধ্য। কিন্তু কথাটা কি সত্য? উদ্ভিদভোজী হাতী কতকটা শ্লথ গতি হলেও দেহের শক্তিতে কিংবা বুদ্ধিতে মাংসাশী যে কোন প্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয় কি? আবার ক্ষিপ্রগতিতে হরিণ ও ঘোড়া—এমন কি, ক্ষুদ্র প্রাণী খরগোস পর্যন্ত কারো চেয়ে কম নয়। মানুষ কিন্তু অবস্থাবিশেষে সর্বভুক। যারা মুখ্যতঃ আমিষ-ভোজী, তারাও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে কিছু না কিছু উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায়। আবার নিরামিষাশীরাও তো প্রকৃতপক্ষে কেবল উদ্ভিজ্জ খাদ্যই খায় না, প্রাণিজ দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি এবং কোন কোন নিরামিষাশী ডিমকেও তাদের খাদ্য-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধা করেন না। সুতরাং

প্রাণিজ খাদ্যের তুলনায় চাল, গম, জোয়ার, বার্লি, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্য-তালিকার মুখ্য তণ্ডুলজাতীয় উপাদানগুলি ছাড়া শাক-সব্জি, ফল-মূল প্রভৃতি অন্যান্য গৌণ উপাদানগুলির ক্যালোরী হিসেবে না হলেও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে পৌষ্টিক মূল্য সম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পৌষ্টিক মূল্যের কথা বাদ দিলেও দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার একঘেয়েমি দূর করতে, আস্বাদ বাড়াতে, পরিপাক-শক্তির সাহায্য করতে, যকৃতের স্বাভাবিকতা ঠিক রাখতে এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর করতেও খাদ্যের উপকারিতা বড় কম নয়।

সাধারণতঃ শাক-সব্জি ও ফল-মূলের ক্যালোরী মূল্য খুবই কম। এদের মধ্যে আলু, রাঙা আলু, বীট, কলা, আম, মটরশুঁটি, শিম, কাঁঠাল বীচি প্রভৃতি ব্যতিক্রম। সে কারণে কোন কোন দেশে, যেমন—আয়র্ল্যাণ্ড ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে লোকেরা প্রচুর আলু খেতে অভ্যস্ত। দুর্ভিক্ষের সময় চাল ও গমের অভাবে সে জন্যেই তাদের বিকল্প হিসেবে আলু, রাঙা আলু ও কলা এবং বিহার কিংবা বারাণসী অঞ্চলে আমের মরশুমে আমও ঐ মুখ্য উপাদানগুলির অভাব অনেকটা মেটাতে সক্ষম। অন্যান্য তরিতরকারি কিংবা ফল-মূল থেকে, প্রতি ১০০ গ্র্যামে পঞ্চাশ থেকে এক-শ' ক্যালোরীর বেশী শক্তি লাভ করা সাধারণতঃ সম্ভব নয়।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যে সাধারণতঃ প্রোটিনজাতীয় উপাদান খুবই কম থাকে। এদের মধ্যে সবুজ যেগুলি, যেমন—মটরশুঁটি কিংবা নানারকমের জলজ উদ্ভিদে প্রোটিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে এবং অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিও বর্তমান। তরিতরকারির সবুজ অংশ, যেমন—পাতা ও কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডেও তার অন্যান্য অংশের চেয়ে প্রোটিন বেশী থাকে। সে কারণেই ঐ সকল সবুজ অংশ থেকে গৃহীত ঘনীভূত প্রোটিন অংশকে (Protein concentrates) কম প্রোটিনযুক্ত অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে তার পুষ্টিকারিতা বাড়াবার চেষ্টা চলবে আজকাল। দৃষ্টান্ত হিসেবে কড়াইশুঁটির কচুরির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই বন্ধুবর ডক্টর ৺বীরেশ গুহ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে গরীবের জন্যে ঘাসের চপের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলা দেশ তখন গৃহপালিত পশুদের মুখের গ্রাসকে কেড়ে নিয়ে মুখরোচক চপ বানিয়ে খাবার ফতোয়া মেনে নেয় নি।

প্রোটিনের মতই সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ খাদ্য-গুলিতে, বিশেষতঃ তরিতরকারিতে স্নেহজাতীয় পদার্থের অভাব। তাজা ফল-মূলগুলি সম্বন্ধেও একথা খাটে, কেবল ব্যতিক্রম শুক্‌নো ফলগুলি, যেমন—নারিকেল, চীনাবাদাম, আখরোট, পেস্তা, বাদাম, কাজু বাদাম প্রভৃতি। আখরোটে সর্বাপেক্ষা অধিক, শতকরা ৬৪·৪৯ ভাগ, তারপর বাদামে ৫৮·৯২, পেস্তায় ৫৩·৫১, কাজুতে ৪৬·৯৩, নারিকেলে ৪১·৬০ এবং চীনাবাদামে ৪০·১৩। এই সব শুক্‌নো ফলে প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও এক নারিকেল ও চীনে বাদাম ছাড়া অন্যগুলি সামর্থ্য হিসেবে সাধারণ বাঙালীর নাগালের বাইরে।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যে সাধারণতঃ শর্করাজাতীয় উপাদানেরই প্রাধান্য। বিশেষতঃ দুষ্প্রাপ্য সেলুলোজজাতীয় উপাদানের। মূলজাতীয় উপাদানগুলিতে শ্বেতসার বেশ কিছু থাকে এবং মিষ্টি ফলগুলিতে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ থাকে। আখের কাণ্ডে এবং বীটমূলে চিনি এবং কাণ্ড থেকে পাওয়া যায় শ্বেতসারপূর্ণ সাগুদানা। সুতরাং এগুলির ক্যালোরী মূল্য শাক-সব্জি ও তরি-তরকারি জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে তুলনামূলকভাবে অনেকটা বেশীই থাকে।

কাণ্ড ও মূল অংশগুলি থেকে শাকপাতা জাতীয় সবুজ অংশে ক্যালসিয়াম ও লৌহঘটিত

ধাতব লবণগুলি অধিক পরিমাণে থাকে। সেই কারণে যথাক্রমে দেহের হাড় এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্যে, ঐ দুটি ধাতব লবণের প্রয়োজনে সবুজ শাক দেহের পক্ষে উপকারী। কড়াইশুঁটি, শিম প্রভৃতি অপরিণত ডাল এবং সরষে শ্রেণীর উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ও মূলে ঐ সকল ধাতব লবণ অন্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণে থাকে। আলু ঠিক মূলজাতীয় উপাদান নয়, সে জন্যে তার খোসার নীচেও কিছু কিছু ধাতব উপাদান থাকে।

ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায় ক্ষুদ্রাকৃতি তালের মত একরকম লাল রঙের ফল। তাথেকে নিঃসৃত তেলে কিছুটা ভিটামিন-এ পাওয়া গেলেও অন্যান্য হলদে কমলা ও লালচে ফলগুলিতে ( যেমন আম, কাঁঠাল, কমলালেবু প্রভৃতি ) এবং হলদে রঙের মূল রাঙা আলু ও গাজরে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন বা প্রোভিটামিন-এ পাওয়া যায়। পাকা টক্‌টকে লাল বিলিতি বেগুন এবং শুক্‌নো লঙ্কায় ও লাল নটেশাকেও বেশ কিছুটা ক্যারোটিনের অনুরূপ রঞ্জক দ্রব্য ক্রিপ্টোজেন্থিন এবং সবুজ রঙের শাক-পাতায় এবং ঐ রঙের ডাঁটাগুলিতেও থাকে যে ক্লোরোফিল নামক রঞ্জক দ্রব্য, তাও গুণানুসারে ক্যারোটিনের মতই উপাদান। খাদ্য তালিকায় ঐ সকল রঞ্জক দ্রব্যের উপস্থিতিতে সুস্থ যকৃৎ অতি সহজে ঐ প্রো-ভিটামিনজাতীয় উপাদানের একটি বিশিষ্ট এনজাইম ক্যারোটিনের সাহায্যে ভিটামিন-এ-তে রূপান্তর ঘটায়। সে কারণে অপেক্ষাকৃত সুলভ এসব উদ্ভিজ্জ খাদ্য নিয়মিত খেলে মাখন, ঘি, দুধ, ডিম প্রভৃতি ( যাতে ভিটামিন-এ প্রচুর পরিমাণে থাকে ) না খেলেও শরীরে ভিটামিন-এ-র অভাব ঘটে না।

সকল প্রকারের টাট্‌কা ফলে ( শুক্‌নো ফলে নয় ), বিশেষতঃ লেবুজাতীয় ( যেমন কমলা, পাতি লেবু, বাতাবী লেবু, মুসাম্বি প্রভৃতি) বেরীজাতীয় ( যেমন আমাদের দেশে আমলকী, কালোজাম এবং পাশ্চাত্য দেশে স্ট্রবেরী, র‍্যাস্‌প্‌বেরী প্রভৃতি ) এবং অন্যান্য ফল—পেয়ারা আপেল, ন্যাশপাতি, আম, কাঁঠাল, পেঁপে প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড থাকে। টোম্যাটো, ডুমুর প্রভৃতি ফল এবং গাঢ় সবুজ রঙের শাক-পাতাতেও বেশ কিছুটা ভিটামিন-সি থাকে। কাঁচা এবং শুক্‌নো লঙ্কায় বেশ কিছু এবং রসুন ও পেঁয়াজেও কিয়ৎ পরিমাণে ভিটামিন-সি আছে। তাছাড়া তরিতরকারির মধ্যে সজনে খাড়া, করলা, বাঁধাকপি ও ফুলকপির মধ্যে অধিক পরিমাণে এবং বেগুন, শিম, ফরাস ( ফ্রেঞ্চবীন ) ও ঢেঁড়শের মধ্যেও সামান্য পরিমাণে ভিটামিন পাওয়া যায়। মূলজাতীয় তরিতরকারির মধ্যে তা সবচেয়ে বেশী থাকে বীটে এবং কিয়ৎ পরিমাণে থাকে রাঙা আলু, মূলা, শালগম, গাজর এবং কন্দজাতীয় আলুতে।

অঙ্কুরিত মুগ, ছোলা, মটর প্রভৃতি গোটা ডালে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন ও ধাতব লবণসহ বেশ কিছুটা ভিটামিন-সি ও বি সমষ্টিও বর্তমান থাকে।

ফল-মূলে ভিটামিন-এ পূর্ব উপাদান বা প্রোভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-সি-এর পরি-মাণের কিন্তু স্থান, কাল এবং অন্যান্য অবস্থাভেদে তারতম্য হতে দেখা যায়।

সাইট্রিক অ্যাসিড সমন্বিত ফলগুলির মধ্যে কমলালেবুতে মরসুমের শেষের দিকে একদিকে যেমন ভিটামিন-সি-কে ক্রমশঃ কমতে দেখা যায়, ঠিক তেমনি ক্যারোটিন ও ক্রিপ্‌টোজেন্থিন জাতীয় প্রোভিটামিনগুলি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ম্যালিক অ্যাসিডযুক্ত আপেলে ভিটামিন-সি-র পরিমাণের বেশ কিছু কম-বেশী দেখা যায়, রকমারি এবং রেখে-দেওয়া ফলগুলির মধ্যে। কয়েক মাস রেখে দেবার পর ঐগুলিতে

অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডের পরিমাণ, মরসুমের সময় সদ্য পেড়ে আনা পাকা ফলের প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়।

একই ভাবে বিভিন্ন প্রকারের ও সংরক্ষণ কালের দৈর্ঘ্য অনুসারে আলুর ভিটামিন-সি-রও কম-বেশী দেখা যায়। সবে মাত্র ক্ষেত থেকে তুলে আনা আলুর মধ্যে যে পরিমাণে তা থাকে, তিন মাস রেখে দেবার পর তা দাঁড়ায় দুই-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেক পরিমাণে এবং ছয় মাস পরে তা হয় তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র।

গাজর এবং রাঙা আলুর মধ্যেও ভিটামিন-এ-র পরিমাণের বেশ কিছু তারতম্য হয় রকম-ভেদে এবং তাদের পরিণতির স্তর হিসেবে। তাজা কচি গাজর অপেক্ষা সদ্য খুঁড়ে আনা পাকা গাজরের মধ্যে সাধারণতঃ প্রোভিটা-মিনের পরিমাণ থাকে অনেকটা বেশী। রকমভেদে রাঙা আলুর মধ্যেও ভিটামিন-এ-র পূর্ব উপাদানের বেশ কিছু কম-বেশী দেখা যায়। ফিকে লাল্‌চে রঙের চেয়ে গাঢ় লাল কিংবা কমলা রঙের লাল আলুর মধ্যে তা থাকে অনেক বেশী।

সংরক্ষিত ফল-মূলের পৌষ্টিক মূল্য দুটি কারণে হ্রাস পায়। প্রথমতঃ ভৌতিক কারণে ক্ষতি, যেমন—তরিতরকারি বা ফল-মূলের পাতার মত কিছুটা আহার্য অংশ স্বতঃই বাদ পড়ে। দ্বিতীয়তঃ নানা কারণে খাদ্যাংশে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলেও তা ঘটে। নানা কারণে ঐরূপ ক্ষতি হতে পারে; যেমন—(১) সংরক্ষণের তাপমাত্রা, (২) বায়ুর আর্দ্রতা, (৩) উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার পূর্ববর্তী কাল, (৪) যথেচ্ছ নাড়াচাড়া, (৫) সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং (৬) খাদ্য প্রস্তুতি। সংরক্ষণের তাপমাত্রা সর্বদা যথোপযুক্ত-ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত না হলে তরিতরকারি ও ফল-মূলের মধ্যে শুধু যে ভিটামিনের পরিমাণই হ্রাস পায় এমন নয়, তাদের মধ্যে সাংগঠনিক পরিবর্তনও দেখা যায়। অতি ভঙ্গুর ভিটামিন-সি জলে দ্রাব্য এবং তাপ ও অক্সিজেন সংযোগে ক্ষয় পায় বলে অযথা নাড়াচাড়া করবার ফলে অতি সহজেই সেটি নষ্ট হয়ে যায়। যে সকল উপায়ে ঐ ক্ষয়িষ্ণু ভিটামিনকে অবিকৃত রাখা চলে, ঠিক তাতেই অন্যান্য ভঙ্গুর পৌষ্টিক উপাদান-গুলিও ঠিক রাখা সম্ভব হয়। সে জন্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মুখ্য লক্ষ্য থাকে অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডের পরিমাণ যাতে হ্রাস না পায় এবং গৌণ লক্ষ্য থাকে ক্যারোটিন ও থিয়ামিন (ভিটামিন-বি$_1$) যাতে ঠিক থাকে, তার উপর।

সংরক্ষিত উপাদানে ভিটামিন সি-এর পরিমাণকে অটুট রাখবার জন্যে যথোপযুক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা আবশ্যক। গাঢ় সবুজ রঙের তরিতরকারি ও শাকপাতাকে ক্ষেত থেকে তুলে আনবার অব্যবহিত পরেই বরফের মত শীতল অবস্থায় রাখলে এই ভিটামিনটি নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এই অবস্থায় রক্ষিত শাকপাতার ভিটামিন কয়েক দিন পর্যন্ত অটুট থাকে; ৪০° থেকে ৫০° পর্যন্ত ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রক্ষিত হলে পাঁচ দিন পর্যন্ত সবটা ক্যারোটিন ও অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডই অক্ষুণ্ণ থাকে। সব চেয়ে ভাল ভাবে পৌষ্টিক উপাদান সংরক্ষিত হয় শাকপাতা ও স্যালাডের প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত সবুজ তরিতরকারিকে বাষ্পভেদ্য ব্যাগে উচ্চ আর্দ্রতায় হিমাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রায় রেখে দিলে। মটর, শিম প্রভৃতি বীজকে খোসা ছাড়াবার পরও একই ভাবে রাখলে তাদের পৌষ্টিক মূল্য অক্ষত থাকে। তার চেয়েও ভাল ব্যবস্থা গোটা শুঁটিকেই যথোপযুক্ত অল্প তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতায় রেখে দেওয়া।

আবার কোন কোন তরিতরকারি, যেমন—বাঁধাকপি, টোম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা, ফ্রেঞ্চবীন প্রভৃতি গৃহের স্বাভাবিক তাপমাত্রায়ই ভাল থাকে, অক্ষুণ্ণ ভিটামিন-সি সহ। তবে নজর

রাখতে হবে, যাতে সেগুলি শুকিয়ে না যায়। কাঁচা সবুজ টোম্যাটোগুলিকে ৬৫° থেকে ৭০° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রোদে রেখে পাকিয়ে নিয়ে যখন লাল হয়ে যাবে, তখন ঠাণ্ডা বাক্সে কিংবা অল্প তাপমাত্রাযুক্ত ঘরে রেখে দিলে বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত তাদের ভিটামিন-সি অটুট থাকে।

মূল ও কন্দ জাতীয় গাজর, রাঙা আলু, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট আর্দ্র অল্প তাপমাত্রায় রাখলে তাদের পৌষ্টিক উপাদানগুলি ঠিকমত রাখা যায়।

সাইট্রিক অ্যাসিডযুক্ত ফল, যেমন—গোটা কমলা, পাতিলেবু বা তাদের রসকে রেফ্রিজারেটারের মধ্যে কিংবা অন্যভাবে ৬০° থেকে ৭০° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রেখে দিলে প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত ভিটামিন-সি-এর পরিমাণ অক্ষুণ্ণ থাকে। গোটা ফলকে অল্প তাপমাত্রায় বাইরে রেখে দিলেও কয়েক দিন পর্যন্ত বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু রসকে ঐ ভাবে রেখে দিলে ভিটামিন-সি নষ্ট হবার আগেই তার বিশিষ্ট গন্ধটি উবে যায়। বেরীজাতীয় ফলের পৌষ্টিক উপাদানগুলি কিন্তু এত সহজে রক্ষা করা যায় না। হিমাঙ্কের তাপমাত্রায় সংরক্ষণের আগে তাদের অতি সাবধানতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে হয়—কেন না, তাদের উপর কোন চোট লাগলে কিংবা কোথাও খোসা ছড়ে গেলেও ভিটামিন-সি অনেকটা কমে যায়।

অনেক দিন ধরে এগুলিকে রাখতে হলে চিনির রসে বায়ুশূন্য টিনে তাদের পুরে সীল করে ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে দিতে হয়। ফলের রসকে এভাবে বহুদিন অবিকৃত রাখা যায়। এভাবে সংরক্ষিত সাইট্রিক বা ম্যালিক অ্যাসিডযুক্ত ফলের কিংবা টোম্যাটোর রসের ভিটামিন-সি ও ক্যারোটিন অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। যে তরল পদার্থে ফলগুলি রাখা হয়, তাদের জলে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলি (বি-কমপ্লেক্স সি প্রভৃতি) সহ ধাতব উপাদানের অনেকটাই তাতে বেরিয়ে আসে বলে খাবার সময় ফলের পূর্ণ পৌষ্টিক উপাদান গ্রহণ করতে হলে ফলের টুক্‌রাগুলির সঙ্গে ঐ রসও খাওয়া চাই, অন্যথায় তা লবণাক্ত হলে সুপ বা সুরুয়ার সঙ্গেও তা খাওয়া যেতে পারে।

রান্নার আগেও তরিতরকারি কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে বাছা, কোটা ও ধোওয়া আবশ্যক। ফলজাতীয় তরিতরকারি, যেমন—ঝিঙে, পটোল, শশা, ধুঁদুল প্রভৃতিকে খোসা না ছাড়িয়ে চেঁচে নিয়েই কোটা উচিত। ডাঁটা সম্বন্ধেও একই কথা। বাঁধাকপি, পালং শাক প্রভৃতি পাতা জাতীয় তরকারির বাইরের সবুজ মোটা পাতাগুলিকে খুব বেশী করে ছাড়িয়ে ফেলে দেওয়া উচিত নয়, কারণ ফল জাতীয় তরকারিগুলির যেমন খোসার নীচে, তেমনি পাতা জাতীয় তরকারিগুলিরও পৌষ্টিক উপাদান ভিটামিন ও ধাতব লবণগুলি গাঢ় সবুজ বাইরের পাতা বিশেষতঃ পাতাগুলির বোঁটা, ও মধ্যশিরা ও উপশিরাগুলিতেই অধিক পরিমাণে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে পালং শাকের গাঢ় সবুজ বাইরের পাতাগুলিতে আছে, মধ্যেকার কতকটা ফ্যাকাশে পাতাগুলির চেয়ে প্রোভিটামিন-এ ত্রিশগুণ বেশী। সুতরাং বাইরের পাতাগুলিকে ফেলে দিলে ভিটামিনগুলির চার ভাগের তিন ভাগকেই ফেলে দেওয়া হয়। রান্না করবার আগে শুকিয়ে-যাওয়া পাতাগুলিকে জলে ভিজিয়ে রাখলে যদিও তা আবার সবুজ রং ফিরে পায়, তবু আগেই নষ্ট হয়ে যাওয়া ভিটামিনগুলির পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হয় না।

একইভাবে মূল বা কন্দজাতীয় তরকারিগুলিরও খোসা ছাড়িয়ে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। গাজর, কচু প্রভৃতিকে চেঁচে এবং আলু খোসাশুদ্ধ কেটে নিয়ে রান্নার পরে খোসা ছাড়িয়ে নিলেই

তাদের পৌষ্টিক উপাদানগুলির সম্পূর্ণ-টাই গ্রহণ করা যায়।

গঙ্গার ইলিশের নিজস্ব সুবাসটুকু ঠিক রাখবার জন্যে যেমন প্রথমে আঁশ ছাড়িয়ে গোটা মাছটিকে ভাল করে ধুয়ে তবে কেটে রান্না করতে হয়, শাকপাতা ও তরিতরকারিগুলিকেও ঠিক তেমনি আগে ভাল করে ধুয়ে তবে কেটে রান্না করা উচিত। প্রথমে কেটে কুচিকুচি করে বার বার ধুতে থাকলে ধোওয়া জলের সঙ্গে কিছুটা পৌষ্টিক উপাদান বেরিয়ে যাবে।

উত্তাপ এবং অক্সিজেন সংযোগের ফলে অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড ও বি-শ্রেণীর ভিটামিন-গুলির বিনাশ ঘটে বলে রান্নার ফলে ঐগুলির যথেষ্ট অপহ্নব ঘটে। সে জন্যে শাকপাতা ও তরিতরকারিকে যতটা সম্ভব কম জলে সিদ্ধ বা রান্না করা উচিত। বাঁধাকপি কিংবা শাক তার তিন ভাগের এক ভাগ জলে খুব তাড়াতাড়ি রান্না করে নিলে শতকরা ৯০ ভাগ ভিটামিন-সি ঠিক থাকে, কিন্তু চারগুণ পরিমিত জলে রান্না করলে অর্ধেকের চেয়ে কম অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড থাকে। তেল বা ঘি ফুটিয়ে কয়েক মিনিট মাত্র তাতে ঐগুলিকে নাড়াচাড়া করে উপযুক্ত পরিমাণে (এক-তৃতীয়াংশ) জলে ঢেলে, কড়ায়ের উপর ঢাকুনি চাপা দিয়ে আরো কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা যখন সুসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন নামিয়ে নিতে হয়। বহুক্ষণ ধরে তেল বা ঘিয়ে ভাজতে থাকলে কিংবা প্রচুর জলে অত্যধিক সময় ধরে সিদ্ধ করতে থাকলে ভিটা-মিনগুলির সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রেশার কুকারে গোটা আলু, গাজর এবং শালগম ভাপে সিদ্ধ করে নিলে তাদের ভিটামিন নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু বহুক্ষণ ধরে ঐ ভাবে সিদ্ধ করতে থাকলে ভিটামিনের পরিমাণের প্রচুর ক্ষতি হয়। মূল ও কন্দজাতীয় তরিতরকারি আগে কেটে টুকরা টুকরা করে সিদ্ধ করলে ভিটামিন ও ধাতব উপাদানগুলি অনেকটা জলে বেরিয়ে পড়ে, সে জন্যে কখনই তরকারি-সিদ্ধ করা জলকে ফেলে দেওয়া উচিত নয়—হয় সুপের সঙ্গে কিংবা ঝোলে খাবার জন্যে রেখে দেওয়া উচিত। খোসাশুদ্ধ গোটা আলু সিদ্ধ করে নিলে তার ভিতরের ভিটমিন-সি সি, থিয়ামিন (বি, ) এবং অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্য অটুট থাকে।

পুষ্টিকারিতা বজায় রাখবার জন্যে তরি-তরকারি যত অল্প সময়ে সম্ভব রান্না করা উচিত। ঠাণ্ডা জলে ছেড়ে তাদের সিদ্ধ করতে থাকলে, জল ফুটে ওঠবার আগেই ভিটামিন-সি নষ্ট হয়ে যায়, কারণ জল ফোটবার আগে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এন্‌জাইমের সক্রিয়তার ফলে ফুটন্ত জলে এন্‌জাইমের ক্রিয়া ব্যাহত হবার আগেই অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডটি নষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যে আগেই জল ফুটিয়ে তাতে তরিতরকারি সিদ্ধ করে নিলে তা যেমন তাড়া-তাড়ি সিদ্ধ হয়, তেমনি আবার তার ভিটামিনও ততটা নষ্ট হতে পারে না। এভাবে রান্না-করা তরকারি না খেয়ে রেখে দিলে (এমন কি, রেফ্রিজারেটারে রাখলেও) যত সময় অতি-বাহিত হয়, ততই ভিটামিন-সি-এর পরিমাণ কমতে থাকে।

আমাদের বাংলা দেশে ফল খাবার অভ্যাস প্রায় নেই বললেও চলে। ফল খেতে হলেই যে বহুমূল্য আঙুর, বেদানা, আপেল, পেস্তা, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি খেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। আমাদের দেশে বিভিন্ন ঋতুতে যেমন আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি পাওয়া যায়, তা খেলে একই সঙ্গে প্রোভিটামিন-এ এবং সি যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারে। আর সব ঋতুতেই পাওয়া যায় যে সকল ফল, যেমন কলা, লেবু, পেয়ারা, টোম্যাটো, কাঁচা লঙ্কা

প্রভৃতি, তাদের দ্বারাও অনেকটা কম খরচেই সে চাহিদা মিটতে পারে। ফল-মূল থেকে ঐ ছুটি ভিটামিন ছাড়াও কিছুটা পরিমাণে রিবোফ্লোবিন [ বি$_2$ (১) ], ক্যালসিয়াম, লোহা এবং তৎসহ প্রচুর গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ। সে জন্মে শিশু, কিশোর, এমন কি পরিণত বয়স্ক পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রতিদিন অন্ততঃ একটি করে লেবুজাতীয় ( সাইট্রিক অ্যাসিডপূর্ণ ) ফল বা তার রস গ্রহণ, একদিনের ব্যবধানে একটি করে সবুজ বা গাঢ় হলদে রঙের ফল ( যেমন আপেল, শশা, আম, গোলাপজাম, টোম্যাটো, কমলালেবু প্রভৃতি ) কিংবা তার রস এবং প্রতিদিন দু-বেলাই কলা ও আলু কিছু না কিছু খাওয়া উচিত। এ কারণেই ইংরেজীতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন আছে "One apple a day, keeps the doctor away"।

কোন কোন ফল-মূল, তরিতরকারি সম্বন্ধে আমাদের দেশে অজ্ঞতাজনিত ভুল ধারণা আছে, যেমন পাকা কলা খেলে শরীরের ওজন বাড়ে এবং পেটে ক্রিমি হয়। এর মূলে কোন সত্যি নেই, কারণ ছুধসহ কলা দেহের ওজন কমাবার পক্ষে প্রকৃষ্ট খাদ্য। কলা খাবার সঙ্গে পেটে ক্রিমি হবার কোন সম্বন্ধই নেই। কাঁচকলায় যথেষ্ট লৌহাঘটিত লবণ থাকাতে তা রক্তবর্ধক—এও একটি ভুল ধারণা। লোহার কড়াইতে কাঁচকলা রান্না করলে তা কালীবর্ণ ধারণ করে, কারণ কাঁচকলায় যথেষ্ট ট্যানিন আছে, সে জন্মে তাতে কোষ্টবদ্ধতা জন্মে, লোহার জন্মে নয়। যতটা বেদানার রস খাওয়া যায়, শরীরে ততটা রক্ত তৈরি হয়—এও আর একটি ভুল ধারণা। সে জন্মে রক্তশূন্য রোগীর পক্ষে, অন্য ফলকে উপেক্ষা করে অধিক খরচে বেদানা খাবার কোন যৌক্তিকতাই নেই। এমনি আর একটি ভুল ধারণা—পাতিলেবুর রস কিংবা সময়ে সময়ে কমলালেবুর রস কিংবা আপেলও টক্ বলে যাদের অম্বলের ধাত, তাদের পক্ষে খাওয়া উচিত নয়। আসলে কিন্তু তারা ঐরূপ ক্ষেত্রে উপকারী ফল, কেন না তাদের মধ্যে আছে যে সাইট্রিক বা ম্যালিক অ্যাসিড তা পাকস্থলীতে সোডিয়ামের সঙ্গে তৈরি করে যে সোডিয়াম সাইট্রেট বা ম্যালেট, মোটেই তা অম্লধর্মী নয়, বরং উল্টো কতকটা ক্ষারধর্মী। আমাদের অজ্ঞাত-প্রসূত কিংবা কাল্পনিক এরূপ বহু ভুল ধারণা বহুকাল ধরে চলে আসছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে ঐগুলিই শুধু হাস্যকরই নয়, গৌণভাবে অনিষ্টকরও বটে। সুতরাং বর্তমানে খাদ্য সঙ্কটকালেই শুধু নয়, সকল সময়েই আবালবৃদ্ধবণিতার স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা অটুট রাখবার জন্মে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় যথোপযুক্ত পরিমাণে শাক-সব্জি ও ফল-মূলের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ফল-মূলকে শুধু বড়লোকের খাদ্যোপাদান এবং শাক পাতা ও সাধারণ তরিতরকারিকে গরীব বা দরিদ্রের খাদ্যরূপে অপাংক্তেয় করে রাখবার মত মূঢ়তাও আর কিছু হতে পারে না।

# খনিজ তেলের কথা

**প্রভাতকুমার দত্ত**

সাম্প্রতিক কালে কলকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে ভূগর্ভস্থ তেলের সন্ধানে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কিছু অনুসন্ধান এবং খনন-কার্য চালানো হয়েছিল। গত তিন-চার বছর ধরে ক্যানিং এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেক স্থানে ভূগর্ভের ভিতর প্রায় চার হাজার ফুট পর্যন্ত খনন করে কোথাও তেল পাওয়া না যাওয়ায় অনেকেই নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কিছু কাল পূর্বে নতুন উদ্যমে খনন-কার্য সুরু করে এই অঞ্চলে তেলের সন্ধান পাওয়ায় অনেকেই আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। জনৈক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কলকাতা নগরী তেলের সাগরের উপর ভাসমান।

কলকাতার উপকণ্ঠে যদি সত্যই তেলের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে এই নগরীর গুরুত্ব যে বহুলাংশে বেড়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। অবশ্য কলকাতা দীর্ঘকাল ধরেই ভারতের সর্বপ্রধান শিল্পনগরী হিসাবে স্বীকৃত। তবু আজকের এই বিজ্ঞান-নির্ভর এবং যন্ত্র-সর্বস্ব যুগে তেলের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণে রেখে একথা সহজেই বলা চলে যে, এই সহরের সন্নিকটে তেলের আবিষ্কার এর গুরুত্বকে অনেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ভূগর্ভস্থ তেল যে আজকের যুগে কত ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম হয়তো খুব বেশী কাজে লাগে না, কিন্তু একেই পরিশোধন করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য করে হাজার রকম কাজে লাগানো হয়। এরোপ্লেন, রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, স্কুটার প্রভৃতি এঞ্জিন চালাবার জন্যে এর ব্যবহার আজ সবারই জানা আছে। সুগন্ধি দ্রব্য, রং, কালি, মোমবাতি, প্রসাধন-সামগ্রী প্রভৃতি উৎপাদনে পেট্রোলিয়ামজাত তেলের ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক আলোর কার্বন, রবারের তৈরি চাকা প্রভৃতি উৎপাদনেও এই তেল ব্যবহৃত হয়। গতিশীল যন্ত্রাংশের ঘর্ষণজনিত ক্ষয় নিবারণের জন্যে এই তেলের ব্যবহার একান্তই প্রয়োজনীয়। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পে এই তেল এত ভাবে কাজে লাগানো হয় যে, তার সম্পূর্ণ বিবরণ অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে পড়বে। সার তৈরির জন্যে ন্যাপ্থা প্রভৃতি যে সব উপাদান প্রয়োজন, সেগুলির কিছু কিছুও এই তেল থেকেই পাওয়া যায়। দুর্গাপুর, কোচিন, কানপুর, মাদ্রাজ, গোয়া, হলদিয়া, ট্রম্বে প্রভৃতির সার কারখানাগুলিতে এভাবেই সার তৈরি করা হচ্ছে বা হবে।

পেট্রোলিয়ামজাত তেল থেকে প্রোটিন উৎপাদনও সম্ভব। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে এবং এর প্রতিকারের জন্যে এই তেল ব্যবহারের কথা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আরও বলেছেন যে, ভূ-গর্ভস্থ তেলের সাহায্যে মরুভূমিকে সবুজ-শ্যামল করে তোলাও সম্ভব।

বৈদ্যুতিক চাপ কমানো-বাড়ানোর জন্যে ট্র্যান্সফরমার নামক যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাতেও প্রভূত পরিমাণ পেট্রোলিয়ামজাত তেল ব্যবহার করা হয়। এই যুগে সামান্য টেনিস বল

নির্মাণ থেকে রকেটের জ্বালানী পর্যন্ত—কতভাবে যে, এই খনিজ বা ভূগর্ভস্থ তেল কাজে লাগানো হয়, তার ইয়ত্তা নেই।

অথচ ভাবলে অবাক হতে হয় যে, মানুষ আপন প্রয়োজনে এই তেলের ব্যবহার সুরু করেছে আজ থেকে মাত্র এক-শ' বছর আগে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের কোন কোন জায়গায় খানা-খন্দ বা ফাটল থেকে এর আগে যে কিছু কিছু তেল পাওয়া যায় নি তা নয়, কিন্তু বিগত শতকের মাঝামাঝি একজন ইংরেজ বিজ্ঞানীই (লর্ড প্লেফেয়ার) প্রথম প্রাকৃতিক এবং অপ-দ্রব্য মিশ্রিত পেট্রোলিয়াম পরিশোধন করবার উপায় উদ্ভাবন করেন এবং তার সম্ভাব্য ব্যবহার সম্পর্কে অন্য সকলকে সচেতন করেন। এই তেল কোথা থেকে এবং কি ভাবে পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে তখনকার যুগে কোনও রকম ধারণাই ছিল না বলা চলে।

এর কিছুদিন পরে ১৮৫৯ সালে কর্ণেল ড্রেক পেন্‌সিলভেনিয়ায় প্রথম তৈলকূপ খনন করেন। এই তৈলকূপ থেকে প্রায় এক বছর ধরে প্রতিদিন আট-শ' চল্লিশ গ্যালন তেল পাওয়া গিয়েছিল। এরপর এই তরল সোনার সন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পপতি এবং শিল্পোৎসাহীরা স্বর্ণ-সন্ধানীদের চেয়েও তৎপর হয়ে ওঠেন। ফলে পৃথিবীর তৈল-খনিগুলির খবর সবাই জানতে লাগলো।

আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশী পেট্রোলিয়াম (বা তরল সোনা) পাওয়া গেল। আমেরিকার মেক্সিকো, টেক্সাস, ক্যালিফোর্ণিয়া এবং পেন্‌সিলভেনিয়া তৈলভাণ্ডাররূপে স্বীকৃতি পেল। এছাড়া রুমানিয়া, রাশিয়া, ইরাক, ইরান, বার্মা প্রভৃতি দেশেও তেলের সন্ধান পাওয়া গেল। ভারতের গুজরাট এবং আসামেও প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেল আছে।

পৃথিবীর কোথায় কোথায় তেল আছে, সেটা জানাই বড় কথা নয়। ভূগর্ভস্থ তেল উদ্ধার করা, পরিশোধন করা এবং বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে বা বড় বড় সহরে প্রেরণ করা—প্রভৃতিই একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ।

রিগ বা খনন-যন্ত্রের সাহায্যে মাটি খুঁড়ে ভূগর্ভের মধ্যে শত শত বা সহস্র সহস্র ফুট নীচে থেকে খনিজ তেল উপরে নিয়ে আসা হয়। মাটি কাটবার জন্যে শক্ত এবং ধারালো ধাতব ব্লেড ব্যবহার করা হয়। এই ব্লেডের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে নাট-বোল্টের সাহায্যে ড্রিল-পাইপ সংযুক্ত করে যাওয়া হয়। ড্রিল-পাইপগুলি সাধারণতঃ কুড়ি থেকে তিরিশ ফুট লম্বা এবং চার থেকে ছয় ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত হয়ে থাকে। প্রায় দেড়-শ' ফুট উঁচু একটি কাষ্ঠ-নির্মিত বা ধাতব মঞ্চ বা ষ্ট্রাকচার থেকে ঝোলানো একটি বিরাট বড় পুলি থেকে এই ড্রিল-পাইপগুলি নামানো হয়। ভূগর্ভের তৈল-স্তরে পৌঁছাবার পর পাম্প অথবা কম্প্রে-সারের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ তেল উপরে নিয়ে আসা হয়।

এভাবে মাটির তলার তেল উপরে নিয়ে আসা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিভিন্ন যন্ত্র-পাতির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় তেমনি কতকগুলি সম্ভাব্য বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণও অপরিহার্য।

কূপের চারধারের মাটি যাতে ধ্বসে না পড়ে, তা দেখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তৈল-নিষ্কাশনের সময় যাতে আগুন না লাগে, সে বিষয়েও সাবধান হওয়া উচিত।

অবশ্য একথাও বলা প্রয়োজন যে, তেলের খনিতে নানারকম প্রাকৃতিক কারণেই অনেক সময় আগুন লাগে এবং সে ক্ষেত্রে আগুন নেবানো ছাড়া আমাদের আর কিছুই করা চলে না। তেলের খনিতে তেলের সঙ্গে চকমকি জাতীয় কিছু কিছু বিস্ফোরক পাথরও পাওয়া

যায়। এগুলিতে অনেক সময়েই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আগুন জ্বলে ওঠে এবং তেলের খনিতে আগুন ধরে যায়। কোন ইঞ্জিন থেকে নির্গত এক টুকরা আগুনের ফুল্‌কি বা আকাশ থেকে নেমে-আসা বিদ্যুতের পক্ষেও তেলের খনিতে আগুন ধরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তেলের খনিতে আগুন লাগলে গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব এই আগুন নিবিয়ে ফেলা প্রয়োজন। এই আগুন নেবানোর ব্যাপারে ষ্টীম কাজে লাগানোই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। উচ্চ চাপবিশিষ্ট কোন বয়লার থেকে একাধিক পাইপ-সহযোগে প্রভূত পরিমাণ ষ্টীম তৈলকূপ বা খনির মধ্যে চালনা করা হয়। এই বাষ্প আগুন এবং বাতাসের মধ্যে একটি প্রাচীরের সৃষ্টি করে এবং বাতাসকে আগুনের কাছে যেতে দেয় না। বাতাসের অভাবে আগুন নিবে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য এত সহজে আগুন নেবানো যায় না এবং ফলে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। মেক্সিকোর একটি তৈলখনিতে আটান্ন দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করবার পর আগুন নেবানো সম্ভব হয়েছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য কুড়ি লক্ষ গ্যালনেরও বেশী তেল পুড়ে গ্যাস বা ধোঁয়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। রুমানিয়ার মোরেনি তৈলকূপ প্রায় আড়াই বছর ধরে জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৈল-খনিগুলির কাছাকাছি তৈল-পরিশোধন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই সুদীর্ঘ পাইপ-লাইন এবং কয়েকটি পাম্পিং ষ্টেশনের সাহায্যে তৈলখনি থেকে প্রাপ্ত তেল দূরবর্তী পরিশোধন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইরাকের তৈলখনি থেকে প্রাপ্ত তেল পাইপের সাহায্যে প্রায় হাজার মাইল দূরে নিয়ে যাবার পরে পরিশোধিত করা হয়।

পরিশোধনের ফলে খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, জ্বালানী তেল, মসৃণকারক তেল, আলকাত্‌রা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারোপযোগী পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলির স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন হওয়ায় খনিজ পেট্রোলিয়াম থেকে এগুলিকে আলাদা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। খনিজ পেট্রোলিয়ামকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করা হয়। ফলে কম স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট তরলগুলি নির্দিষ্ট ক্রমে বাষ্পীভূত হয়। এই বাষ্পগুলিকে যথাক্রমে শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তরলে ফিরিয়ে আনা হয়। পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের এটাই হলো মূল তথ্য।

তৈল পরিশোধন কেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই কেন্দ্রগুলি থেকে যে সব অপদ্রব্য, আবর্জনা প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয়, সেগুলি যেন কোনমতেই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে, তা দেখা প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, পারস্য এবং ইরানের বিপুল পরিমাণ খনিজ তেল পারস্য উপসাগরের আবাদান দ্বীপে পরিশোধিত হয়।

মাত্র চার মাস আগে বারৌণী তৈল শোধনাগারের পরিত্যক্ত আবর্জনা কিভাবে নিকটস্থ গঙ্গার জল দূষিত করেছিল এবং মুঙ্গের ও জামালপুরের পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যুদস্ত করেছিল, তা এই প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে পড়তে পারে। কয়েক দিন জল সরবরাহ বন্ধ থাকায় এই অঞ্চলগুলি দূষিত এবং আবর্জনাময় হয়ে উঠেছিল। স্কুল, কলেজ, অফিস, হোটেল রেস্তোরাঁ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আদালতের আদেশানুসারে পরিশোধন কেন্দ্রটির কয়েক দিন কাজ-কর্ম বন্ধ রাখতে হয়েছিল এবং সেই সময়ে এই কেন্দ্রের আট লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছিল।

সুতরাং একথা সহজবোধ্য যে, তৈল শোধনের ব্যাপারে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা একান্তই প্রয়োজন।

খনি বা ভূগর্ভ থেকে তরল অবস্থায় প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম থেকে যেমন ব্যবহারোপযোগী তেল পাওয়া যায়, তেমনি কঠিন তেলের স্তর থেকেও তেল পাওয়া যায়। এই স্তরগুলি অনেকটা মৃত্তিকা-স্তরের মতই দেখায়, কিন্তু এগুলি সাধারণতঃ কিছু নরম এবং পাত্‌লা হয়। স্কটল্যাণ্ডে এই ধরণের কঠিন তেলের স্তরের (Oil shale) সন্ধান পাওয়া গেছে।

কয়লাকে যেমন ভাবে ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়, এই কঠিন তেলের স্তরের অংশও সেভাবে উদ্ধার করা হয়। এগুলিকে পরে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয় এবং এভাবেই তাথেকে প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহার্য তেল নিষ্কাশিত ও সংগৃহীত হয়।

কয়লা থেকেও পেট্রোল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তেল পাওয়া যায়। সূক্ষ্মভাবে চূর্ণীকৃত কয়লা এবং কিছু তেলের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট চাপ এবং তাপে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করা হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রবল চাপের কবলে পড়ে চূর্ণীকৃত কয়লা পেট্রোল এবং হাইড্রোকার্বনজাত তেলে পরিণত হয়।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশে গুজরাট এবং আসামে প্রচুর খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। গৌহাটি, বারৌণী এবং গুজরাটে ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় তৈল শোধন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাজ, কোচিন এবং হলদিয়ায় আরও তৈল শোধন কেন্দ্র স্থাপিত হতে চলেছে।

রাঁচীর হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন খনন-যন্ত্র বা ড্রিলিং রিগ নির্মাণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আমেদাবাদ এবং আঙ্কলেশ্বরে অয়েল অ্যাণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের কারখানায় এই রিগগুলির যন্ত্রাংশ নির্মাণ এবং মেরামতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৈল শোধনাগারের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিশাখাপত্তন এবং অন্যান্য স্থানে নির্মাণ করা হবে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র, যথা—পাম্প, মোটর প্রভৃতি ইতিমধ্যেই দীর্ঘদিন যাবৎ এই দেশে তৈরি হচ্ছে। উচ্চ অশ্বশক্তিসম্পন্ন কম্প্রেসার তৈরির কোন পরিকল্পনা অবশ্য এখনও তেমনভাবে করা হয় নি।

ইতিপূর্বে আমরা বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে লুব্রিকেটিং অয়েল বা মসৃণকারক তেল আমদানী করতাম। খনিজ তেলের সন্ধান পাবার পর এই বিষয়ে আমরা এখন যথেষ্ট স্বাবলম্বী হতে পেরেছি। লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদন এবং সংরক্ষণের জন্যে বোম্বাই এবং মাদ্রাজে কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। হলদিয়াতেও এই ধরণের একটি কেন্দ্র স্থাপন করবার কথা আছে।

পেট্রোলিয়ামজাত তেল থেকে এই দেশেও প্রোটিন উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে এবং এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চলছে। রাজস্থানের বিশাল মরুভূমির অন্ততঃ কিয়দংশ শস্য-সবুজ করবার জন্যে পেট্রোলিয়ামকে কাজে লাগাবার কথাও ভাবা হচ্ছে।

আজ একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, মানুষের জীবনে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য আনবার জন্যে, সভ্যতার চাকা সক্রিয়ভাবে চালু রাখবার জন্যে খনিজ তেলের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায় অপরিহার্য।

# হিমোগ্লোবিন

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিমোগ্লোবিন শব্দটির সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে গেছে, অমুক ব্যক্তি রক্তাল্পতা (Anæmia) রোগে ভুগছেন, একথা প্রায়ই শোনা যায়।

রক্তের বিভিন্ন অংশের মধ্যে লোহিত রক্ত-কণিকা (Red blood corpuscles) অন্যতম প্রধান অংশ। এই কণিকাগুলির উভয় দিক অবতল (Biconcave), এগুলি অত্যধিক নমনীয় গোলাকার কোষ বিশেষ। লোহিত কণিকাগুলির ভিতরে প্রোটিনের জালি কাঠামোর (Stroma) মাধ্যমে উক্ত হিমোগ্লোবিন অতি ঘন দ্রবের অবস্থায় থাকে। হিমোগ্লোবিন সর্বদাই কণিকার অভ্যন্তরে থাকে, কখনও কোষের বাইরে নিঃসৃত হয় না।

হিমোগ্লোবিন একটি ধাতব মিশ্র (Conjugated) প্রোটিন—লৌহ, প্রোটোপরফাইরিন মণ্ডল এবং গ্লোবিনের সমন্বয়ে গঠিত। এই মিশ্র প্রোটিনের দুটি অংশ—একটি হলো 'হিম' (Haem) অপরটি 'গ্লোবিন' (Globin)। একটি হিমোগ্লোবিন অণুতে চারটি হিম পরমাণু ও একটি গ্লোবিন পরমাণু থাকে। হিমোগ্লোবিনের আণবিক ওজন (Molecular weight) হলো ৬৬,৭০০।

হিম—হিমোগ্লোবিনের মধ্যে হিম অংশ হলো শতকরা চার ভাগ মাত্র। হিম একটি ধাতব যৌগিক (Complex) পদার্থ। কেন্দ্রে একটি লৌহ পরমাণুর সঙ্গে প্রোটোপরফাইরিন কাঠামো সমন্বিত থাকে। এই হিমের অস্তিত্বের জন্যেই লোহিত কণিকা তথা রক্তকে লাল রঙের দেখায়।

গ্লোবিন—হিমোগ্লোবিনের অপর অংশ গ্লোবিন দুটি পলিপেপ্টাইড চেনের (Polypeptide chain) দ্বারা গঠিত। এক-একটি পলিপেপ্টাইড চেনে প্রায় ১৫০ প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। হিমোগ্লোবিন পরমাণুতে শতকরা ৯৬ ভাগ হলো গ্লোবিন। গ্লোবিনের কোন রং নেই।

হিমোগ্লোবিন নামক এই মিশ্র পদার্থটি প্রাণী-জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। শুধু প্রাণী-জগতে নয়, ঈষ্ট (Yeast), ছত্রাক (Fungus), শুঁটিজাতীয় (Leguminous) সব্জীর মূল প্রভৃতিতেও হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতঃই বিভিন্ন ক্ষেত্রের হিমোগ্লোবিনের ভৌত এবং রাসায়নিক (Physical & Chemical) গঠন ও কার্য-প্রণালীও বিভিন্ন রকমের হয়।

যেখানেই থাকুক, হিমোগ্লোবিনের মূল কাজ হলো শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করা। শ্বাসক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো, বায়ুমণ্ডলস্থিত অক্সিজেনকে দেহের প্রতিটি কোষ ও তন্তুতে সরবরাহ করে সঞ্জীবিত রাখা। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হিমোগ্লোবিনের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবদেহে লোহিত রক্ত কণিকার আধারে প্রচুর পরিমাণে উক্ত হিমোগ্লোবিন থাকে।

হিমোগ্লোবিনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে তা ত্বরিতে অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা অক্সিহিমোগ্লোবিন (Oxyhaemoglobin)-এ পরিণত হয়। উপযুক্ত পরিবেশে ঐ অক্সিজেন আবার সত্বর অঙ্গচ্যুত হয়। হিমোগ্লোবিন আবার তন্তুগুলি থেকে দেহের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড আহরণ করে ফুস্‌ফুসের মাধ্যমে

মানবদেহ থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশও গ্রহণ করে।

অক্সিজেনের উৎস হলো বায়ুমণ্ডল। তাকে পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া হয় প্রতিটি কোষে। এই দুই প্রান্তের রাসায়নিক ও ভৌত পরিবেশ সর্বদাই পরিবর্তনসাপেক্ষ। প্রতিটি তন্তু বা কোষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের চাপেই সুষ্ঠুভাবে আপন কাজ করতে পারে। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি বা হ্রাস পাক না কেন, হিমোগ্লোবিন কিন্তু তন্তুগুলিকে সর্বদা প্রয়োজনমত সঠিক পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ করে যায়; অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন তন্তুগুলিতে অক্সিজেনের চাপের সাম্য বজায় বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বলা হয়েছে যে, রক্তকণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন দ্রবের অবস্থায় থাকে। শুধু দ্রবের অবস্থায় নয়, একটি নির্দিষ্ট মানের ঘনত্বে অবস্থান করে। এই ঘনত্বের মান হ্রাস পেলেই রোগের সৃষ্টি হয়। একেই রক্তাল্পতা বলে।

পূর্বে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্বের হ্রাসই রক্তাল্পতা রোগের একমাত্র কারণ বলে অনুমান করা হতো। ইদানীং প্রমাণিত হয়েছে—কোন কোন রক্তাল্পতা রোগের কারণ যে শুধু হিমোগ্লোবিনের মানের হ্রাস তা নয়, হিমোগ্লোবিনের রূপান্তর বা বিকৃতিও রোগ উৎপাদন করে।

বছর কুড়ি পূর্বেও ধারণা ছিল যে, সকল মানুষের দেহে হিমোগ্লোবিন বুঝি একই প্রকারের পদার্থ। অধুনা যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তাথেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিমোগ্লোবিনের প্রকারভেদ আছে। শুধু বিভিন্ন জীবদেহে অবস্থিত হিমোগ্লোবিন যে বিভিন্ন প্রকারের, তা নয়, একই মানবদেহে বিভিন্ন প্রকারের হিমোগ্লোবিন একই সঙ্গে অবস্থান করে।

মাতৃগর্ভে থাকাকালে মানবদেহের হিমোগ্লোবিনের যে রূপ থাকে, ভূমিষ্ঠ হবার পর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই তার রূপান্তর ঘটে। প্রসবের পূর্বে হিমোগ্লোবিনের যে রূপ থাকে, তার নাম দেওয়া হয়েছে হিমোগ্লোবিন-এফ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দেহে হিমোগ্লোবিনের যে স্বাভাবিক রূপান্তর ঘটে, তাকে বলা হয় হিমোগ্লোবিন-এ।

উপরিউক্ত দুই প্রকার হিমোগ্লোবিন দেহে অবস্থান করে স্বভাবগত ভাবেই। প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে সামান্য মাত্রায় হিমোগ্লোবিন-এফ বর্তমান থাকতে পারে, কিন্তু মাত্রাধিক্য হলেই তা রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের দেহে আরো কয়েক প্রকার রূপান্তরিত হিমোগ্লোবিন দেখা যায়। গ্লোবিন অংশের পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খলের সংশ্লেষণে (Synthesis) বিভ্রান্তি ঘটলেই হিমোগ্লোবিনের এই সব রূপান্তর ঘটে। প্রাপ্তবয়স্কদের দেহে যে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকে, তার সংশ্লেষণ পরিমাণমত না ঘটলেও রোগোৎপত্তি হয় ( যথা—থ্যালাসিমিয়া—Thalassaemia)। অবশ্য কয়েক প্রকার রূপান্তরিত হিমোগ্লোবিন শরীরে স্বাভাবিকভাবে কোন অনিষ্ট না করেও থাকতে পারে।

শুধু যে নানা রোগ উৎপাদন করে বলেই হিমোগ্লোবিনের রূপান্তর চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা নয়, এর আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে; যেমন—পৃথিবীর এক-এক প্রান্তের এক-এক জাতির মধ্যে এক-এক প্রকার অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। একই প্রকার অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন আবার বংশ-পরম্পরায় বর্তমান থাকে। অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন আছে, এমন স্ত্রী ও পুরুষ যদি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহলে তাঁদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে বর্ধিত হারে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন বর্তাবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। এই বংশানুক্রমিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি নৃতত্ত্ববিদ্ এবং

প্রজননবিদ্যার অনুশীলনকারীদের (Geneticists) দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের সবটাই যে দূষণীয় তা নয়, এদের কিছু কিছু গুণও আছে। দেহে কয়েকটি বিশেষ ধরণের হিমোগ্লোবিন থাকলে শরীরকে কোন কোন রোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এমন এক প্রকার হিমোগ্লোবিন আছে, যা দেহে বর্তমান থাকলে মানুষকে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া রোগ থেকে মুক্ত রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। কে জানে, ভবিষ্যতে হয়তো অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন দিয়ে রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা হবে।

এই সব কারণে হিমোগ্লোবিনের রাসায়নিক বিকারের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন রোগ, রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা, বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য, জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে রহস্যভেদ করতে নতুন আলোকপাতের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

# খাদ্যে নূতনত্ব

### বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার জন্যে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যের অনটন, আজ পৃথিবীব্যাপী সমস্যা। প্রতি বছর লোকসংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, উন্নততর কৃষিব্যবস্থা সত্ত্বেও সেই অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠছে না। আমাদের দেশের খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার নেই, বিদেশী সাহায্যের পরিমাণেই তা যথেষ্ট প্রাঞ্জল। কিন্তু এই সাহায্যেরও সীমা আছে, একদিন নিজস্বার্থেই তারা হাত গুটিয়ে নেবে। ধরা যাক, ততদিনে আমরা খাদ্য-উৎপাদনে স্বয়ংনির্ভর হতে পারবো। কিন্তু কত দিনের জন্যে? লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্য-ব্যবস্থা যে তাল রেখে চলতে পারবে না, সমীক্ষার দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুষ্টিকর খাদ্য যোগানো চাই। আরও বড় সমস্যা—জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে শিশুর মুখে শুধু অন্ন দিলেই চলবে না, তার জন্যে চাই দুধ, ফল, মাছ, মাংস। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের ঘরের কয়টি শিশু এসব খাদ্যদ্রব্য নিয়মিত খেতে পায়?

শুধু মাঠের ফসল নয়, জলের মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী (যা খাদ্য হিসাবে স্বীকৃত) বা ছাগল, গরু, ভেড়া, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি জীবের উৎপাদনও মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কাছে হার মেনে যাবে—অর্থনীতিবিদেরা এমনই আশঙ্কা করেন। বৈজ্ঞানিকেরা তাই নেমেছেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, যাতে প্রকৃতি থেকেই এই ঘাট্‌তি খাদ্যের পরিপূরক আবিষ্কার করতে পারেন, যার দ্বারা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অন্ততঃ আংশিকভাবেও মিটতে পারে।

মানুষ সহজে তার খাদ্য-রীতির পরিবর্তন ঘটাতে চায় না। যে দেশে যেমন খাওয়ার রীতি চলে আসছে—তার আমূল পরিবর্তন একদিনে ঘটানো সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদে কিছু কিছু পরিবর্তন মেনে নিতেই হয় এবং ধীরে ধীরে তা অভ্যাসও হয়ে যায়। এই সব তথ্য স্মরণ রেখেই বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন—খাদ্যের গুণাগুণই শুধু নয়, তার বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ সবই বজায় রাখবার জন্যে চেষ্টার অন্ত নেই এবং সাফল্য লাভও হচ্ছে।

এমনই একটি সার্থক খাদ্য Plant milk বা গাছ-গাছড়া থেকে প্রস্তুত দুধ। ইংল্যাণ্ডের বাকিংহামশায়ারে Tithe farm নামে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই দুধ বাজারে ছেড়েছে। Dr. H. B. Franklin নামে একজন জৈবরসায়নবিদ্ এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে এই দুগ্ধ-উৎপাদনের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল, ১৯৬১ সালে তা সার্থক রূপ নিয়েছে। গো-দুগ্ধের সকল গুণই এতে বর্তমান এবং বর্ণও সাদা, যদিও গম, যব, ভুট্টা সরিষা, ওট ইত্যাদি গাছের পাতার নির্যাস থেকে এই দুধের উৎপত্তি।

গরু যে সব গাছ খেয়ে থাকে, প্রধানতঃ সেই সব গাছের পাতাই এখন Plant milk প্রস্তুতের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ভবিষ্যতে এরা অন্যান্য গাছের পাতা নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার আশা করেন। Dr. Franklin-এর মতে, প্রোটিনসমৃদ্ধ এই দুধের খাদ্য-গুণ গরুর দুধের সমকক্ষ এবং শরীর রক্ষার পক্ষে এটি একটি সম্পূর্ণ উপযোগী খাদ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে সব স্থানে গোরক্ষার ব্যবস্থা অনুকূল নয়, সেখানে এর দ্বারা গো-দুগ্ধের অভাব মেটানো যেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে গাছের পাতা সংগ্রহ করে সেই পাতার রস জ্বাল দিয়ে তার প্রোটিন বের করে নেওয়া হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন-ক্রিয়ার দ্বারা এই প্রোটিন শুষ্ক করে টিন-জাত করা হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এর বর্ণেরও পরিবর্তন হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ঘোষ অধ্যাপক স্বর্গীয় ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের গাছের পাতা, প্রধানতঃ ঘাস থেকে প্রোটিন প্রস্তুত সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি এই বিষয়ে সফলতা লাভের পর একটি আমেরিকান প্রকল্পের (পি. এল-৪৮০) অর্থসাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্রেরা এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন, কিন্তু কলকাতার মত সহরে প্রচুর কাঁচা মাল অর্থাৎ গাছের পাতা সংগ্রহ একটু কঠিন ব্যাপার, তাই এই প্রকল্পে ছেদ পড়ে।

সয়াবীন ও চীনাবাদাম থেকে প্রস্তুত দুধ আর একটি সার্থক প্রচেষ্টা। একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের (FAO) সাহায্যে সয়াবিন ও চীনা-বাদামের প্রোটিন অংশ বের করে নিয়ে (রাসায়নিক উপায়ে) তাথেকে দই, ছানা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। গো-দুগ্ধের দই বা ছানা থেকে এর পার্থক্য বিশেষ বোঝা যায় না, বিশেষতঃ এই ছানা দিয়ে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করলে গো-দুগ্ধের ছানায় প্রস্তুত মিষ্টান্নের স্বাদ থেকে একেবারেই প্রভেদ থাকে না।

মাছ ও মাংস দুটিই প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য; কিন্তু সব দেশেই মাছ ও মাংসের মূল্যমান অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষা অনেক বেশী। আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকগণ তাই শস্য থেকে মাছ-মাংসের সমকক্ষ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত করবার চেষ্টা করছেন।

তিনটি প্রধান পদ্ধতি তাঁরা গ্রহণ করেছেন:—

(১) শস্যের প্রোটিনসমৃদ্ধি বৃদ্ধি, (২) অ্যামিনো অ্যাসিডসমৃদ্ধ শস্য, (৩) মানুষের তৈরি প্রোটিনযুক্ত খাদ্য।

আমেরিকার Purdue University এমন ভুট্টা ফলনে সফল হয়েছেন, যা সাধারণ ভুট্টার চেয়ে দ্বিগুণ প্রোটিনসমৃদ্ধ বিশেষ করে লাইসিন (Lycin) নামে অ্যামিনো অ্যাসিড এতে বর্তমান, যা জান্তব প্রোটিনের বিশেষত্ব। পশুদের এই ভুট্টা খাইয়ে দেখা গেছে যে, সাধারণ ভুট্টা খেয়ে সাত দিনে তাদের যা ওজন বাড়ে, উক্ত

ভুট্টা খেয়ে সাত দিনে তার তিনগুণ ওজন বেড়েছে।

অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা সমৃদ্ধ শস্যের ফলনেও আমেরিকা সাফল্য লাভ করেছে এবং ভারতবর্ষে সেই শস্য রপ্তানী হবার পরিকল্পনাও আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এর দ্বারা বুঝতে পারবেন—সাধারণ গম ও এই অ্যামিনো অ্যাসিডসমৃদ্ধ গম খাওয়ায় মানুষের ওজনের কতটা তারতম্য হয়।

গুয়াটামালায় Incaparina নামে একটি প্রোটিনযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রবর্তন করেছেন বৈজ্ঞানিকেরা। সেটি কয়েক প্রকার শস্য, তুলার বীজ, সয়াবীনের ময়দা ও ঈষ্ট (Yeast) সহযোগে প্রস্তুত, উপরন্তু তাতে যোগ করা হয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ও ভিটামিন-এ। প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ নিবারণে Incaparina অদ্ভুত কাজ দিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রস্তুত এরূপ আর একটি খাদ্যের নাম Saridele। তাতে আছে মটর, সাগু, সয়াবীন ও গুঁড়া দুধ।

আমেরিকার অনেকগুলি খাদ্য-প্রতিষ্ঠান কৃত্রিম মাংস, সামুদ্রিক মাছ বা সসেজ তৈরি করে বাজারে ছেড়েছেন। এগুলির স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ সবই আসল জিনিষের মত, পুষ্টিকর তো বটেই। জান্তব মাংসের সঙ্কোচনী শক্তি (Texture) এই কৃত্রিম মাংসে অনুকরণ করতে বহু যত্নে তাঁরা সফল হয়েছেন। ছাগল, ভেড়া বা মুরগীর মাংস চুষে ও চিবিয়ে যে স্বাদ পাওয়া যায়, এই মাংসেও সেই স্বাদ পাওয়া যায়, অথচ সম্পূর্ণ শস্যবীজের দ্বারাই এই মাংস তৈরি। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই সকল খাদ্যের বহুল প্রচলনে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব খানিকটা মিটবে এবং যেহেতু এগুলি মাছ-মাংস অপেক্ষা সস্তা, সেহেতু সাধারণ লোকেও এথেকে যথেষ্ট উপকৃত হবে। খাদ্যবস্তুর প্রকারভেদে খাদ্যমান বৃদ্ধি করবার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই ঈষ্টের (Yeast) ক্ষেত্রে। এই প্রোটিনসমন্বিত খাদ্য, চিনি বা গুড়ের গাদের ভিতর অতি অল্প সময়ে এবং অল্প ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ঈষ্ট খাদ্যগুণে মাংসের সঙ্গে তুলনীয় এবং যতটা প্রোটিন এই উপায়ে যে সময়ের ভিতর তৈরি করা যায়, প্রাণীর শরীরে ততটা পরিমাণ প্রোটিন তৈরি হতে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় লাগে। ঈষ্ট এভাবে তৈরির আর একটা সুবিধা এই যে, সূর্যালোক, জল, মাটি বা মানুষের পরিশ্রম ছাড়াই এটি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এই ঈষ্ট নানারকম খাদ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, নানারকম স্যুপ ও আইসক্রীম ইত্যাদিতে ব্যবহারের দ্বারা সেগুলি খাদ্যমান বৃদ্ধির সহায়কও হয়েছে।

সম্প্রতি পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ গুড় বা চিনির গাদ ছাড়া হাইড্রোকার্বন বা পেট্রোলিয়ামের উপরেও ঈষ্ট জন্মানো যায়। কতকগুলি অসুবিধা থাকলেও এই ব্যাপারে একটি প্রকাণ্ড সুবিধা এই যে, পেট্রোলিয়ামে জন্মানো ঈষ্টের পরিমাণ চিনির গাদের ভিতর জন্মানো ঈষ্টের দ্বিগুণ হয়; অর্থাৎ যে পরিমাণ চিনির গাদে নির্ধারিত সময়ে যতটা ঈষ্ট জন্মায়, সেই পরিমাণ পেট্রোলিয়ামে সেই সময়ের মধ্যে তার দ্বিগুণ ঈষ্ট জন্মায়। পেট্রোলিয়ামের গ্যাস অয়েল অংশেই সর্বাধিক ঈষ্ট জন্মায়। গ্যাস অয়েল, কেরোসিন তেলের জ্বালানীর কাজে লাগে। এর ভিতর যথেষ্ট মোম (Wax) থাকে। সেই জন্যে বিশেষভাবে পরিশোধনের পর গ্যাস অয়েল জ্বালানীর উপযোগী হয়। গ্যাস অয়েলে ঈষ্ট জন্মাবার ফলে সেই মোমের অংশটি ঈষ্ট সম্পূর্ণ পরিপাক করে ফেলে। এতে আরও একটি সুবিধা হয় যে, তেলটি তরল হয়ে যায় এবং ডিজেল ইঞ্জিন চালাবার

কাজে বা গৃহকর্মে জালানীর পক্ষে তেলটি সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে ওঠে।

এইভাবে উৎপন্ন ঈষ্ট-এ শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড ও ভিটামিন-বি থাকে। এর সর্বাপেক্ষা বেশী উপযোগিতার কারণ—এর ভিতর লাইসিন থাকে, যেটি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর অথচ সাধারণতঃ শস্যের মধ্যে এটি খুবই কম পাওয়া যায়।

এই ঈষ্ট পরিষ্কার করে শুকিয়ে নেবার পর চূর্ণাকার বা ছোট ছোট টুক্‌রায় পরিণত হয়। প্রথমে আশঙ্কা করা গিয়েছিল যে, পেট্রোলিয়ামের উপর জন্মানো ঈষ্ট দুর্গন্ধযুক্ত হবে, খাদ্যে ব্যবহার করা চলবে না। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিশোধনের পর দেখা গেছে, এই ঈষ্টে কোনই গন্ধ থাকে না এবং নানা খাদ্যের মধ্যে সহজেই এটি ব্যবহার করে সেই খাদ্যের মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সাধারণতঃ মাছ-মাংসের Sauce-এ এই ঈষ্ট এখন বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে।

পেট্রোলিয়ামের প্রয়োজন প্রধানতঃ জালানীর জন্যে এবং পেট্রোলিয়াম পৃথিবীতে অপর্যাপ্ত নয়; তথাপি বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, খাদ্য-ঘাটতি পূরণের জন্যে সমগ্র পৃথিবীতে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়ামের অতি সামান্য অংশ যদি ঈষ্ট উৎপাদনের জন্যে ব্যবহার করা হয়, তার ফল হবে আশাতীত—বছরে অন্ততঃ ২০ মিলিয়ন টন প্রোটিন এথেকে পাওয়া যাবে।

দেখা গেছে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে কাঠ (Cellulose) থেকে চিনি প্রস্তুত করা যেতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে জীবাণুর সাহায্যে সেলুলোজ থেকে খাদ্য প্রস্তুতের সম্ভাবনাও দেখা যায়। কতকগুলি পতঙ্গের (যেমন—উই) পাকযন্ত্রে এমন কতকগুলি জীবাণু থাকে, যাদের সাহায্যে এরা কাঠ খেয়ে হজম করে। এই জীবাণু প্রচুর পরিমাণে লেবরেটরীতে উৎপন্ন করা সম্ভব হলে কাঠের গুঁড়া থেকে খাদ্য প্রস্তুত হবার প্রচুর সম্ভাবনা। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন, সে খাদ্য জীবজন্তু—এমন কি, মানুষেরও কাজে লাগবে।

# সঞ্চয়ন

## ভাইরাসবাহিত রোগ প্রতিরোধের অভিনব ভেষজ

সাধারণতঃ সর্দি-কাশি থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত ভাইরাস বা অতি ক্ষুদ্র জীবাণুবাহিত নানা রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার স্বাভাবিক শক্তি বাড়িয়ে ঐ সকল রোগ নিয়ন্ত্রণ করবার একটি ভেষজ সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন।

বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ঐ সকল রোগের ভাইরাসের দ্বারা কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হলে এই ভেষজের সাহায্যে তাকে নিরাময় করা সম্ভব। ঐ ওষুধটি শুঁখলেই সর্দি-কাশি সেরে যাবে। আর ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলে রোগীকে এই ধরণের ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

গত ১৩ই নভেম্বর (১৯৬৮) আমেরিকার ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট্স্ অব হেলথ এই ওষুধ আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। ইনষ্টিটিউট অব এলার্জি অ্যাণ্ড ইনফেকসাস ডিজিজেস-এর ভাইরোলোজিষ্ট বা জীবাণু-বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্যামুয়েল ব্যারন এবং নিউইয়র্ক মেডিক্যাল কলেজের অফ্থ্যালমোলোজিষ্ট বা চক্ষুরোগ চিকিৎসক ডাঃ জন এইচ. পার্ক এই ভেষজ আবিষ্কার করেছেন।

প্রাণীদেহের কোষ যে সকল উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে আর. এন. এ.। মানুষ ও পশুর দেহের ইন্টারফেরন নামে একটি জিনিষ ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে থাকে এবং ইন্টারফেরন উৎপাদনে সাহায্য করে আর. এন. এ.। বিজ্ঞানীদ্বয় সংশ্লেষণ করে কৃত্রিম আর. এন. এ. তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

ডাঃ ব্যারন বলেছেন যে, এপর্যন্ত এই ওষুধের কার্যকারিতা খরগোশ, ইঁদুর এবং টেষ্ট-টিউবে রক্ষিত মানবদেহের কোষের উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তবে মানুষের উপর এই ওষুধ প্রয়োগ করলে তার যে কোন রকম ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হবে না, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্যে পশুদেহের উপর এই ওষুধটি আরও কিছু কাল প্রয়োগ করে তার প্রতিক্রিয়াদি লক্ষ্য করা উচিত। তবে আজ পর্যন্ত এই ওষুধ প্রয়োগের পর কোন ক্ষেত্রেই কোন রকম ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি।

এই নতুন আবিষ্কারের ফলে ভাইরাসবাহিত সকল রকম রোগ প্রতিরোধ করবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তার মূলে আছে কিন্তু দু-জন বৃটিশ বিজ্ঞানীর ইন্টারফেরন-এর আবিষ্কার। প্রায় দশ বছর আগে বহু গবেষণার পর এই দু-জন বিজ্ঞানী ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেছিলেন এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা যে কি, তা জানতে পেরেছিলেন।

তারপর থেকে সমগ্র বিশ্বেই নানা স্থানের গবেষণাগারে কৃত্রিম ইন্টারফেরন তৈরি করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নি। ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেলথই এভাবে এই বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছে।

ডাঃ ব্যারন বলেন যে, ইনষ্টিটিউট প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম আর. এন. এ. তৈরি করেছে। খরগোশের ভাইরাসবাহিত সংক্রামক চক্ষুরোগে এবং কনজাংটিভাইটিজ রোগে এই সকল ওষুধ প্রয়োগ করে তাদের নিরাময় করা হয়েছে। এই

ওষুধ প্রয়োগ করে এই সকল রোগ নিরাময় যে সম্ভব, তা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ডাঃ ব্যারন সাংবাদিকগণের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি বলেছেন যে, প্রাণীর দেহের ইণ্টারফেরনের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর. এন. এ. সাহায্য করে থাকে। এজন্যে মানুষ ও পশুর ক্ষেত্রে বহু রকমের ভাইরাসবাহিত রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে এই ওষুধটি খুবই কাজে লাগবে। আর ইণ্টারফেরন প্রকৃতিজাত উপাদান বলে কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই এই ওষুধটি মানুষের ব্যবহারের উপযোগী হবে এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যাবে।

বর্তমানে বসন্ত, হাম, শিশুপক্ষাঘাত বা পোলিওমায়েলাইটিস এবং অন্যান্য বহু ভাইরাসবাহিত রোগের আক্রমণ টিকার সাহায্যে প্রতিরোধ করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে ঐ সব এবং ভাইরাসবাহিত নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে আর. এন. এ-র কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহ এই দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে। ঐ সব অঞ্চলে ভাইরাসবাহিত রোগ বসন্ত প্রভৃতি মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে, টিকা দেবারও সময় পাওয়া যায় না। এই ওষুধ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হলে ঐ সব ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে। তাছাড়া ঐ সব এলাকায় গবাদি পশুরও অনেক সময়ই মড়ক লাগে। তাদেরও এই ওষুধের সাহায্যে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা যাবে।

## গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চর্মরোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

গ্রীষ্মমণ্ডলে বহুল দৃষ্ট একটি চর্মরোগের উৎসের সন্ধানে দু-জন ব্রিটিশ পরজীবী-বিশেষজ্ঞ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন।

এই রোগটির নাম লিসমানিয়াসিস (Leishmaniasis), পরজীবী অ্যামিবয়েড লিশমানিয়ার (Leishmania) দ্বারা এটির উৎপত্তি হয়ে থাকে। ব্রেজিলে এই রোগ খুব বেশী দেখা যায় এবং এই রোগে মুখের বিকৃতি ঘটে, যাকে বলা হয় এসপাণ্ডিয়া (Espundia)। ঐ দেশের কয়েকটি অঞ্চলে এই রোগ এত সাধারণ ব্যাপার যে, যে বনে প্রবেশ করলে ঐ রোগ সংক্রামিত হতে পারে, সেই বনে যদি কোন কর্মী প্রবেশ করে, তাহলে খনি ও কাঠ-ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলি তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করে থাকে। এই রোগ যখন চর্মরোগ হয়ে দেখা দেয়, তখন নাক ও গলার কিছু অংশ ক্ষয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

যে দু-জন পরজীবী-বিশেষজ্ঞ তাঁদের গবেষণায় অগ্রগতির কথা জানিয়েছেন, তাঁরা হলেন ডাঃ আর, লেনসন ও ডাঃ জে. শ। তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লিশমানিয়াসিস রোগ নিয়ে গবেষণা করেছেন। হণ্ডুরাস ও পানামায় প্রাথমিক গবেষণার পর তাঁরা বর্তমানে ব্রেজিলের উত্তর প্রান্তে গবেষণা করছেন।

স্যাণ্ড ফ্লাইয়ের (Sand fly) দংশন থেকে লিসমানিয়াসিস রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। ১৯৬৭ সালের শেষার্ধে ডাঃ লেনসন ও ডাঃ শ ৩০০০ স্যাণ্ড ফ্লাই ব্যবচ্ছেদ করে ৮টি স্যাণ্ড ফ্লাইয়ের দেহে পরজীবী অণুর সন্ধান পান। ব্রেজিলের বনাঞ্চলে স্যাণ্ড ফ্লাই-ই যে এই রোগ ছড়ায়, এথেকে তা সমর্থিত হলো। তাঁরা দেখালেন, ঠিক কোন্ শ্রেণীর স্যাণ্ড ফ্লাই এই দুষ্কর্মের জন্যে দায়ী। ঐ একই সময় তাঁরা দেখালেন, লিশমানিয়াসিস রোগ আমদানী করে থাকে হ্যামস্টার শ্রেণীর বন্য ইঁদুর। এই রোগ মুখ্যতঃ বন্য ইঁদুরদের রোগ

এবং তারাই এই রোগ সংক্রমণের চিরন্তন উৎস। এই রোগের উৎস ও সংক্রমণ পদ্ধতির সম্পর্কে ডাঃ লেনসন ও ডাঃ শ-এর আবিষ্কার রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান জোগাবে। গবেষণাকালে দু-জন ডাক্তারই গিনিপিগের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হাত-গুটানো জামা পরে বনের মধ্যে ঢুকে মাছির কামড় খেয়ে তাঁরা এই রোগ ধরিয়ে এনেছিলেন এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু-মাস ধরে রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলেন।

এর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে রোগ প্রতিরোধ ও উন্নততর চিকিৎসা-ব্যবস্থা। লিশমানিয়াসিস রোগ নিরাময় হয় অ্যান্টিমোনিয়াল ড্রাগ ও অ্যান্টি-বায়োটিক (সদ্য-উদ্ভাবিত) প্রয়োগে। কিন্তু গোড়াতেই যদি রোগ ধরা না পড়ে, তাহলে এই রোগ নিরাময় হলেও এমন স্থায়ী দাগ রেখে যায় যে, অনেক সময় ক্ষত দেখে কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল বলে ভুল হয়। আরোগ্য লাভের পর রোগীকে বলতে শোনা গেছে, নাকটা ফিরে পাওয়া গেল না। এই রোগ চিকিসার জন্যে যথেষ্ট সংখ্যক মেডিক্যাল কর্মী পাওয়া যায় না।

এই রোগ দূরীকরণের তিনটি পথ খোলা আছে —এক—টিকার উদ্ভাবন; দুই—রোগের বাহক স্যাণ্ড ফ্লাই নির্মূল করা; তিন—রোগের উৎস বন্য ইঁদুর ধ্বংস করা।

ডাঃ লেনসনের গবেষণায় দেখা গেছে, বন্য ইঁদুরগুলি এমনভাবে সংক্রামিত যে, তাদের নির্মূল করবার কোন আশাই নেই। রোগের বাহক স্যাণ্ড ফ্লাই ধ্বংস করবার কিছু উপায় বের করা যেতে পারে। টিকা উদ্ভাবনের চেষ্টাও এপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। লেনসন ও শ-এর গবেষণার অন্যতম বিষয় ছিল এমন পরজীবীর সন্ধান করা, যাতে অল্প মাত্রায় এই রোগ হয় এবং বসন্ত রোগের মত এই রোগেরও টিকা আবিষ্কার করা যায়। এপর্যন্ত এই অনুসন্ধান সফল হয় নি, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

## রক্তপরীক্ষার অভিনব পদ্ধতি

মনুষ্য ও প্রাণীদেহে রক্তের উপস্থিতি সম্বন্ধে মানুষ বহুকাল ধরে ওয়াকিবহাল, কিন্তু রক্তের নিয়ত সঞ্চালনের খবর মানুষের অনেক দিন পর্যন্ত জানা ছিল না। একজন ইংরেজ ডাক্তার রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন।

এই ইংরেজ ডাক্তার উইলিয়ম হার্ভি দেখালেন, হৃৎপিণ্ড একটি পাম্পের মত কাজ করে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এমন কি, আঙুলের ডগায়, পায়ের পাতায় বিশুদ্ধ রক্ত পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আবার দূষিত রক্ত ফিরিয়ে নিয়ে ফুসফুসের মাধ্যমে তাকে পরিশোধন করে নিচ্ছে। আবার সেই পরিশোধিত রক্ত সর্বত্র পাঠিয়ে দিচ্ছে। হৃৎপিণ্ড সারাজীবনব্যাপী এই ভাবে কাজ করে চলেছে।

এই কাজ যথাযথভাবে করতে হলে রক্তকে বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু রক্তে নিজের কতকগুলি রোগ হয়ে থাকে। বর্তমানে অবশ্য এই রোগগুলিকে দমিত বা পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে।

রক্ত রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কি না, তা জানবার এখন অনেক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। আঙুলের ডগা থেকে নেওয়া এক ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যায়, রক্তে রোগজীবাণু উপস্থিত আছে কি না, বা রক্তে কোন প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব আছে কি না।

কিন্তু এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার লোক রক্তে রোগজীবাণুর জন্যে মারা যাচ্ছে। কারণ ঠিক সময়ে রক্ত পরীক্ষা

কমানো অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। রক্তের নমুনা পরীক্ষা করবার জন্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়। অগ্রগতিসম্পন্ন দেশগুলিতেই এই রকম শিক্ষিত কর্মীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে, অনগ্রসর দেশের তো কথাই নেই।

এখন ভাইকারস লিমিটেড নামে একটি বৃটিশ ফার্ম এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যা ঘণ্টায় ৩০০টি রক্তের নমুনা পুরাপুরি পরীক্ষা করে দিতে পারে।

লণ্ডনের একটি হাসপাতালে এরূপ একটি যন্ত্র ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের অনেক রোগ সূচনাতেই ধরা পড়বে ও রোগীকে দ্রুত নিরাময় করে তোলা যাবে।

বর্তমানে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারেরা চিকিৎসা সুরু করতে পারেন না—রক্ত পরীক্ষা করতে দু-তিন দিন সময় লাগে। নতুন যন্ত্রটির সাহায্যে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা চিকিৎসা সুরু করতে পারবেন—কেন না, রক্ত পরীক্ষার বস্তুতঃ কোন সময়ই ব্যয় হবে না।

## মহাদেশগুলি কি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে?

পৃথিবীর মহাদেশগুলি কি একটি বিরাট ভূখণ্ডেরই টুক্‌রা? একটি বিরাট ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে এসেই কি এগুলির সৃষ্টি হয়েছে?

অনেক বিজ্ঞানীই একথা বিশ্বাস করেন এবং নতুন যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে এই কথাই সমর্থিত হয়।

গত ৪০ বছর ধরে এই মতবাদ নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। যাঁরা এই মতের সমর্থক, তাঁরা বলেন, পৃথিবীর মহাদেশগুলি একসময় পরস্পর সন্নিবদ্ধ ছিল এবং একটিমাত্র বিশালাকার ভূখণ্ড ছিল। ২০ কোটি বছর আগে ভূগর্ভনিহিত কোন শক্তি এই ভূখণ্ডকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে।

তারপর থেকে মহাদেশগুলি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। এই মতানুসারে, তেজস্ক্রিয়তায় অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ গলিত উপকরণের প্রচণ্ড উত্তাপে সমুদ্রের তলা ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে এবং তারই ফলে এসব ঘটছে।

আমেরিকা এবং ব্রেজিলের ভূ-বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এর প্রমাণ পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের একদিকে আফ্রিকা আর একদিকে ব্রেজিল। ঐ মহাসাগরের আফ্রিকার উপকূলবর্তী দুটি অঞ্চল এবং ব্রেজিলের উত্তর-পূর্ব উপকূলবর্তী দুটি পার্বত্য অঞ্চল যেন একটি অঞ্চলেই দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—এই রকম প্রমাণ সাওপালো বিশ্ববিদ্যালয় এবং ম্যাসাচুসেট্‌স ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। দুটি অঞ্চল যেন খাপে খাপে লেগে যায়। আকৃতিগত প্রমাণ ছাড়া অন্য প্রমাণও তাঁরা পেয়েছেন। ম্যাসাচুসেট্‌স ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর ভূ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ প্যাট্রিক এম. হার্লি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রধানতঃ উভয় মহাদেশেই যে সব জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে, সে সব এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার গঠনাকৃতি পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে যে ভূতাত্ত্বিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, তা এই প্রথম ম্যাসাচুসেট্‌স ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজী এবং সাওপালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যালোচনার ফলেই জানা গেছে।

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান এবং মহাকাশ সংস্থা এবং ফরাসী মহাকাশ সংস্থাও এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন। এই দুটি

সংস্থাই কৃত্রিম উপগ্রহের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে উর্ধ্বাকাশ থেকে ছুটি মহাদেশের অবস্থিতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এই বিষয়ে চূড়ান্তভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই সম্ভব হতে পারে।

## পঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

পাঁচ বছরের মধ্যে এই প্রথম আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিরাট অঞ্চলে আবার মরুভূমি অঞ্চলের পঙ্গপালের বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। লণ্ডনের ডেজার্ট লোকাষ্ট ইনফরমেশন সেন্টারে ইতিমধ্যে পঙ্গপাল দেখা দেবার শতাধিক রিপোর্ট এসে পৌঁচেছে। রাজস্থানের পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলি থেকেও এই সংবাদ এসেছে।

লণ্ডনের ' ডেজার্ট লোকাষ্ট ইনফরমেশন সার্ভিস ( ডি-এল-আই-এস ) থেকে গত নভেম্বর মাসে পঙ্গপালের পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়। পঙ্গপাল আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে ডি-এল-আই-এস মূল্যবান কাজ করছেন।

প্রতি মাসেই ডি-এল-আই-এস আক্রমণ এলাকার আশেপাশের দেশগুলিকে প্রকৃত অবস্থার বিবরণ ও পরিণামের পূর্বাভাস পাঠান। এর ফলে অব্যবহিত কোন বিপদাশঙ্কা থাকলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

১৯৪৩ সাল থেকে অ্যান্টি লোকাষ্ট রিসার্চ সেন্টারের ( এ-এল-আর-সি ) অন্যতম কাজ হিসাবে ইনফরমেশন সার্ভিস কাজ করে আসছিল। ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থা এবং বৃটিশ সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ মরুভূমি পঙ্গপাল প্রকল্পের অংশ হিসাবে ডি-এল-আই-এস স্থাপিত হয়। ডি-এল-আই-এস রাষ্ট্রসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ( এফ-এ-ও ) এবং মরুভূমি পঙ্গপালপীড়িত দেশগুলি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে।

বর্তমান পঙ্গপাল আবির্ভাবের বিরুদ্ধে এফ-এ-ও একটি জরুরী অভিযান সংগঠন করছেন। এই বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে ২৮৫,০০০ ডলার অনুমোদিত হয়েছে। আক্রান্ত অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছে, গাড়ি ও কীটঘ্ন পদার্থ পাঠানো হচ্ছে এবং পঙ্গপালের ঝাঁককে ছত্রভঙ্গ করবার জন্যে বিমানযোগে ওষুধ ছড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

পঙ্গপালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাষ্ট্রসংঘ খুবই যত্নশীল। রাষ্ট্রসংঘ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে পাঁচ বছরের একটি প্রকল্প ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ করেন এফ-এ-ও-এর ডেজার্ট লোকাষ্ট কনট্রোল কমিটি। এই প্রকল্পে শত শত কনট্রোল অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং পঙ্গপালের জন্মস্থানগুলি জরীপ করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ( ইউ-এন-ডি-পি ) পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে দু-বছরের জন্যে ( ১৯৭০ সালের জুনে শেষ হবে ) ৪৩৫,০০০ ডলার দেবার ব্যবস্থা করবেন।

# হাইড্রোপোনিক্স বা জল-চাষ

প্রদোষচন্দ্র রায়চৌধুরী

বহু যুগ হইতে মানুষ মাটিতে চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করে। সেই মাটিতেই শাক, আলু, বেগুন, ধান, গম হইতে আরম্ভ করিয়া আম, জাম প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ, বেল, চাঁপা, গোলাপ প্রভৃতি ফুলগাছ এবং দেবদারু, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বিশালকায় মহীরুহ জন্মাইয়া পাতা, ফল, ফুল ও কাঠ ব্যবহারের জন্য নেয়। চাষ বলিতে আমরা বুঝি, বলদ বা ঘোড়ার সাহায্যে লাঙ্গল দিয়া মাটি-চাষ, বীজ বপন এবং সময় মত ফসল তোলা।

কিন্তু আজকাল মাটি ব্যবহার না করিয়া অন্য উপায়ে চাষের প্রবর্তন হইতেছে। বিনা মাটিতে চাষ করিবার চেষ্টা হইতেছে। বালি এবং জলে চাষ (Sand culture and water culture) করা আরম্ভ হইয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বালি ও জলে চাষ করিয়া নানা প্রকারের পরীক্ষা করিতেছেন। এই দুই উপায়ে গাছ জন্মাইয়া তাহাদের পুষ্টির জন্য খাদ্য কি ভাবে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্বন্ধেও গবেষণা চলিতেছে।

Hydroponics অর্থাৎ মাটি ছাড়া জলে চাষের কৌশল সম্বন্ধে আমাদের জানা উচিত। এই উপায়ে অন্য দেশে অনেক রকম গাছের চাষ হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্য-বাহিনীর খাদ্যের জন্য ঐ উপায়ে ব্যাপক-ভাবে টোমেটো প্রভৃতি নানা রকমের তরি-তরকারীর চাষ করা হইয়াছিল। মহাসাগরের মধ্যস্থিত মরুভূমিসদৃশ অনুর্বর দ্বীপের মধ্যেও জল বা বালিতে চাষ করিয়া নানা প্রকারের ফুল, ফল ও তরিতরকারী জন্মান হইয়াছিল।

যদিও জমিতে চাষ না করিয়া এই দুই উপায়ে নানা প্রকারের চাষ বিভিন্ন দেশে হইতেছে, তথাপি সহজেই বুঝা যায় যে, সেই জন্য জমিতে চাষ করিবার কোনও অসুবিধা বা ক্ষতি হইবে না। যদিও বিনা মাটিতে চাষে ব্যাপক পণ্য উৎপাদন (Large scale soilless culture) প্রথা বহু স্থানে প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি পৃথিবীর সর্বত্রই বেশীর ভাগ লোকই মাটিতে চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিবে। ভূমিতে চাষ কিংবা ভূমিহীন চাষের দ্বারা উৎপন্ন ফসলে কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। একই রকমের আলো, তাপ বা দুইটি গাছের মধ্যে দূরত্ব রাখিয়া দুইটি ভিন্ন উপায়ে চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একই প্রকারের এবং সমপরিমাণ ফসলই উৎপন্ন হয়।

বালিতে চাষ করিতে গেলে যে গাছের চাষ করা হইবে তাহার উপযোগী একটি বড় পাত্রে স্ফটিকের গুঁড়া বালি (Quartz sand) রাখিতে হইবে। বালি যেন খুব মিহি না হয়, কারণ তাহা হইলে তাহার ভিতর দিয়া জল ও বাতাস সহজে যাইবে না। কখনও কখনও সরু বালির বদলে পরিষ্কার নুড়ি পাথর বা কাঁকর ব্যবহার করা হয়। উপর হইতে যাহাতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া গাছের পুষ্টিকর দ্রবণ (Nutrient solution) বালির উপর পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাকে Drip culture বলে। অতিরিক্ত দ্রবণ যাহাতে বালি হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার জন্য পাত্রের নীচে বিশেষভাবে বন্দোবস্ত রাখা হয়।

বালি-চাষে একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে গাছের শিকড়গুলি ভূমি-চাষের প্রায় সকল সুবিধাই পায়।

জলে চাষ করিতে হইলে যে কাজের জন্য এবং যে প্রকার গাছের চাষ করা হইবে, তাহার উপযুক্ত পাত্র ব্যবহার করিতে হয়। প্রয়োজন-মত লোহা, তামা, টিন, কাচ, মাটি বা প্লাষ্টিকের বোতল, হাঁড়ি, বারকোষ বা চৌবাচ্চা ব্যবহার করা যাইতে পারে। লতানে গাছ, অথবা চারা গাছগুলিকে এমনভাবে শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে যেন সর্বদা জলের মধ্যে থাকে।

দেখা গিয়াছে যে, একই প্রকারের গাছ-গাছড়া একই রকমের জল-বায়ুতে প্রায় একই রকমের রাসায়নিক যৌগের বিভিন্ন আনুপাতিক দ্রবণে একই প্রকারে বর্ধিত হয়।

উদ্ভিদ-বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সকল প্রকারের উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে প্রধানতঃ ছয় প্রকারের মৌল খাদ্য হিসাবে নিজের দেহসাৎ করে। বৈজ্ঞানিক Shive বলেন—নাইট্রোজেন, সালফার, ফস্ফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম—এই ছয়টি মৌল তাহাদের দ্রবণীয় যৌগ রূপে শিকড়ের দ্বারা গাছের ভিতর বিশোষিত হয়। তিনি প্রথমে নিম্নলিখিত ত্রিযৌগ দ্রবণ (Three salt culture) ব্যবহার করিতেন—ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, $Ca(NO_3)_2$, পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফস্ফেট, $KH_2PO_4$, এবং ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট $MgSO_4$। কখনও কখনও তাহার মধ্যে জৈব-রাসায়নিক পদার্থ (Metabolic element) রূপে সামান্য দ্রবণীয় লোহার যৌগ মিশাইতেন।

পরে Arnon,, Hoagland, Shive এবং Robbins ঐ দ্রবণ বদলাইয়া নিম্নলিখিত দুইটি মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করেন।

১। 0·001 M, $KH_2PO_4$ (পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফস্ফেট)
0·005 M, $KNO_3$ (পটাসিয়াম নাইট্রেট)
0·005 M, $Ca(NO_3)_2$ (ক্যালসিয়াম নাইট্রেট)
0·002 M, $MgSO_4$ (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট)

২। 0·0023 M, $KH_2PO_4$
0·0045 M, $Ca(NO_3)_2$
0·0023 M, $MgSO_4$
0·0007 M $(NH_4)SO_4$ (অ্যামোনিয়াম সালফেট)

(এখানে M—আণবিক ওজন)

ইহাদের প্রতি লিটারে জৈবপদার্থ হিসাবে ফেরিক টারট্রেটের (Ferric tartrate) 0·5% দ্রবণের এক মিলিলিটার মিশানো হয়। কখন কখন ঐ সকল চাষ দ্রবণের (Culture solutions) এক লিটারে সম্পূরক দ্রবণ হিসাবে নিম্নলিখিত মিশ্রিত দ্রবণের এক মিলিলিটার মিশানো হয়।

1·50 গ্র্যাম $MnCl_2$, $4H_2O$ (ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড)
0·05 গ্র্যাম $MoO_3$ (মলিবডিনাম অক্সসাইড)
2·50 গ্র্যাম $H_3BO_3$ (বোরিক অ্যাসিড)
0·10 গ্র্যাম $ZnCl_2$ (জিঙ্ক ক্লোরাইড)
0·05 গ্র্যাম $CuCl_2$, $2H_2O$ (কপার ক্লোরাইড)

(জল-চাষ করিতে আগ্রহশীল পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার জন্য উপরের মিশ্রিত দ্রবণ-গুলির যৌগের অনুপাত দেওয়া হইল)

Meyer, Hamner এবং তাঁহাদের সহকর্মী বৈজ্ঞানিকগণ জল-চাষ দ্রবণের যৌগগুলির ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের এবং জৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহের অনুপাতের নানাবিধ তারতম্য করিয়া নানা প্রকারে দ্রবণ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। সহজেই যৌগগুলির ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের অনুপাতের তারতম্য করা যায় বলিয়া বালি-চাষ অপেক্ষা জল-চাষ অধিক সুবিধাজনক।

প্রভূত ফসল পাইতে হইলে যে সকল

সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার তাহার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

১। কোনও এক প্রকারের চাষের সময়ে সকল দ্রবণের অস্মোটিক চাপ একই হওয়া উচিত। তাহা যেন ২ বায়বীয় চাপের বেশী না হয়।

২। চাষ-দ্রবণের pH যেন বেশী পৃথক না হয়। কিন্তু Arnon এবং Golmson দেখাইয়াছেন যে, কোন কোন প্রকারের গাছ-গাছড়ার জল-চাষের সময়ে দ্রবণের pH 4 হইতে pH 8 পর্যন্ত হইলেও গাছের পুষ্টির তারতম্য হয় না।

৩। যেহেতু অধিকাংশ গাছ-গাছড়া বাতান্বিত (Aerated) চাষ-দ্রবণে ভালভাবে বিকশিত ও পুষ্ট হয়, সেহেতু দ্রবণের মধ্যে চাপ দিয়া বায়ুর ছোট ছোট বুদ্‌বুদ পাঠান উচিত। তাহা হইলে সেগুলি বাতান্বিত হয়।

৪। সকল প্রকারের ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন গাছের মধ্যে একই পরিমাণে বিশোষিত হয় না। গাছের মধ্যে জলের এবং ভিন্ন ভিন্ন আয়নগুলির বিশোষণ (Absorption) একই অনুপাতে হয় না। ইহা ছাড়া অনেক রকমের আয়ন এবং জৈব পদার্থ গাছের শিকড় হইতে বাহির হইয়া দ্রবণে প্রবেশ করে। সেই জন্য চাষের সময়ে কিছু পরে দ্রবণের সংযুতি এবং ঘনমাত্রার পার্থক্য হয়। সেই জন্য বহুল পরিমাণে জল-চাষ করিবার সময় মাঝে মাঝে দ্রবণের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং যে যৌগ কমিয়া যায়, তাহা দ্রবণে মিশাইতে হয়। সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যবহৃত দ্রবণ ফেলিয়া দিয়া নতুন টাট্‌কা দ্রবণ ঢালিয়া দেওয়া হয়।

৫। অনেক সময় দেখা যায় যে, দ্রবণ হইতে নানা পদার্থ অধঃপতিত হইয়া ঘনমাত্রা বদলাইয়া দেয়। বিশেষতঃ লৌহঘটিত যৌগ pH 6.0 কি তাহার বেশী দ্রবণ হইতে সর্বদা অধঃপতিত হয়। সেই জন্য লৌহের ঘাট্‌তি পূরণের জন্য লৌহ যৌগের দ্রবণ মাঝে মাঝে মিশাইতে হয়। Homer প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ আয়রন হিউমেট (Iron humate) ব্যবহার করেন, কারণ তাহা হইতে লৌহ সহজে অধঃপতিত হয় না। ম্যাঙ্গানিজ এবং ফস্‌ফেট যৌগের বেলায়ও বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

আজকাল আমাদের অনেকের ড্রয়িং রুমে কাচের পাত্রে জলের মধ্যে চারা গাছ, লতানে গাছ রাখিয়া ঘরের শোভা বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু কি প্রণালীতে চারাকে বাঁচাইয়া তাহাতে ফুল ও মাঝে মাঝে ফল উৎপন্ন করা যায়, তাহা অনেকেরই জানা নাই। অনেকে মাঝে মাঝে জল বদলান। কিন্তু এই সব সত্ত্বেও খাদ্যের অভাবে গাছ মরিয়া যায়।

টোম্যাটো প্রভৃতি ছোট ছোট তরিতরকারী বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া ছোট ছোট ব্যবসা করা বিশেষ অসুবিধাজনক নহে। বাড়ীর ছাদে বা উঠানের এক কোণে সে সব জল-চাষ করা যায়।

# খাদ্যে জীবাণুঘটিত বিষক্রিয়া

## সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংরক্ষণ করা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। শহরে সকল খাবারই টাট্‌কা অবস্থায় পাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই বরফে ঢাকা মাছ, বোতলে পাস্তুরাইজ করা দুধ, টিনে প্যাক করা বিস্কুট, সেলোফেন কাগজে মোড়া টফি, পলিথিনের ব্যাগে কর্ণফ্লেক্‌স্‌, বোতলে ভরা আমের আচার. জ্যাম, জেলী—এমন কত জিনিষই আমাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সব সংরক্ষিত খাবার সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে না পারলে অনেক সময় বিপদের সম্ভাবনা আছে। কারণ খাদ্যে জীবাণুঘটিত পচনের ফলে কখনও কখনও বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হয়। এমন সব খাদ্য খাওয়ার ফলে মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

এই জীবাণুগুলি অনেক প্রকারের। মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এদের চেহারাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এরা কখনও এককোষী, কখনও বা বহুকোষী, কোনটা ছোট, কোনটা বা সে তুলনায় অনেক বড়। এদের নানা রকমের নাম দেওয়া হয়েছে; যেমন—ব্যাক্‌টিরিয়া, ঈষ্ট, মোল্ড, ভাইরাস, রিকেট্‌সিয়া ও প্রোটোজোয়া। এদের প্রত্যেকের চেহারা ও স্বভাব আলাদা এবং অসংখ্য প্রকারের এই সব জীবাণু সর্বদাই আমাদের আশেপাশে রয়েছে। মাটিতে, জলে ও বাতাসে এদের সব সব সময়েই পাওয়া যাবে। সৌভাগ্যের কথা—এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ জীবাণুই আমাদের সাধারণতঃ কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু বাকী সব জীবাণু মানুষের শরীরে নানারকমের রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এই সব ক্ষতিকর জীবাণু আমাদের শরীরে যাচ্ছে অথবা আমাদের খাবারে মিশছে, কিন্তু তবু সব সময় ক্ষতি করছে না। তার কারণ আমাদের শরীরে তাদের মেরে ফেলবার উপকরণও তৈরী রয়েছে। তবে যখন এরা সংখ্যায় অনেক বেড়ে ওঠে, তখনই শরীরে রোগের আবির্ভাব হয়। খাদ্যদ্রব্যেও জীবাণুগুলি বেশীক্ষণ থাকলে বংশবৃদ্ধি করে সংখ্যায় অসংখ্য হয়ে ওঠে, তখনই আমরা দেখতে পাই খাবারটা পচে উঠেছে। অনেক সময় পচা খাবারে ছাতার মত উপরে একটা সর পড়ে যায়। তখন খালি চোখে আমরা জীবাণু দেখতে পাই। এরা সংখ্যায় তখন লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি। এই পচা খাবার খেলে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা আছে। তাই কি ধরণের জীবাণু রয়েছে—তা যতটা ভয়ের বিষয় নয়, সংখ্যায় তারা কত—সেটাই বেশী ভয়ের কারণ।

এই জীবাণুগুলি যেখানে-সেখানে বাড়তে পারে না। জীবাণুগুলির বাঁচবার ও বাড়বার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। দেখা যায়—মরুভূমিতে যে ধরণের গাছপালা হয়, পাহাড়ে সে ধরণের গাছপালা হয় না বা নদীর উপত্যকায়ও একই জাতের গাছ হতে পারে না। তেমনি একই পরিবেশে সব জীবাণু বাঁচতে পারে না। এদের বাঁচবার জন্যে প্রধানতঃ উপযুক্ত খাদ্য দরকার। সাধারণতঃ আমরা যা খাই, অনেক জীবাণুরই তা উপযুক্ত খাদ্য। সে কারণেই খাদ্য সংরক্ষণ শিল্পে ও খাদ্য ব্যবহার প্রসঙ্গে জীবাণু সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

আরও দেখা গেছে যে এক এক প্রকারের

খাদ্যদ্রব্যে এক এক প্রকারের জীবাণু ভাল বাঁচতে পারে। ফলে—জ্যাম, জেলী, পাউরুটি ইত্যাদি পচলে, উপরে ছাতার মত দেখা যায়। সেগুলি সাধারণতঃ মোল্ড জাতীয় জীবাণু। চিনির খাবার, ফলের রস, আখের রস ও গুড় জাতীয় দ্রব্য পচতে সুরু করলে অ্যাককোহল বা মদের গন্ধ পাওয়া যায়। এতে ঈষ্ট জাতীয় জীবাণুই বেশী বাড়তে পারে। তখন এই সব জিনিষকে ঘোলা দেখায়। এই ঈষ্ট-ই পাউরুটি, বিস্কুট করবার কাজে লাগে। তাছাড়া এই ঈষ্টের সাহায্যেই নানা ধরণের মদ তৈরি করা হয়। আবার মাছ, মাংস অথবা দুধ পচলে বাইরে থেকে অনেক সময় কিছু দেখা যায় না। কিন্তু দুর্গন্ধ থেকে অনুমান করা যায় যে, জীবাণুগুলি অনেক বেড়ে উঠেছে। এই ধরণের খাবারে প্রধানতঃ ব্যাক্‌টিরিয়া জাতীয় জীবাণুই বেশী বাড়তে পারে। এই সব জীবাণু শুধু যে খাবার খায় বা খাবারে বেড়ে ওঠে তাই নয়—এরা নানা রকমের রাসায়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি করে। তার ফলে খাদ্যদ্রব্য কখনও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, কখনও টক হয়ে যায়, কখনও বা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ঈষ্ট যেমন চিনিকে ভেঙ্গে অ্যালকোহল করে, আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডও সৃষ্টি করতে পারে, সেরূপ কোন কোন ব্যাক্‌টিরিয়া অ্যাসিড তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায়—দুধ থেকে দই তৈরি হলে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এতে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কতকগুলি ব্যাক্‌টিরিয়া বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে, যেগুলি শরীরে মারাত্মক রকমের ক্ষতি করতে পারে। আমরা তখন বলি 'ফুড পয়জন' হয়েছে। মাছ, মাংস জাতীয় খাবার থেকেই বেশী 'ফুড পয়জন' হবার ঘটনা ঘটেছে—দেখা যায়; অর্থাৎ এই ধরণের খাদ্যই বিষাক্ত ব্যাক্‌টিরিয়ার বাঁচবার উপযুক্ত স্থান। Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus ও Salmonella জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়াই এই ধরণের 'ফুড পয়জন্'-এর জন্যে দায়ী।

যে সব খাদ্যে অ্যাসিড বেশী আছে এবং শস্য জাতীয় খাদ্যে প্রধানতঃ মোল্ডের আবির্ভাব বেশী দেখা যায়। আবার বিভিন্ন খাদ্যে বিভিন্ন জাতের মোল্ডের প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে; যেমন—নানা রকমের শস্যে Alternaria ও Fusaria জাতের মোল্ড; চাল, লেবুজাতীয় ফল ও দুগ্ধ-জাত দ্রব্যে Penicillia জাতের মোল্ড; তৈলবীজ ও বাদাম প্রভৃতিতে Aspergilli জাতের মোল্ড এবং পাউরুটি ও বিস্কুট জাতীয় খাদ্যে Mucorales জাতের মোল্ডের বৃদ্ধি বেশী হতে দেখা গেছে।

এত দিন বিশ্বাস ছিল যে, মোল্ড আমাদের শরীরের ক্ষতি করে না। পচা ফল, চাট্‌নী, আচার, পাউরুটি, চাল, গম প্রভৃতি খেয়ে 'ফুড পয়জন' হয়েছে—এমন বড় একটা শোনা যায় নি। কিন্তু জানা গেল, আমাদের এই ধারণা সত্য নয়। গত ৩০ বছর যাবৎ গৃহপালিত পশুর নানা ধরণের রোগের কথা জানতে পারা যায়, যেগুলির কারণ কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার চেয়েও ভয়ের বিষয় এই যে—টিকা দিয়ে এসব রোগের কোন প্রতিকার হয় না। এগুলি ছোঁয়াচে রোগও নয়, অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধও কোন কাজ করে না। এই জাতীয় রোগে অনেক সময় কোন কোন ভিটামিনের অভাব দেখা যায়। ভিটামিন প্রয়োগ করেও রোগ সারানো যায় না। ব্যাক্‌টিরিয়া থেকে যে বিষাক্ত পদার্থ বেরোয়, তা রাসায়নিকভাবে প্রোটিন। কিন্তু এই যে সব নতুন রোগ দেখা যাচ্ছে, তা প্রোটিন জাতীয় বিষাক্ত পদার্থের জন্যে নয়, অর্থাৎ শরীরে কোন জীবাণুর বৃদ্ধির জন্যে রোগ হচ্ছে না—কোন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের জন্যে এই ধরণের রোগ দেখা দিচ্ছে।

১৯৬০ সালে ইংল্যাণ্ডে কয়েকটি পোল্‌ট্রি

ফার্মে প্রায় ১ লক্ষ টার্কির মৃত্যু হয়েছিল। এই রোগকে তখন বলা হতো "Turkey X disease"। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, ব্রেজিল থেকে যে চীনাবাদামের খইল এসেছিল—তা খাওয়ার জন্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। Aspergillus flavus জাতের মোল্ডের বৃদ্ধি এতে হয়েছিল, যা বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে। পরে সেই ধরণের খইল থেকে এক বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন করা হলো, যার নাম দেওয়া হলো Aflatoxin। এর পর বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে দেখতে পেলেন আরও অনেক মোল্ড আছে, যারা নানা ধরণের বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত করতে পারে। এই সমস্ত মোল্ড থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়:—

(ক) Hepatotoxins—যা লিভারের ক্ষতি করে এবং তাথেকে Cancer-ও হতে পারে। Aspergillus flavus থেকে যে বিষ নির্গত হয়, তার নাম Aflatoxin ও Amanita phalloides থেকে যে বিষ বেরোয় তার নাম phalloidines।

(খ) Nephrotoxins—যা কিড্‌নীর ক্ষতি করে। Penicillium citrinum থেকে Citrinin নামে এক ধরণের পদার্থ নির্গত হয়, যা এই জাতীয় ক্ষতির জন্যে দায়ী।

(গ) Neurotoxins—যা মস্তিষ্ক ও নার্ভের উপর কাজ করে, তার ফলে সেখানে রক্তক্ষরণও হতে পারে। Patulin নামক পদার্থ থেকে এই ধরণের বিপদ হয় এবং Penicillium patulum জাতের বিষ সৃষ্টি করে।

(ঘ) Photodynamic dermatoloxins—এক ধরণের চর্মরোগ দেখা গেছে, যাকে বলা হয় "Pink Celery Rot" রোগ। Sclerotinia Sclerotiorum নামে মোল্ড থেকে 8-methoxy psoralen ও 4-5′-8 trimethyl psoralen, এই দুটি বিষ নির্গত হতে দেখা গেছে—যার ফলেই এই জাতের চর্মরোগ হয়।

মোল্ড থেকে খাদ্য যে বিষাক্ত হতে পারে—তা অনেক কাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। মধ্যযুগেও দেখা গেছে—Ergot রোগের কারণ, পচা পাউরুটি (রাই বা যব থেকে তৈরি)। Claviceps purpurea জাতীয় মোল্ড ছিল এর জন্যে দায়ী। ছাতাধরা চাল খেয়ে পায়রার মৃত্যু হয়েছে, এমন ঘটনাও দেখা গেছে। মোল্ড থেকে খাদ্য বিষাক্ত হওয়ার অনেক সংবাদ জাপান ও রাশিয়া থেকে পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালে কোরিয়া থেকে যে সব উদ্বাস্তু জাপানে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পচা ভুট্টা খাবার ফলে। ছাতাধরা চাল খেয়ে জাপানে 'ফুড পয়জন' হয়েছিল, দেখা গেল Fusarium জাতের মোল্ড এই চালে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আমাদের দেশে চাল, গম ইত্যাদি শস্য, এবং চীনাবাদাম প্রভৃতি প্রধান খাদ্যরূপে গণ্য হয়। এখানকার গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এসব খাবারে সহজেই মোল্ড হতে পারে; বিশেষতঃ যখন এই শস্য বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নত ধরণের গুদামজাত করবার সুযোগ-সুবিধা আমাদের কম। আমাদের মত গরমের দেশে লিভারের অসুখও বেশী হয়; লিভার ক্যান্সারও যথেষ্ট দেখা যায় এবং এসব রোগ যে পচা বা আধপচা শস্য খেয়ে হচ্ছে না, তা আমরা এখনও বলতে পারি না। ভবিষ্যতে এর ফল আরও খারাপ হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই আমাদের এখন খাদ্যে বিষক্রিয়া সম্পর্কে আরও সাবধান হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

# পৃথিবীর মানুষের চন্দ্র প্রদক্ষিণ

মানুষের মহাকাশ পরিক্রমার যে শুভ সূচনা হয়েছিল ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রুশ মহাকাশ-চারী য়ুরি গাগারিনের ভস্তক-১ মহাকাশযান-যোগে একবার পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণে, তার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর অধ্যায় রচিত হলো ১৯৬৮ সালে ২৪শে ডিসেম্বর মার্কিন মহাকাশচারী বোরম্যান, লোভেল এবং অ্যাণ্ডার্স-এর অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানযোগে চন্দ্রের কক্ষপথ দশবার পরিক্রমায়। এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর তিনজন মানুষ চন্দ্র প্রদক্ষিণ করলেন এবং চন্দ্রের অদৃশ্য দিক স্বচক্ষে দেখতে পেলেন। এর আগে যে সব রুশ ও মার্কিন মহাকাশচারী মহাকাশ প্রদক্ষিণ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধনের মধ্যে। অ্যাপোলো-৮-এর অভিযানেই প্রথম পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন ছিন্ন করে ৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরবর্তী চন্দ্র প্রদক্ষিণের পরিকল্পনা করা হয়। এই অভিযান যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি দুঃসাহসিক।

২১শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কেনেডি থেকে এই দুঃসাহসিক অভিযানের সূচনা হয়। তখন অতি শক্তিশালী 'স্যাটার্ন-৫' রকেটের পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিন একসঙ্গে প্রজ্বলিত হয়ে ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার কিলোগ্র্যাম ধাক্কা মেরে ১১০ মিটার দীর্ঘ রকেট ও অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযানকে (সর্বসমেত ওজন ২৮ লক্ষ কিলোগ্র্যাম) ৬১ কিলোমিটার উঁচুতে তুলে দেয় আড়াই মিনিট সময়ের মধ্যে।

প্রথম পর্যায়ের এই কাজ শেষ হবার পর পাঁচটি ইঞ্জিনই খসে পড়ে যায়, কিন্তু তার আগে মহাকাশযান ও রকেটে গতি সঞ্চার করে দেয় ঘণ্টায় ৯৬০০ কিলোমিটার। এই কাজের জন্যে প্রতি ইঞ্জিনে সেকেণ্ডে ১৩,০০০ লিটার কেরোসিন ও তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ জ্বালানীরূপে প্রজ্বলিত হয়।

প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় পর্যায়ের পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিন চালু হয়। এই ইঞ্জিনগুলি সাড়ে ৬ মিনিটের মধ্যে ৫০০ টন তরল হাইড্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনের মিশ্রণ জ্বালানী প্রজ্বলিত করে মহাকাশযানটিকে ৫ লক্ষ কিলোগ্র্যাম ধাক্কা মেরে ১৮৯ কিলো-মিটার উঁচুতে তুলে দেয় এবং তাতে গতি সঞ্চার করে ঘণ্টায় ২২ হাজার কিলোমিটার।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় পর্যায়ের কাজ সুরু করে দেয় একটি মাত্র জে-২ ইঞ্জিন। স্বল্পকাল প্রজ্বলিত হয়ে মহাকাশ-যানের গতি ঘণ্টায় ২৮ হাজার কিলোমিটারে বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি মহাকাশ-যানের সঙ্গে যুক্ত থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকে। মহাকাশযানের পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে মহাকাশচারীরা পৃথিবীর সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান ব্যবস্থা, মহাকাশযানের অভ্যন্তরে শৈত্য-তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি সব কিছু পরীক্ষা করে দেখেন।

সমস্ত কিছু ঠিকমত কাজ করায় ভূপৃষ্ঠের মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি থেকে বিজ্ঞানীদের নির্দেশ পেয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করে মহাকাশচারীরা তাঁদের যানে চন্দ্রের দিকে পাড়ি দেন। তখন তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি আবার চালু হয় এবং মহাকাশযানের গতি বাড়িয়ে দেয় ঘণ্টায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। কিছুক্ষণের মধ্যেই রকেটটি নিবিয়ে দেওয়া হয় এবং মহাকাশযান তার নিজস্ব গতিতে চন্দ্রের দিকে ছুটে চলে।

চন্দ্র থেকে ৮০ হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা অবস্থায় মহাকাশযানের গতি কমতে থাকে এবং চন্দ্র থেকে ৪৮ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে গতি কমে আসে ঘণ্টায় ৩,৩৬০ কিলোমিটারে। ঠিক সে-সময় চন্দ্রের অভিকর্ষ তাকে দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৯১ কিলোমিটার। এই সময় মহাকাশচারীরা বিপরীতমুখী একটি ছোট রকেট চালু করে এই গতিবেগ কমিয়ে ঘণ্টায় ৫,৯০০ কিলোমিটারের মধ্যে নিয়ে আসেন। এই গতিবেগই মহাকাশযানকে চন্দ্রের কক্ষপথে স্থাপন

বাম হইতে দক্ষিণে—ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, উইলিয়াম এ. অ্যাণ্ডার্স এবং জেমস এ. লোভেল

টানতে সুরু করে। ফলে চন্দ্রের দিকে তার গতি আবার বাড়তে থাকে। কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হবার প্রায় ৬৬ ঘণ্টা পরে এবং চন্দ্র থেকে ৯ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে গতিবেগ করে দেয়। ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পেয়ে মহাকাশচারীরা তখন চন্দ্র প্রদক্ষিণ সুরু করেন। চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে তাঁরা ভূপৃষ্ঠে চন্দ্রের টেলিভিশন ছবি প্রেরণ করেন। নানা দৃষ্টিকোণ

থেকে চন্দ্রকে দেখেন এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের সম্ভাব্য পাঁচটি স্থান পর্যবেক্ষণ করেন। চন্দ্রের কক্ষপথ পরিক্রমায় সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল ৩১৫ কিলোমিটার এবং সর্বনিম্ন দূরত্ব ছিল ১১২ কিলোমিটার।

মহাকাশচারীরা চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন দশবার এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ·২ ঘণ্টা। প্রত্যেক প্রদক্ষিণের সময় ৪৫ মিনিট কাল ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে মহাকাশচারীদের কোন যোগাযোগ ছিল না, কারণ তখন মহাকাশযানটি আবর্তন করছিল চন্দ্রের অদৃশ্য দিকে (যে দিকটা পৃথিবী থেকে কোনদিনই দেখা যায় না)। চন্দ্র অভিমুখে যাত্রার সময় তিনজন মহাকাশচারী পর্যায়ক্রমে দু-জন ঘুমিয়েছিলেন ও একজন জেগেছিলেন এবং আহার করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্র প্রদক্ষিণকালে তাঁদের সকলকে কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, কেউই ঘুমুতে পারেন নি।

২০ ঘণ্টা ধরে চন্দ্রকে দশবার প্রদক্ষিণের পর মহাকাশচারীরা চন্দ্রের অভিকর্ষ-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্যে রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিন আবার চালু করেন। সে সময় প্রধান ইঞ্জিনটি মহাকাশযানকে ঘণ্টায় ৮৮০০ কিলোমিটার গতিবেগে পৃথিবীর দিকে ঠেলে দেয়। তখন পৃথিবীর সঙ্গে মহাকাশচারীদের কোন যোগাযোগ ছিল না, কারণ তাঁরা তখন ছিলেন চন্দ্রের অপর দিকে, যেখান থেকে কোনক্রমেই বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় না। পৃথিবীর দিকে যাত্রার উদ্যোগক্ষণে মহাকাশচারীরা বিশ্ববাসীর কাছে বড়দিনের শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন। চন্দ্রের অভিকর্ষবন্ধন ছিন্ন করে আসবার পর্যায়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্কটজনক। ইঞ্জিনটি ঠিকমত চালু না হলে সমূহ বিপদ ঘটতে পারতো।

পৃথিবীর অভিকর্ষের এলাকায় প্রবেশ করবার পর মহাকাশযানের গতিবেগ বেড়ে ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত ওঠে। এই প্রচণ্ড গতিবেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় মহাকাশযানটিকে একটি বিশেষ কোণে চালিত করতে হয়। মহাকাশচারীরা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে যানটিকে এমনভাবে চালিত করেন, যাতে তাপরোধের আবরণসহ মহাকাশযানের চ্যাপ্টা দিকটি পৃথিবীর দিকে থাকে। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যানের সংঘর্ষের ফলে যে ২২০০ থেকে ৩৩০০ ডিগ্রী সেঃ তাপ সৃষ্টি হয়, তা তাপরোধক আবরণটি শোষণ করে নেয়।

সর্বসমেত ১৪৭ ঘণ্টায় মহাকাশে মোট ৮ লক্ষ কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পর পৃথিবী থেকে ৭২০০ মিটার উঁচুতে দুটি প্যারাশুট খুলে তিনজন মহাকাশচারীসমেত যানটিকে হাওয়াই দ্বীপের প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নামিয়ে দেয়। তারপর হেলিকপ্টারযোগে তিনজন মহাকাশচারীকে জল থেকে তুলে কাছাকাছি অপেক্ষমান একটি জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়।

অ্যাপোলো-৮-এর পরম দুঃসাহসিক চন্দ্র অভিযান মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মহাকাশবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক অতুলনীয় কৃতিত্বের স্বর্ণাক্ষর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই রোমাঞ্চকর অভিযানের ৬ দিন সারা পৃথিবীর মানুষ গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অ্যাপোলো-৮-এর মহাকাশ পরিক্রমার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল এবং সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছিল, মহাকাশচারী তিনজনের নিরাপদে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

# সরল কণা+ ও কোয়র্ক মডেল++

পূর্ণাংশু রায়

"স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল,
সেই তারি আনন্দ।।"

পদার্থবিদ্যার জগতে আজ অবিশ্রান্ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কঠিন অবস্থার পদার্থবিদ্যায়, আলোকতত্ত্বে, জ্যোতির্বিদ্যায় কিংবা পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে বটে, তবে এদের বিন্দুমাত্র হেয় না করেই বলা যায় যে, তথাকথিত মৌলিক বা সরল কণার* ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পূর্ণ জোয়ার এসেছে। অভূতপূর্ব এই পরিবর্তন, অচিন্তনীয় এর উত্তালতা;

+ এটা খুব বেশী দিনের কথা নয় যখন সরল (elementary) কণা বা মৌলিক (fundamental) কণার মধ্যে কোন পার্থক্য করা হতো না। কণাবিদ্যার যে আমূল পরিবর্তন আসন্নপ্রায় তারই বিকৃত ছায়া পড়েছে কণাদের নতুন নামকরণে। একদল পদার্থবিদের মতে নিউক্লীয় জগৎ সাম্যবাদী; সেখানে কুল-শীলের স্থান নেই, অর্থাৎ ষোল আনাই গণতন্ত্র। ভাষান্তরে নিউক্লীয় বলের (force) আইনে সব কণাই সমান (আরো নির্ভুলভাবে বললে বলতে হয়: গুরু অন্তঃক্রিয়ার (strong interaction) আইনে সব হাড্রনরাই সমান)। আরেকাংশের মতে এ-জগতেও হয়তো অরওয়েলীয় (জর্জ অরওয়েলের নামানুসারে) ভাষার প্রয়োজন; অর্থাৎ সব সরল কণাই নিউক্লীয় শক্তির চোখে সমান বটে, তবে কিনা কিছু সরল কণা আছে যারা বেশী মাত্রায় সমান! এই প্রবন্ধে পূর্বোক্ত কণাদের নামকরণ করা হয়েছে সরল কণা; শেষোক্তদের মৌলিকতা অবশ্য প্রমাণসাপেক্ষ। কণা পদার্থবিদ্যার যে চিত্র এখানে আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে যদি অদূর ভবিষ্যতে সরল কণাদের জটিল কণা আর তথাকথিত মৌলিক কণাদের সরল কণা বলা হয়, তাহলে চমকে ওঠবার বিশেষ কারণ থাকবে না।

++ বিজ্ঞান আজ সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক অর্থে আন্তর্জাতিক। তাই তার নানান সংজ্ঞা কেবলমাত্র তথাকথিত বাংলা শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রবন্ধকারের মতে, কোন আঞ্চলিক (তা সে যত বড় অঞ্চলই হোক না কেন) ভাষার 'নিজস্ব' শব্দের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী-জোড়া প্রচেষ্টার পূর্ণবিকাশ আজ অসম্ভব। তাই 'পরদ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা' হলেও সব ভাষাই কম-বেশী বিদেশী শব্দ বেমালুম হজম করে চলেছে। তবে 'শুভস্য শীঘ্রম' এই নীতি অনুসরণ করে এই আন্তর্জাতিক চৌর্যবৃত্তিতে পারদর্শী হতে হবে। আন্তর্জাতিকতা বজায় রেখেই স্থানীয় প্রলেপ লেপন বাঞ্ছনীয় বলে কোন কোন সর্বগ্রাহ্য শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হলো না। লেখক এ-ব্যাপারে গুণীজনের সমবেত সম্যক প্রচেষ্টা আমন্ত্রণ করছেন।

প্রকাশ্যে প্রস্তাবিত নীতি অনুযায়ী quark-কে রাখা হলো কোয়র্ক, resonance-কে রেসনান্স ও nucleus-কে নিউক্লিয়াস। quantum রূপান্তরিত হয়েছে কণাতমে, আর baryon ভারিয়নে। অবশ্য আমাদের আন্তর্জাতিকতা উত্তরাধিকার সূত্রে কিঞ্চিৎ কাহ্নিক-খাওয়া; দুশো বছরের অধিককাল পশ্চিমী সাহচর্যের ফল। charge-কে, বাংলা প্রতিশব্দ আধান সত্ত্বেও, কেন চার্জ বলা হয়েছে তার কারণও সহজে অনুমেয়। এই একই কারণে পজিটিভ (positivc) নেগেটিভ (negative), প্লাস (plus), মাইনাস (minus) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে, বাংলা প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও।

* সরল কণাদের সরল ও সহজ পরিচিতির জন্যে গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '৬৮ সংখ্যা শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বর্তমান প্রবন্ধটি শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়েছিলো। —স.

এর ইঙ্গিত যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, এর অর্থও তেমন অপরিমেয় সম্ভাবনাপূর্ণ। হয়তো এই কারণেই যেখানেই শুধু পদার্থবিদ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই সরল বা মৌলিক কণার পদার্থবিদ্যা—এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। জ্ঞান-গম্ভীর পণ্ডিতজনের জন্যে অবশ্য নস্যাৎ না করবার মত নীরস কারণ বিদ্যমান; সেটা হলো—স্রেফ সংক্ষিপ্তকরণ।

এই শতাব্দীর গোড়ার তিন দশকে পরমাণু (atom) তৈরির উপাদান হিসাবে মাত্র তিনটি কণার কথাই ভাবা যেত। তারা হলো আলোক কণা বা ফোটন, নেগেটিভ চার্জবাহী ইলেকট্রন ও পজিটিভ চার্জবাহী প্রোটন। পরবর্তী দুই দশকে এদের সামান্য সংখ্যা বৃদ্ধি হলো, যোগ করতে হলো পজিটিভ চার্জবাহী পজিট্রন, চার্জ-বিহীন নিউট্রন, দু-রকমের চার্জবাহী মিউয়ন ও তিন প্রকারের পায়ন। এর পরের কথা সংক্ষেপে বলা যায় না। বললে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে; এত ঘন ঘন অথচ চিত্তাকর্ষকভাবে সরল কণাদের সংখ্যা বেড়েছে ও বাড়ছে। বড় বড় শক্তিশালী ত্বরায়কের (accelerator) দৌলতে এই সব কণার সংখ্যা আর পূর্বের মত সীমিত নয়; তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়। তার থেকেও আকর্ষণীয় হলো এই সব যন্ত্রের সাহায্যে সরল কণাদের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হচ্ছে তার সুদূর প্রসারী প্রভাব। শুধু নতুন নতুন সরল কণার সৃজনেই যে ত্বরায়কদের ক্ষান্তি, তা নয়। পুরনো দিনের কণারা, যাদের সঙ্গে পদার্থবিদ্‌রা সার্ধশতাব্দী কাটিয়ে অভিনব সমীক্ষা ও ততোধিক অভিনব তত্ত্বের সৃষ্টি করলেন, তারাও নব নব রূপ পরিগ্রহণ করে আজকের পদার্থবিদ্‌দের অনুসন্ধিৎসু মনকে অবিরাম গভীরভাবে নাড়া দিচ্ছে। তাই প্রোটন-নিউট্রনদের গঠনাকৃতির প্রশ্ন আজ বিদঘুটে মনে হয় না। এমন কি ফোটনের সম্ভাব্য জটিলতার কথা চিন্তা করতেও পদার্থবিদরা পেছপা নন। বস্তুতঃ পদার্থবিদ্যার তথাকথিত সরল কণাদের গঠনাকৃতির সমস্যা জটিলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে।

পদার্থবিদ্যার এই বহুমুখী প্রয়াসের মধ্যে একটি প্রচেষ্টা আজ প্রথিতযশা পদার্থবিদ্‌দের সারা মন-প্রাণ জুড়ে আছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তা হলো সরল কণাদের শ্রেণীবদ্ধকরণ বা সংক্ষেপে শ্রেণীকরণ; আরো সরল ভাষায় বললে বলতে হয়, সরল কণাদের জগতে একটি সমীক্ষা-গ্রাহ্য শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচেষ্টা। সুরুতেই বলবার প্রয়োজন যে, শ্রেণীকরণের আন্দোলন শুধু গুরু অন্তঃক্রিয়াশীল কণাদের অর্থাৎ তথাকথিত হাড্রনদের* মধ্যেই নিবদ্ধ। লেপ্‌টনরা

* হাড্রন (hadron)—১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রচেষ্টারে পদার্থবিদ্‌দের এক আন্তর্জাতিক সম্মিলনীতে এই শব্দটি চালু করেন রুশ পদার্থবিদ এল. বি. ওকুন। এর অর্থ হলো ভারী বা ভরসম্পন্ন। উৎপত্তি গ্রীক শব্দ আড্রস থেকে, যেখানে আ উচ্চারিত হয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে (আহ্‌ড্রস)। গ্রীক শব্দটি ইংরেজীতে রূপান্বিত হয়েছে হেড্রনে; হাড্রন এরই স্থানীয় অপভ্রংশ। নামকরণের আপাতদৃষ্টিতে হেতু—অপেক্ষাকৃত হাল্কা কণারা (যেমন, ইলেকট্রন, নিউট্রিনো, মিউয়ন ইত্যাদি) যারা শুধু লঘু (weak) অন্তঃক্রিয়ায় (তড়িৎ-চৌম্বক অন্তঃক্রিয়াকে যদি উপেক্ষা করা যায়) অংশ গ্রহণ করে, তাদের বলা হতো লেপ্‌টন। লেপ্‌টনের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ লেপ্‌তস (অর্থ—হাল্কা) থেকে। হাড্রনদের মধ্যে যারা বোস সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের বলা হয় মেসন; উৎপত্তি গ্রীক শব্দ মেসো (অর্থ—মধ্যবর্তী)। দুর্ভাগ্যবশতঃ লেপ্‌টনদের মধ্যে কিছু ফের্মিয়ন আছে যাদের মেসন বলা হয়, যেমন মিউ-মেসন। পদার্থবিদ্‌দের প্রকাশ ভঙ্গীও জীবনের সঙ্গে সংযোগ হারাতে পারে

হাড্রন বা লেপ্‌টন নামকরণ যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে তা মনে করবার বিশেষ কারণ নেই। মিউয়ন-ইলেকট্রন ভরানুপাত হলো প্রায় 207; আর

এখানে অচ্ছুত বা অস্পৃশ্য; কারণ অন্তঃক্রিয়াকে গুরু, লঘু ও তড়িৎ-চৌম্বক—এই তিন শ্রেণীতে ভাগার দৌলতে যখনই আমরা কেবল গুরু অন্তঃক্রিয়ার কথা ভাববো তখনই হাড্রনদের পংক্তিতে অন্য কারোর আসন পাবার অধিকার নেই। যদিও হাড্রনরা লঘু অন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে, নানান অনপচয় বা সংরক্ষণ নীতি লঙ্ঘন না করেও, লেপ্‌টন সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি বহুকালের জানা হাড্রনের বিটা ($\beta$) ক্ষয়ের কথা ভাবা যেতে পারে: $N \rightarrow P + e^- + \bar{\nu}$।

সরল কণাদের মধ্যে শৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা দু-ধারায় ভাগ করা যায়। প্রথম ও প্রধান ধারা হলো গাণিতিক গ্রুপ-তত্ত্বের ব্যাপক এবং, এক অর্থে, সার্থক প্রয়োগ। কণাদের পদার্থ-বিদ্যায় গ্রুপ-তত্ত্বের প্রয়োগ সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন। নিউট্রন আবিষ্কারের স্বল্পকাল পরেই হাইসেনবার্গ নিউক্লীয় ক্ষেত্রে প্রোটন ও নিউট্রনকে একটি দ্বি-প্লেট (doublet) গ্রুপে বেঁধে দিলেন। (এটা কি নেহাৎই আকস্মিক যে, হাড্রনদের সব চেয়ে পুরাতন সদস্যরা নিজেরাই সর্বাগ্রে একটা গ্রুপ সৃষ্টি করলো?)

এই গ্রুপের নামকরণ হলো সমভারিক অর্থাৎ আইসোবারিক (isobaric) বা আইসো-টোপিক (isotopic) গ্রুপ। কিছুদিন বাদেই এই সমভারিক গ্রুপের ধারণা খাটানো হলো অপেক্ষাকৃত কম-পুরাতন হাড্রনদের উপর; অস্থার্থ পায়ন-ত্রয় দেখা দিলো নতুন এক সমভারিক গ্রুপ হিসাবে। ব্যাপকতর ও সফলতর প্রয়োগের ফলে সমভারিক গ্রুপকে সংক্ষেপে অভিহিত করা হলো আই-স্পিন (i-spin) গ্রুপ বলে। পদার্থবিদ্যার পাতায় এই অধ্যায় স্থান-কাল নিরপেক্ষ SU(2)* গ্রুপের প্রয়োগ বলে সুবিদিত। SU(2) গ্রুপের এই ক্ষেত্রে মূল অবদান হলো নিউক্লীয় বলের একটি বৈশিষ্ট্যকে আকাঙ্খিত পূর্ণ গাণিতিক রূপ দান করা। আজকের দিনে নিউক্লীয় বলের চার্জনিরপেক্ষতার (charge independence) কথা পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের অজানা নয়; অনপরিচিত (non-strange) কণাদের বেলায় বহুকাল ধরে এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিতি আছে। এই চার্জ-নিরপেক্ষতার গ্রুপ-তত্ত্বীয় প্রকাশ হলো একটি গাণিতিক প্রকল্প (hypothesis)। সেটা হলো: যদি প্রাথমিক কণাদের মধ্যে ইউনিটারী রূপান্তরের (unitary transformations) কথা চিন্তা করা যায় তাহলে অন্তঃক্রিয়া শক্তির কোন পরিবর্তন হবে না। সংক্ষেপে এই হলো কণাদের আভ্যন্তরীণ SU(2) গ্রুপের আবির্ভাবের হেতু। চার্জ-নিরপেক্ষতাকে গ্রুপ-তত্ত্বীয় ভাষায় SU(2) সৌসাদৃশ্য (symmetry) বলা যেতে পারে। ভাষান্তরে, SU(2) রূপান্তরে অন্তঃক্রিয়া শক্তি অপরিবর্তনীয় (invariant) থাকবে। এই বৈশিষ্ট্যকেই পদার্থবিদ্‌রা বলেন SU(2) অপরি-বর্তনীয়তা (invariance)। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, SU(2) গ্রুপের বিভিন্ন মাত্রিক (dimensional) প্রতিভূয়নরা (representations) এক একটি আই-স্পিন গ্রুপের পরিচায়ক; সমমাত্রিক

পায়ন-ইলেকট্রন ভরানুপাত হলো প্রায় 270। সুতরাং ভরভিত্তিক নামকরণের স্বল্পস্থায়ী হবার সম্ভাবনা বেশী। হয়তো সিপ, উইপ ও ইপ (strongly interacting particles—sip; weakly interacting particle, wip; electromagnetically interacting particle, eip) গ্রহণীয় হলে জীবনের সঙ্গে বেশী যোগ থাকতো।

*"Special Unitary group of 2 dimensions"-কে সংক্ষেপে বলা হয় SU(2)। আইসোভারিক ক্ষেত্রে SU(2) গ্রুপের সঙ্গে পাউলি ইলেকট্রন তত্ত্বের SU(2) গ্রুপের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই।

ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। যেমন, প্রোটন-নিউট্রন বা কেয়নরা দ্বি-প্লেট, Λ°, এক-প্লেট (singlet), আর সিগমা-ত্রয় বা পায়নত্রয় জড়িত ত্রি-প্লেটের (triplet) সঙ্গে। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, কোন আই-স্পিন বহু-প্লেটের (multiplet) সদস্যদের মধ্যে ভর পার্থক্য অত্যন্ত অল্প। কাজেই SU(2) সৌসাদৃশ্য অব্যাহতভাবে প্রযোজ্য ধরে নিলে, মারাত্মক দোষ হবে না। এই অর্থে SU(2) সৌসাদৃশ্য একটি নির্ভুল বা সঠিক সৌসাদৃশ্য।

গ্রুপ তত্ত্বের সাহায্যে সরলকণা শ্রেণীকরণে বৈজ্ঞানিকদের যৌথ প্রচেষ্টার ব্যাপকতম ও সার্থকতম প্রচেষ্টা হলো প্রায় আট বছর আগে। ইতিমধ্যে পদার্থবিদ্‌দের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে অপরিচিত মেসন, ভারিয়ন ও তথাকথিত রেসনান্সদের সঙ্গে। ১৯৫৬ সালে জাপানী বৈজ্ঞানিক সাকাতা, তথাকথিত প্রাথমিক কণা (P, N) এর সঙ্গে অপরিচিত Λ-কণা জুড়ে অপরিচিত কণাগুলির বোঝবার চেষ্টা করলেন; তিনটে ভারিয়ন নিয়ে গঠিত এই সমষ্টির নাম হলো সাকাতন ত্রিপ্লেট। সাকাতার প্রচেষ্টাকে ফলবতী করতে উদ্যোগী হলেন তাঁর সহকর্মীরা, ইয়ামাগুচি ও ভেস। সাকাতন গ্রুপে তিনজন সদস্য থাকবার জন্যে তাঁরা দাবী করলেন যে, নিউক্লীয় অন্তঃক্রিয়া শক্তি, SU(2) নয়, SU(3) অপরিবর্তনীয় থাকবে, SU(3) গ্রুপেরই ত্রিপ্লেট প্রতিভূয়ন হলো সাকাতনরা। এর অল্প পরেই মঞ্চে আবির্ভূত হলেন আমেরিকান পদার্থবিদ্ মারে গেলম্যান ও ইস্রায়েলী পদার্থবিদ্ ইউভাল নিয়েমান। গ্রুপতত্ত্বীয় শ্রেণীকরণে এঁদের অবদান সর্বজনবিদিত। উভয়েরই মূল বক্তব্য হলো যে, ভারিয়ন সাকাতনদের মত SU(3) গ্রুপের ত্রি-প্লেট প্রতিভূয়ন নয়; পরন্তু তাদের SU(3) গ্রুপের অষ্টক বা অক্টেট (cctet) প্রতিভূয়নে ফেলার দরকার। অর্থাৎ তিনটা প্রাথমিক কণা নয়, প্রোটন-নিউট্রন, সিগ্‌মা হাইপেরন ও এক্‌সাই (xsi) দ্বিপ্লেটসহ আটটা ভারিয়নকে যুক্ত করতে হবে অক্টেট প্রতিভূয়নের সঙ্গে। এই হলো সুবিখ্যাত অক্টেট মডেলের সুরু। অক্টেট মডেল ও তার ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের আলোচনা এ-প্রবন্ধে করা হবে না। তবে বলা বাহুল্য যে. গ্রুপ-তত্ত্বের প্রয়োগ SU(3)-তেই থামে নি; বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে SU(6) এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আর এই দুরূহ গ্রুপ-তত্ত্বের প্রবক্তরা উচ্চশক্তিসম্পন্ন গণিতের সাহায্য নিতে বিন্দুমাত্র নারাজ হন নি।

বিশেষজ্ঞদের অবদানে গ্রুপ-তত্ত্বের নানান কেতাদুরস্ত প্রয়াসের অভাব নেই। বিভিন্ন সংজ্ঞার নাম শুনেই গ্রুপ-তত্ত্বের-সঙ্গে-পরিচয়-নেই বৈজ্ঞানিকরা আঁতকে উঠবেন। খুব সম্ভব কি পদার্থিক রসায়নবিদ্যায়, কি ধাতুবিদ্যায় অথবা অন্যান্য শাখায়, এই সব প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য। তাহলে প্রশ্ন উঠে যে বিদগ্ধ পদার্থবিদ্‌রা যা লিখছেন, যা বলছেন কিংবা যা ভাবছেন, তার মোদ্দা কথা সাধারণবোধ্য স্তরে উপস্থাপিত করা সম্ভব কি না? প্রশ্নের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না; তবুও এই প্রশ্নের উত্তর লেখকের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়। উত্তর দেবার কথাও নয়, কারণ এই রায় দেবার বিশেষ অধিকার শুধু পাঠকদেরই আছে।

তবে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, গ্রুপ-তত্ত্বের অবদানকে অতিক্রম করে তাকে সহজ সাধারণবোধ্য (প্রবন্ধকারের অর্থে) করে তুলতে বিশেষ সহায়তা করেছে সরলকণা শ্রেণীকরণের দ্বিতীয় ধারা। মূলধারার তুলনায় শীর্ণকায়া হলেও এর কার্যকারিতা অবহেলা করবার মত নয়। এই দ্বিতীয় ধারার প্রবাহে অনেকটা অবদানই গ্রুপ-তত্ত্বের; অবশ্য পরোক্ষে। SU(3) গ্রুপের সাফল্য পদার্থবিদদের প্রশান্তি

দিলেও তাঁদের উদরপূর্তি করতে পারে নি। গ্রুপ-তত্ত্বের চৌহদ্দির মধ্যে SU(3) সৌসাদৃশ্যের হেতু বা উৎস খুঁজে বের করা অসম্ভব প্রমাণিত না হলেও অত্যন্ত দুরূহ বটে; অক্টেট মডেল এর কোন হদিসই দেয় না। অবশ্য ছলের আশ্রয় নিয়ে বাধা এড়াবার জন্যে শুধু ধরে নিলেই চলে যে, এই সৌসাদৃশ্যের অস্তিত্ব বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত গ্রুপ-তত্ত্বীয় সুরের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু তাতে কেন যে SU(2) সৌসাদৃশ্য হতে হবে তা বোঝবার কোন সুরাহাই হবে না। পরন্তু এই সৌসাদৃশ্য ব্যাহত করবার জন্যে যে অন্তঃক্রিয়ার প্রয়োজন তার উৎস ও প্রকৃতির উপর কোন আলোকপাতই হবে না; তারা আমাদের বুদ্ধির নাগালের বাইরেই রয়ে যাবে।

SU(2) ও SU(3) সৌসাদৃশ্যের মধ্যে একটা প্রতীয়মান পার্থক্যের উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগেই বলা হয়েছে যে, SU(2) গ্রুপের অর্থাৎ আই-স্পিন বহু-প্লেটের সদস্যদের ভর প্রায় সমান। তাই নিউক্লীয় ক্ষেত্রে SU(2) সৌসাদৃশ্যের কার্যতঃ কোন ব্যতিক্রম নেই; বস্তুতঃ তড়িৎ-চৌম্বক অন্তঃক্রিয়ার মারফৎ এই সৌসাদৃশ্য ব্যাহত হতে পারে এবং পদার্থবিদ্‌রা এই তড়িৎ-চৌম্বক অন্তঃক্রিয়ার ফল হিসাবে আই-স্পিন বহু-প্লেটের সদস্যদের ভর পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন।* SU(3) এর বেলায় সদস্যদের ভর-পার্থক্য মোটেই অবহেলার বস্তু নয়; অক্টেট সদস্যদের মধ্যে $\Lambda^{\circ}$-কণার ভর নিউক্লিয়নদের (প্রোটন ও নিউট্রন) থেকে 176 Mev বেশী। অতএব কার্যক্ষেত্রে SU(3) সৌসাদৃশ্যের প্রয়োগ SU(2) সৌসাদৃশ্যের মত সঠিক নয় অর্থাৎ SU(3) সৌসাদৃশ্য সার্বিক বা সুপ্রযোজ্য নয়। জীবনের সঙ্গে তাল রাখতে গেলে প্রয়োজন নিউক্লীয় মানসম্পন্ন অন্তঃক্রিয়া, যার মারফৎ SU(3) সৌসাদৃশ্য প্রয়োজনমাফিক ব্যাহত হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় ধারার মূল লক্ষ্য হলো হাড্রনদের সম্ভাব্য ছবি বা মডেল খাড়া করা। সেই সব মডেলই গ্রহণীয় বলে গণ্য হবে, যাদের সাহায্যে হাড্রনদের পদার্থিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে নানান মডেলের প্রস্তাব আনা হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সরল, সবচেয়ে প্রত্যক্ষ যে মডেল তার অবতারণাই এখানে করা হবে।

আলোচ্য মডেলটির প্রবর্তন করেন অক্টেট মডেলের অন্যতম স্রষ্টা গেলম্যান। তিনি এই মডেলের প্রাথমিক কণাদের নামকরণ করেন কোয়র্ক। তাই যখনই কোন গুণবাচক শব্দ দিয়ে এর অর্থ সীমিত করা হয় না তখনই কোয়র্ক মডেল বলতে এই মডেলকেই বোঝায়। এই মডেলকে স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তাব করেন স্টিফান সোয়াইগ; তিনি এই মডেলের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তাই এই মডেলকে সংক্ষেপে G-Z* মডেল বলা হবে।

এই কোয়র্ক মডেল কি? এই মডেলের আলোচনা প্রসঙ্গে ধরে নেওয়া হবে যে, কণাদের বিশিষ্ট কণাতম সংখ্যা সম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞান, কণাদের স্পিন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, কণাগুলির বোসন ও ফের্মিয়নদের মধ্যে বিভাজন আর কণা ও প্রতি-কণা বা অ্যান্টি-কণা (antiparticle) সম্বন্ধে সাধারণ ধারণার কথা সবাই জানেন।

*নিউক্লীয় সাম্যবাদীদের মতে নিউক্লীয় জগতে গণতন্ত্র অব্যাহত। যত দোষ ফোটনের। অর্থাৎ ফোটন একটি অভিজাত কণা। তার অনুপ্রবেশে (শুরু অন্তঃক্রিয়াশীল সাম্যবাদী ক্লাবের সদস্যাধিকার থেকে অভিজাত ফোটন বঞ্চিত বলেই বোধ হয়) নিউক্লীয় সাম্যবাদ ব্যাহত।

*M. Gell-Mann, Phys. Lett. 8, 214 (1964); G. Zweig, Cern Preprint 8419/Th. 412 (1964).

অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, কোয়ার্কদের অবতারণার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে অ্যাণ্টি-কোয়ার্কদের অস্তিত্ব; এই অ্যাণ্টি-কোয়ার্কদের প্রয়োজন হবে জ্ঞাত সরল কণাদের ব্যাখ্যাতে।

সুরুতেই জানার দরকার যে, যত সরল কণাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি লাভের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যই বলুন—হয়েছে, তাদের যদি আরও প্রাথমিক কণাদের সাহায্যে বর্ণনা দিতে হয় তাহলে এই সব প্রাথমিক কণাদের ফের্মিয়ন হতে হবে পাউলি স্পিন-সংখ্যায়ন উপপাদ্যের খাতিরে। ফের্মিয়নদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত, সবচেয়ে সুবোধ হলো স্পিন $\frac{1}{2}$ ফের্মিয়ন। ফলে বোসনদের গঠন করা সম্ভব ফের্মিয়ন ও অ্যাণ্টি-ফের্মিয়নদের ঘন-বদ্ধ পরিস্থিতি হিসাবে। উপরন্তু যে সব হাড্রনরা ফের্মি সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের তৈরি করবার জন্যে প্রয়োজন একাধিক প্রাথমিক ফের্মিয়নের। কম পক্ষে অন্তত: দুটো প্রাথমিক ফের্মিয়নের প্রয়োজন; সমান ভারিয়ন সংখ্যা, অথচ বিভিন্ন চার্জের মান সৃষ্টি করবার জন্যে এদের চার্জের মান পৃথক হতে হবে। যদি এই প্রাথমিক ফের্মিয়ন কণাদের মধ্যে অন্তঃ-ক্রিয়া চার্জ-নিরপেক্ষ ধরা যায়, তাহলে যত পরিস্থিতিই আমরা সৃষ্টি করি না কেন তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা যাবে আই-স্পিন বহু-প্লেটে।

এবার পুরনো প্রশ্নে ফিরে আসা যাক, অর্থাৎ কোয়ার্ক মডেলের বিবরণীতে। কোয়ার্ক মডেলের উদ্দেশ্য হলো সরল কণাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দেওয়া। গেলম্যান-সোয়াইগ মডেলে কোয়ার্করা হলো তিনটি প্রাথমিক ফের্মিয়নের সমষ্টি। অর্থাৎ কোয়ার্করা হলো একটা ত্রি-প্লেট; আর এই ত্রি-প্লেটের সদস্যরা এক একটি ফের্মিয়ন। কোয়ার্ক ত্রি-প্লেট গঠিত হয়েছে একটা আই-স্পিন দ্বি-প্লেট ও একটি আই-স্পিন এক-প্লেট দিয়ে। দ্বি-প্লেট চিহ্নিত হবে (p, n) দিয়ে; আর এক-প্লেট $\lambda$ দিয়ে। অতএব $q=(p, n\ \lambda)$। কোয়ার্কদের বৈশিষ্ট্যমূলক কণাতম তালিকা নীচে দেওয়া হলো:

| | চার্জ সংখ্যা Q | ভারিয়ন সংখ্যা B | আই-স্পিন $I_3$ | অতিচার্জ Y | স্পিন |
|---|---|---|---|---|---|
| | | . | $I_3$ | $=2(Q-I_3)$ | |
| p | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 |
| n | —1/3 | 1/3 | —1/2 | 1/3 | 1/2 |
| $\lambda$ | —1/3 | 1/3 | 0 | —2/3 | 1/2 |

ট-কোয়ার্কদের লেখা হবে $q=(\bar{p}, \bar{n}, \bar{\lambda})$; এদের কণাতম সংখ্যা সংশ্লিষ্ট (corresponding) কোয়ার্কদের ঠিক বিপরীত; উদাহরণ হিসাবে বলা যায় $\bar{p}$-এর ভারিয়ন সংখ্যা হলো $-\frac{1}{3}$ $\bar{\lambda}$-এর চার্জ সংখ্যা হলো $\frac{1}{3}$। লক্ষ্য করবার বিষয় কোয়ার্কদের (অতএব অ্যাণ্টি-কোয়ার্কদেরও) অধিকাংশ কণাতম সংখ্যা হলো ভগ্নাংশিক। কোয়ার্ক-মডেলের মূল বক্তব্য হলো সমস্ত জ্ঞাত তথাকথিত মৌলিককণারাই হলো 'আরো মৌলিক' কোয়ার্ক ও অ্যাণ্টি-কোয়ার্কদের বিভিন্ন সমন্বয়ের ফল। কোয়ার্কদের তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে, যেহেতু মেসনদের ভারিয়ন সংখ্যা শূন্য সেই হেতু তাদের সবচেয়ে সরলভাবে গড়া সম্ভব $q\bar{q}$ জুটি দিয়ে। আর যেহেতু ভারিয়নদের বেলায় B-এর মান এক, অতএব এদের গড়তে দরকার qqq সমন্বয়। অর্থাৎ সমস্ত ভারিয়ন

তিনটি কোয়র্ক দিয়ে তৈরি; সমস্ত মেসন কোয়র্ক ও অ্যান্টি-কোয়র্ক জুটি দিয়ে তৈরি।

কোয়র্ক মডেলের মূলে দীর্ঘদিনের একটি ইতিহাস আছে। এর সুরু ফের্মি ও ইয়াং-এর* মডেল দিয়ে; এই মডেলকে সংক্ষেপে F-Y মডেল বলা হবে। F-Y মডেল খাড়া করা হয় পায়নদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দেবার জন্যে; এই মডেলে পায়নদের ভাবা হয়েছিল আসলে নিউক্লিয়ন ও অ্যান্টি-নিউক্লিয়নদের ঘন-বদ্ধ পরিস্থিতি (tighty bound state) হিসাবে। F-Y মডেলের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ বার বছর কেটে গিয়েছে। এই সব ঘন-বদ্ধ পরিস্থিতি মডেলরা কোনদিনই পদার্থবিদ্‌দের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে নি; তবে আজও যে পেরেছে সে কথা মনে করবার বিশেষ হেতু নেই। কোন প্রকার ভণিতা না করেই স্বীকার করে নেওয়া শ্রেয় যে, ক্ষেত্র-তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যা কিছু আপত্তিজনক তার সদুত্তর দিতে এইসব মডেল অপারগ। এই সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও মডেলরা নানান শিক্ষা দেয়; বস্তুত আজকের স্তরে যদি কোন রায় দিতে হয় তাহলে বলতে হয় যে, গ্রুপ-তত্ত্বের থেকেও এই মডেলভিত্তিক রাস্তার জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ। গোড়ার আলোচনা থেকেই স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে মডেলরা গ্রুপ-তত্ত্বীয় পন্থার প্রকাশ্য প্রতিভূয়ন। তাই গ্রুপ-তত্ত্বভিত্তিক ফলাফল এখানেও খাড়া করা সম্ভব; সুবিধা, আরো স্বচ্ছ, সহজ ও বোধ্য-ভাবে মডেলভিত্তিক পন্থায় সম্ভব। তবে এই সব ফলাফল অর্জন করতে গেলে যে সব গতি-সূত্রীয় (dynamical) ধারণার আশ্রয় নিতে হয় তারা আজও গ্রুপ-তত্ত্বের কাঠামোর বাইরে। অবশ্য এই সব মডেলরা যা কিছু বাড়তি ভবিষ্যদ্বাণী করে তা সমীক্ষসাপেক্ষ।

ফের্মি ও ইয়াং অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, নিউক্লিয়নদের কণাতম বৈশিষ্ট্য যদি দেওয়া থাকে তাহলে পায়নদের স্থান নির্ণয় করা খুব কঠিন নয়। কারণ পায়নদের চারিত্রিক কণাতম সংখ্যাসমূহ প্রস্তুত করা সম্ভব নিউক্লিয়ন (N) ও অ্যান্টি-নিউক্লিয়নদের ($\bar{N}$) সমন্বয়ে। তবে ধরে নিতে হবে যে, এই পরিস্থিতিতে $N\bar{N}$ জুটির মধ্যে আকর্ষণ এত তীব্র থাকবে যাতে এই ঘন-বদ্ধ পরিস্থিতি পায়ন-ভরের সূচক হতে পারে। আকর্ষণের তীব্রতা বোঝাবার জন্যে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, নিশ্চল অবস্থায় নিউক্লিয়নের ভর হলো প্রায় 939 Mev; আর পায়নের হলো প্রায় 138 Mev।

কোয়র্কমডেল অনুযায়ী শ্রেণীকরণে একটি প্রাথমিক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হলো সরল কণা বলে রেসনান্সদের গণ্য করা। প্রায় ষোল বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে ফের্মি প্রোটন-পায়ন সংঘাত অধ্যয়ন করেন। পড়ন্ত (incident) পায়ন শক্তি ও বিচ্ছুরণ অবচ্ছেদের মধ্যে তিনি একটা তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ্য করলেন। বিচ্ছুরণ অবচ্ছেদকে যদি পায়ন শক্তির ফাংশন হিসাবে অধ্যয়ন করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, পায়ন শক্তির মান যখন প্রায় 200 Mev তখনি বিচ্ছুরণ অবচ্ছেদ আকস্মিক বৃদ্ধি পায়; বস্তুতঃ একটি তথাকথিত সর্বোচ্চ-মান (maximum) লাভ করে। কিন্তু এই সর্বোচ্চমান বা শিখরের উচ্চতা এত তীব্র, শিখরের পাদতল এত স্বল্পায়তন যে, এই সর্বোচ্চ মানকে পায়ন-প্রোটন জুটির রেসনান্স বা বিশেষ এক ধরণের অনুরণন হিসাবে দেখার প্রয়োজন হলো। ভাবা হলো পায়ন-প্রোটনের কোন এক বিশেষ বদ্ধ অবস্থাই এই রেসনান্স বা উত্তেজিত স্তরের জন্যে দায়ী। কালক্রমে এই ঘন-বদ্ধ পরিস্থিতি বা রেসনান্স উন্নীত হলো নব সরল কণার স্তরে। অর্থাৎ পুরনো স্মৃতি ত্যাগ করে আধুনিক নামকরণ হলো $\Delta$-কণা বা

* E. Fermi and C. N. Yang, Phys. Rev. **76**, 1739 (1949)

ডেল কণা বলে। এই $\Delta$-কণা ভঙ্গুর, অর্থাৎ সৃষ্টির পরই ভাঙতে সুরু করে। ভাঙার মারফৎ পায়নকে উদ্গীরণ করে বিভিন্ন এক দিকে। উপরে উল্লিখিত সর্বোচ্চমান বা শিখরের উচ্চতা জ্ঞাপন করে $\Delta$-কণার নিশ্চল (rest) ভর, আর শিখরের পাদতল বা রেসনান্সের ব্যাপ্তি থেকে জানা যায় $\Delta$-কণার ক্ষয়কাল। দেখা গেল $\Delta$-কণার নিশ্চল ভর হলো 1236 Mev আর তার তথাকথিত জীবনকাল হলো $10^{-23}$ সে:। কালে $\Delta$-কণার সংখ্যা বৃদ্ধি হলো*: সর্বসমেত দেখা দিল $\Delta^{++}$, $\Delta^{+}$, $\Delta^{\circ}$, $\Delta^{-}$। এখানে $\Delta$-কে চিহ্নিত করা হয়েছে তার চার্জ-সংখ্যা হিসাবে। যেমন, $\Delta^{++}$ হলো দুটি পজিটিভ বা প্লাস চার্জবাহী। $\Delta$-কণাদের স্পিন-মান হলো 3/2।

করা যায়, যেমন নিউক্লিয়ন ও ইলেকট্রনদের সাহায্যে গঠন করা যায় নানাবিধ পরমাণু।

প্রথমে অপেক্ষাকৃত-পরিচিত ভারিয়ন গ্রুপের কথা ধরা যাক। অর্থাৎ ভারিয়ন অক্টেটের কথা. যেখানে প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদিকে স্থান দেওয়া হয়েছে; এর মধ্যে আছে আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘজীবী হাইপেরনরা ($\Sigma^{\circ}$ ব্যতিরেকে)। নীচের ছকে এদের সাজানো হয়েছে। পাশে তুলনা করবার জন্যে কোয়র্ক-গঠিত একটি অক্টেটের ছক দেওয়া হয়েছে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, সবার চেয়ে নীচের সারিতে আছে সবার চেয়ে হাল্কা ভারিয়নরা তার ঠিক উপরে আছে অপেক্ষাকৃত ভারী

১নং চিত্র
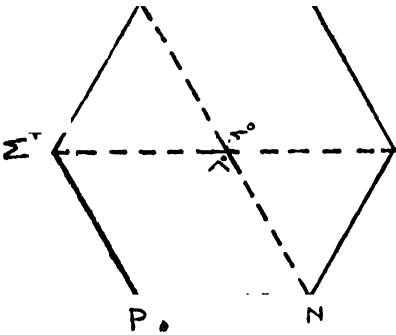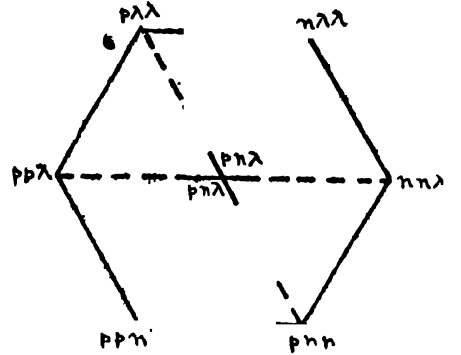
ভারিয়নরা আর সবার উপরে আছে সবার চেয়ে ভারী ভারিয়ানরা।

এবার কোয়র্ক মডেলে আসা যাক। কোয়র্ক মডেলের খুঁটিনাটি আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমাদের আলোচ্য বস্তু হবে অধুনা সুবিদিত দুটি ভারিয়ন গ্রুপ, দুটি মেসন গ্রুপ ও কোয়র্ক মডেল। আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করবো কেমন করে কোয়র্ক ও অ্যান্টি-কোয়র্ক দিয়ে এদের তৈরি

এবার ভারিয়নদের দেকা (deca)-প্লেটে আসা যাক; আগের মতই দুটি ছক পাশাপাশি দেওয়া হলো (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

বচেয়ে হাল্কা সদস্যরা অর্থাৎ $\Delta$-কণা বা রেসনান্সরা আছে সবার নীচের সারিতে। তার উপরে আছে উত্তেজিত (excited) অপরিচিত কণারা (* বা তারকা চিহ্নিত করবার অর্থ উত্তেজিত স্তরকে বোঝানো, উত্তেজিত স্তরই রেসনান্সের নামান্তর)। সবার উপরে $\Omega$-কণা। এখানে

*খুব সম্প্রতি পায়ন-নিউক্লিয়ন জুটিতে আরো বেশ কিছু রেসনান্সের অস্তিত্ব শুনতে পাওয়া গেছে। হাড্রন স্পেট্রস্কোপিতে তাদের স্থান নিয়ে আলোচনার বিরাম নেই।

উল্লেখ করবার প্রয়োজন যে, Ω-কণার অস্তিত্ব তত্ত্বীয় বিশেষজ্ঞেরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ডেকাপ্লেটের ছকের মধ্যে একটা নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাচ্ছন্দ্য আছে। যে কোন বালখিল্যের কাছেও তাহলে এই নিয়মানুবর্তিতার ফলেই Ω-ভারিয়নের ভর যে 1675 Mev হবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছিল। এই একই প্রক্রিয়া যদি অক্টেট ছকের উপর প্রয়োগ করা হতো, তাহলে

$\Omega^-$ λλλ

$\Xi^{*0}$ $\Xi^{*-}$ → pλλ nλλ

$\Sigma^{*+}$ $\Sigma^{*0}$ $\Lambda^{*}$ $\Sigma^{*-}$ ppλ pnλ pnλ nnλ

$\Delta^{++}$ $\Delta^{+}$ $\Delta^{0}$ $\Delta^{-}$ ppp ppn pnn nnn
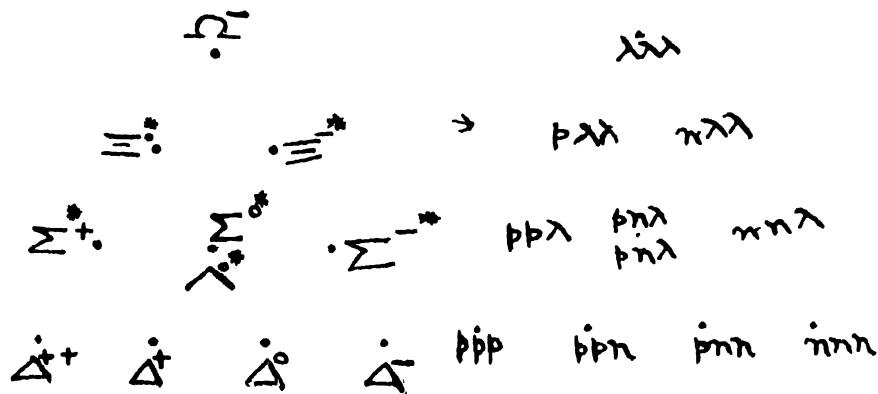
২নং চিত্র

সহজে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে, দশটা কণা আছে, যেহেতু প্রতিটি কণা তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি; সেহেতু সহজেই দেখানো যেতে পারে যে, বিভিন্ন সংমিশ্রণের সংখ্যা কেবলমাত্র দশই। কিন্তু λ-কণার ভর 189 Mev বেশী নিতে হতো। এই বৈষম্য সত্ত্বেও কিন্তু $\Sigma^\circ$-$\Lambda^\circ$ ভরের পার্থক্যের ব্যাখ্যা মিলতো না।

আরো একটি লক্ষণীয় বস্তু—উভয় ছকেই

$\bar{K}_0$ $K^-$ λn̄ λp̄

$\pi^+$ $\pi^\circ, \eta^\circ, X^\circ$ $\pi^-$ pn̄ pp̄, nn̄, λλ̄ np̄ *

$K^+$ $K^\circ$ pλ̄ nλ̄
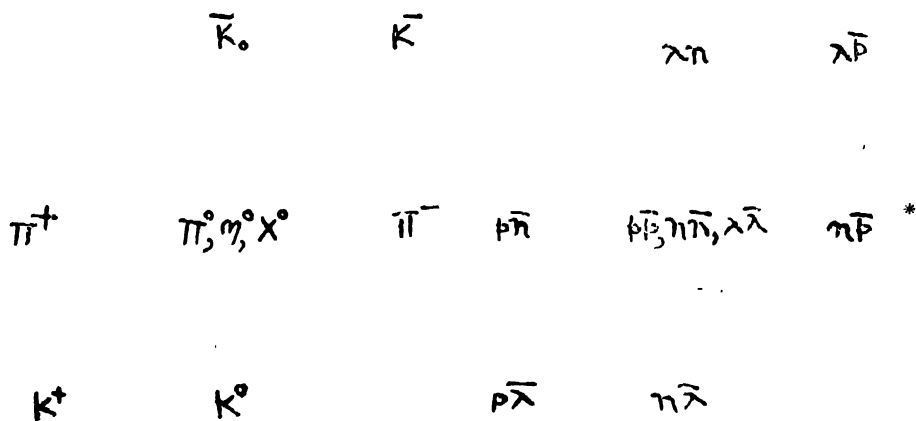
৩নং চিত্র

কোয়ার্কদের ছকে এই দশটি মিশ্রণই দেখানো হয়েছে। এখন যদি ধরা যায় যে p, n কণাগুলির ভর সমান, কিন্তু λ-কণার ভর 147 Mev বেশী সর্বনিম্ন সারিতে অপরিচিতি সংখ্যার মান হলো শূন্য; উপরের সারিতে মান এক কম, তার উপরের সারিতে মান আরও এক কমেছে।

* এদের আরো জানা রাস্তায় আরো স্বাভাবিক ভাবে সাজানো সম্ভব (৩-ক নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সবার উপরে Ω-কণার অপরিচিতি সংখ্যা হলো মাইনাস তিন।

এবারে মেসনদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হবে। তিনটি কোয়ার্ক ও তিনটি অ্যান্টি-কোয়ার্ক দিয়ে আমরা নটা জুটি তৈরি করতে পারি। পাউলি নীতি অনুযায়ী সর্বপ্রকার সমন্বয়ই সম্ভব। ভারিয়নদের পথ অনুসরণ করে এদের লেখা হবে অপরিচিতি সংখ্যা অনুযায়ী (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

মাঝখানের খোপে স্পষ্টতঃই গণ্ডগোল আছে; তিনটি মেসনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোয়ার্কদের তিনটি সুবিধামাফিক সমন্বয়ের। এখানে শুধু উল্লেখ করলেই হবে যে, কণা ও তার অ্যান্টি-কণার মধ্যে অন্তঃক্রিয়া মারফৎ নতুন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কোয়ার্ক ও তার অ্যান্টি-কোয়ার্কদের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।

$p\bar{p}$ $n\bar{p}$ $\lambda\bar{p}$

$p\bar{n}$ $n\bar{n}$ $\lambda\bar{n}$

$p\bar{\lambda}$ $n\bar{\lambda}$ $\lambda\bar{\lambda}$

৩-ক নং চিত্র

এখানে প্রতিটি সারিতে সমান অপরিচিতি নেই, প্রতিটি স্তম্ভেও সমান চার্জ নেই।

এবারে সমীক্ষা জগতের দিকে একটু চোখ ফেরানো যাক। সমীক্ষা জগৎ বলে, উপরে যে সব মেসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের স্পিন-মান হলো শূন্য। স্পিন তত্ত্বের ভাষায়, কোয়ার্ক ও অ্যান্টি-কোয়ার্করা যুক্ত হয়েছে বিপরীতমুখী স্পিন নিয়ে। একই কোয়ার্ক-অ্যান্টিকোয়ার্ক সমন্বয়ে আর একটি মাত্র ভিন্ন স্পিন-মানের মেসন গড়া সম্ভব, এটাও স্পিন-তত্ত্বের দান; অর্থাৎ কোয়ার্ক অ্যান্টি-কোয়ার্করা সমমুখী স্পিন নিয়েও যুক্ত হতে পারে, তাহলে পাওয়া যাবে ভিন্ন এক সমষ্টির মেসন, যাদের স্পিন-মান হলো এক। এই সব মেসনের সনাক্ত করা হয়েছে তথাকথিত বোসন রেসনান্সদের সঙ্গে; রেসনান্সদের খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল অবশ্য ১৯৬২-৬৪ সালের মধ্যে। স্পিন-মান-এক মেসনদের ছক হলো (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য):

$K^{+*}$ $K^{0*}$

$\rho^{+}$ $\rho^{0}, \omega, \phi$ $\rho^{-}$

$\bar{K}_{0}^{*}$ $K^{-*}$

৪নং চিত্র

লক্ষণীয়, কোয়ার্কতত্ত্বে মেসন গ্রুপরা ন'টি কণা-বিশিষ্ট, তাই এদের নামকরণ হলো ননেট (nonet)। উভয় ক্ষেত্রেই ননেটকে তত্ত্বমূলকভাবে ভাঙা সম্ভব একটি অক্টেট ও একটি এক-প্লেটে। এই এক-ঠেরে মেসনদের যেমন সৃষ্টি করা সম্ভব তেমনি এরা নাশ পেতেও পারে। অবশ্য এই প্রক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজন প্রতিটি এক-প্লেট মেসনের জন্যে একটি স্বতন্ত্র চার্জবিহীন ক্ষেত্রের। তবে প্রথমোক্ত মেসন এক-প্লেটের জন্যে এই ক্ষেত্র কণার স্পিন-মান হবে শূন্য, আর স্পিন-এক মেসন কণাটির বেলায় ক্ষেত্রের স্পিন-মান হবে এক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পজিট্রনিয়ামের বেলায় সমগ্র অন্তঃক্রিয়া চলে

তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র মারফৎ; তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র অর্থাৎ ফোটনের স্পিন-মান হলো এক। কাজেই ইলেকট্রন-পজিট্রন জুটি সেই পরিস্থিতিতেই লোপ পায়, যেখানে পরিস্থিতির স্পিন-মান হলো এক।

কার্যতঃ কেবল স্পিনশূন্য ননেটকেই অক্টেট ও এক-প্লেটে ভাঙ্গা হয়। কারণ অক্টেট ও দেকা-প্লেট ভারিয়নদের ভর-সান্নিধ্য শুধু স্পিন-শূন্য চার্জবিহীন ক্ষেত্রের অস্তিত্বই স্বীকার করে, স্পিন-এক ক্ষেত্রের সেখানে স্থান নেই।

কোয়র্ক মডেলের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণী দেওয়া এখানে আর সম্ভব নয়। জীবনে যা আরব্ধ হয়েছে তার তুলনায় প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে তা নিতান্তই নগণ্য। বস্তুতঃ কোয়র্ক মডেলের শিশুর উপযোগী অবতারণাই করা হয়েছে। বাড়ী তৈরি হয় ইট দিয়ে একথা ছোটদের বলা চলে বটে, তবে ছোটরা যদি একটু চালু হয়, তাহলে খুব শীঘ্রই এই উত্তর সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রাখবে না। মনে তাদের স্বতঃই প্রশ্ন জাগবে: শুধু পর পর ইট সাজালেই কি ঘর হয়? ইটগুলিকে ধরে রাখা হবে কি করে? অর্থাৎ বাঁধুনি ও গাঁথুনির সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য জেগে উঠবে। অবশ্য উত্তরদাতার সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়াটাও অস্বাভাবিক হবে না। গৃহ-নির্মাণের ক্ষেত্রে এই কৌতুহল অবশ্য মেটানো যায়, যদি চুন, শুড়কি, সিমেন্ট ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিতি থাকে। কোয়র্কতত্ত্বের যতটুকু অবতারণা এখানে করা হয়েছে তা যে পদার্থিক কণাদের বাস্তবভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে প্রায় অপারগ তা স্বভাবতঃই প্রতীয়মান। কারণ কোয়র্ক-তত্ত্বে তথাকথিত বালখিল্যদের (enfants terribles) মত নানান প্রশ্নের অবতারণা অনায়াসে করা যায়। কোয়র্ক ও অ্যান্টি-কোয়র্ক, অর্থাৎ $q\bar{q}$, কিভাবে আশ্লিষ্ট থাকে? এই আশ্লেষের সমাপ্তি কেনই বা কোয়র্ক-কোয়র্ক-কোয়র্ক, অর্থাৎ $qqq$, সমষ্টিতে, অর্থাৎ $4q$ বা $2q2\bar{q}$ ইত্যাদি নানান সমন্বয়রাই বা কেন ঘন-বদ্ধ পরিস্থিতির পরিচায়ক হতে পারবে না? না, অরওয়েলের জন্তুবিশেষদের মত আমাদেরও ধুন তুলতে হবে "তিন কোয়র্ক ভাল, চার কোয়র্ক খারাপ" অথবা "তিন কোয়র্ক ভাল, বাকী সবাই খারাপ"? এই সব ন্যায্য প্রশ্নের সদুত্তর সম্পূর্ণ মেলে নি, অবশ্য মেলাও দুষ্কর; কারণ কোয়র্কদের গতিসূত্রীয় ব্যাখ্যার ভিত্তি হলো তথাকথিত ঘটনাভিত্তিক (phenomenological) নিউক্লীয় ও কণা পদার্থবিদ্যা, যা কুশলী কর্মীরা আজও হজম করে উঠতে পারে নি। সন্দেহ হতে পারে যে, পদার্থবিদেরা তথাকথিত কোয়র্কতত্ত্বের দৌলতে হয়তো তপ্ত কড়া থেকে ছিট্‌কে জলন্ত উনুনের দিকে ছুটে চলেছেন। যাই হোক, কোয়র্কতত্ত্বে উপরে লেখা প্রশ্নসমূহের বিবিধ আলোচনা গত চার বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।* তাদের কীর্তির কথা এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো না। শুধুমাত্র বলার প্রয়োজন যে, গুরু অন্তঃক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোয়র্কদের সমতুল্যতার নামান্তর হলো SU(3)। এর উপরে যদি স্পিন নিরপেক্ষ অন্তঃক্রিয়ার ধারণা আরোপ করা যায় তাহলে তথাকথিত SU(6) সৌসাদৃশ্যের দ্বার অতিক্রম করা যাবে। দ্বি-মুখী স্পিনের জন্যে ছয়টি পরিস্থিতির সমতুল্যতাই

* R. H. Dalitz, High Energy Physics (Gordon and Breach, N. Y. 1966), p. 253; Proc. of the International Conf. on Elementary Particles, (RHEL, Chilton, 1966), p. 157; Proc. of the XIIIth International Conf. on High Energy Physics, Berkeley (Univ. of Calif. Press, 1967), p. 215; Elementary Particle Physics, Eds. G. Takeda and A. Fujii (Benjamin, N. Y., 1967), p. 56.

হলো SU(6)। এর সুবিধা অনেকের কাছেই সহজে প্রতীয়মান : পদার্থিক ও আইসোভারিক দেশে যুগপৎ ঘূর্ণায়নের (rotation) রহস্য অন্তর্হিত হবে—এই সব ঘূর্ণায়নরা সাধারণতঃ যথেষ্ট মাথা ঘোরানোর কারণ।

কোয়র্ক মডেলের একটি অস্বস্তিকর দিক সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে এই প্রবন্ধের যতি টানা হবে। বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় শুনেই সন্দেহ করছেন যে, এটাই কোয়র্ক মডেলের ঘোলাটে দিক। পাঠকের দূরদৃষ্টির অভাব নেই ; কারণ এই সন্দেহ নিঃসন্দেহে নির্ভুল। সর্বশেষ প্রশ্নই কোয়র্ক মডেলের সর্বকঠিন প্রশ্ন বলা যেতে পারে। এই প্রশ্ন হলো : কোয়র্করা কি সত্যই আছে? অর্থাৎ কোয়র্কদের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমীক্ষা-জগৎ কি সাক্ষ্যদান করে? সরাসরি প্রশ্নের উত্তর সরাসরি দেওয়াই উচিত। স্বীকার করতে দোষ নেই যে, মুক্তাবস্থায় কোয়র্কের প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অস্তিত্বের সমীক্ষাগ্রাহ্য কোন প্রমাণ নেই। এটাই হলো কোয়র্ক মডেলের দুর্বলতম ভিত্তি; সৌভাগ্যবশতঃ কোয়র্কতত্ত্বের 'একিলিস গোড়ালি' (achilles heel) বা 'দুর্যোধনের উরু' কিনা তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

কোয়র্ক মডেল নানান রূপে পরিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে যেখানে ভগ্নাংশিক চার্জের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় সেখানে নিদেন একটি কোয়র্ক মুক্ত অবস্থায় অভঙ্গুর। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কোয়র্ক শীকারে মূলতঃ দু-রকমের অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। অনুসন্ধানের অস্ত্র হলো শক্তিশালী প্রোটন ত্বরায়ক ও মহাজাগতিক রশ্মি সমীক্ষা। ত্বরায়কভিত্তিক সন্ধানের ফলে বেশ খানিকটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, প্রায় 5-8 Gev (অর্থাৎ নিউক্লিয়নগুলির প্রায় 5-8 গুণ ভর) এর থেকে কম নিশ্চল-ভরসম্পন্ন কণাদের অস্তিত্ব স্বীকার করবার রাস্তা নেই। এর থেকে কম নির্ভরশীল সমীক্ষা হলো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। সেখানে কোয়র্কদের ভরের সর্বনিম্ন মান হলো প্রায় 16 Gev। দেখা যাচ্ছে বালখিল্যরা অত্যন্ত গুরুভার। অন্য সব অর্থে কোয়র্করা ক্ষুদে ভারিয়ন ; তবে ভরের দিক থেকে ভরপুর। যাই হোক না কেন, কোয়র্ক দিয়ে মেসন বা ভারিয়ন তৈরির মাধ্যমে প্রচণ্ড শক্তির উৎক্ষেপ হয় ; যে সব গাঠনিক ব্লক দিয়ে সরল কণারা তৈরি হচ্ছে তাদের ভর এক-দশমাংশে সঙ্কুচিত হয়। ভঙ্গুর কোয়র্কের সন্ধানে অথবা একক-কোয়র্কবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকা সমীক্ষাবিদের পক্ষে একটি আকর্ষণীয় খেলা। কোয়র্কদের রাসায়নিক অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অজ্ঞাত থাকবার ফলে এর অর্থ হলো কার্যতঃ ভগ্নাংশিক চার্জসমন্বিত সাধারণ বস্তুর সন্ধান করা ; তা সে নীলাম্বর আবহে হোক কিংবা নীলাম্বুতে হোক। কোয়র্কদের বাস্তবতার প্রশ্নে চোখ-ঠাওরানো* যদি বাস্তব-গ্রাহ্য হয় তাহলে কোয়র্ক মডেলকে বাস্তব কণাদের অবাস্তব রূপায়ণ বলে মনে করবার হেতু এখনও যথেষ্ট দানা বেঁধে উঠতে পারে নি।

---

* পদার্থবিদ্‌মহলে একটি জনশ্রুতির প্রচলন আছে। শোনা যায় যে, এক নবীন প্রতিভাবান তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্ একবার এক প্রথিতযশা প্রবীণ সমীক্ষাবিদের সমীক্ষাগার দর্শন করতে যান। দর্শনশেষে সমীক্ষাবিদ্ তত্ত্ববিদ্‌কে দরজার সামনে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসেন। বাইরে এসে তত্ত্ববিদ্ দেখেন যে, সমীক্ষাগারের প্রবেশ দ্বারের উপরে একটি ঘোড়ার নাল ঝুলানো আছে। খানিকটা কৃপা, খানিকটা ব্যঙ্গ মিশিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠকে শুধালেন—আপনিও এই সব বিশ্বাস করেন! বৃদ্ধের চোখেমুখে একটা বিপর্যস্তভাব ফুটে উঠলো : খুব ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন ; শোনা যায়—অবিশ্বাস করলেও এ নিজের কাজ করে যায়!

[ এই প্রবন্ধের রেখাঙ্কনের জন্যে লেখক শ্রীজ্যোৎস্না মুখোপাধ্যায়ের নিকট কৃতজ্ঞ ]

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## আল্‌ট্রাসনিক্সের বহুবিধ প্রয়োগ

আসন্ন লণ্ডন সম্মেলনে অতিশব্দের (Ultrasonics) ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করবে। অতিশব্দ হলো সেই 'নীরব' শব্দ—যা ধাতু জোড়া দিতে, টিউমার নির্ধারণ করতে ও চোর-ধরা সঙ্কেত করতে সক্ষম।

পঞ্চম শিল্পক্ষেত্রে অতিশব্দ বা আল্‌ট্রাসনিক্স ফর ইণ্ডাষ্ট্রী সম্মেলন ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে ১৫ ও ১৬ই অক্টোবর। বৃটেন ও বিদেশের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেবেন।

অতিশব্দ মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু এই শব্দ-তরঙ্গের বহুবিধ ব্যবহার সম্ভব। যেমন, কঠিনতম ধাতু ও সিরামিক কাটা, টেলিফোন লাইনের বা রেললাইনের যে কোন রকমের ত্রুটি নির্ধারণ, ধাতু বা প্লাষ্টিক জোড়া দেওয়া, চোর-ধরা সঙ্কেত দেওয়া ও টিউমার নির্ধারণ প্রভৃতি। লণ্ডন সম্মেলনে এই সব বহুবিধ ব্যবহারের সরঞ্জামগুলি প্রদর্শিত হবে।

## রাস্তা তৈরি করবার মশলা—সিণ্টারাইট

বালি, কয়েক প্রকার ধাতু, লোহা ও ক্ষার মিশিয়ে রাস্তা তৈরি করবার এক যুগান্তকারী মশলা বানিয়েছেন ফ্রাঙ্কফুর্টের খনি ইঞ্জিনীয়ার কাল হাইঞ্জ এঞ্জেল। অত্যধিক চাপে ও তুষারপাতে এর কোন ক্ষতি হয় না এবং এতে যে কোন রং করা যায়। ফলে, পথ যদি বেশ হাল্‌কা রঙের করা যায়, তাহলে পথে বেশী আলো লাগাতে হবে না। হাল্কা রঙের সিণ্টারাইটের পথ ঘোর বর্ষা ও অল্প আলোতেও বেশ দেখা যায়, আর এতে খরচও অনেক কম পড়ে।

## অভিনব জীবনতরী

পশ্চিম জার্মেনীর কোন একটি প্রতিষ্ঠান রবার দিয়ে এমন এক জীবনতরী বানিয়েছেন, যেটি জাহাজ থেকে জলে নাবাবার সময় নিজে থেকেই হাওয়ায় ভরে ফুলে ওঠে আর কখনই উল্টে যায় না। নতুন বিলাসবহুল জাহাজ 'হামবুর্গে' এই ধরণের জীবন তরী থাকবে। আরও শোনা যাচ্ছে যে, নতুন এক আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রত্যেক জাহাজে প্রচলিত জীবন-তরীর সঙ্গে রবারের এই জীবনতরীও রাখতে হবে।

## পাঁচ কিলোমিটার পুরু চুল

বৃটেনে 'এলমিস্কোপ ১০১' নামে একটি অভিনব ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এ-দিয়ে যে কোন জিনিষ আড়াই মিলিয়ন গুণ বড় দেখায়। অন্য একটি বাইনোকুলারের মধ্য দিয়ে দেখলে সেই প্রসারণ আরও নয় গুণ বাড়ে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মানুষের চুলকে পাঁচ কিলোমিটার পুরু দেখা যায়। চিকিৎসা ও গবেষণার কাজে এটি খুব উপকার দেবে।

## নতুন গ্যাস-টার্বাইন ট্রেন

বৃটিশ রেল কর্তৃপক্ষ এমম একটি গ্যাস-টার্বাইন ট্রেনের ডিজাইন করেছেন, যার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১৫০ মাইল। এতে ট্রেনে যাতায়াতের সময় প্রায় অর্ধেক কমে যাবে।

নতুন ট্রেনটিতে ব্যবহার করা হবে জেট ইঞ্জিন এবং তার গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হবে জটিল ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্যে। যে সব ইঞ্জিনের কথা এই প্রসঙ্গে উঠেছে, তাদের মধ্যে আছে

রোল্‌স্ রয়েস ডার্ট এয়ার ক্র্যাফট্ ইঞ্জিন এবং বৃটিশ লেল্যাণ্ড মোটর করপোরেশন উদ্ভাবিত নতুন লরি টার্বাইন ইঞ্জিন।

এই নতুন ডিজাইনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত জেট ট্রেনটি বর্তমানে প্রচলিত রেলপথই ব্যবহার করতে পারবে।

## ভূকম্পন-প্রতিরোধক নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর

অ্যাডভান্সড্ গ্যাস কুলড্ রিয়্যাক্টরটির সর্বশেষ মডেলটি যত বড় রকমের ভূমিকম্পই হোক না কেন, তা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা পাবে এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ পারমাণবিক রিয়্যাক্টর বলে গণ্য হবে।

এই ভূকম্পন-প্রতিরোধক গ্যাস কুলড্ রিয়্যাক্টরটির সবরকম অবস্থা পরীক্ষা করে দেখেছেন যুক্তরাজ্যের অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটির রিয়্যাক্টর গ্রুপ এবং দুটি নতুন ধরণের ৫০০ মেগাওয়াট রিয়্যাক্টরের ডিজাইন তৈরির কাজও প্রায় সম্পূর্ণ।

এই দুটির মধ্যে একটি ইউরোপে ব্যবহারের জন্যে। ইউরোপে যে ধরণের বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকে, তার অভিঘাত প্রতিরোধের ক্ষমতা এটির থাকবে। অন্যটি বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের ভূকম্পন প্রতিরোধের ক্ষমতা পাবে।

## মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ

মহাকাশের ছায়াপথে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে এবং সে সকল গ্রহ-নক্ষত্র থেকে হ্রস্ব তরঙ্গের মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্‌মিক রশ্মি ভেসে আসছে। সূর্য এবং পৃথিবী থেকেও মহাজাগতিক রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এই দুই প্রকার রশ্মির পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে গত ১৪ই জুলাই ১৯৬৮ 'এক্সপ্লোরার ৩৮' নামে একটি মহাকাশযান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

সূর্য, বৃহস্পতি, ছায়াপথের নানা গ্রহ-তারকা থেকে অল্প কম্পনযুক্ত যে সকল তরঙ্গ আসে, তা আয়োনোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হবার জন্যে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় না। এই সকল তরঙ্গ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এদের সাহায্যে ছায়াপথের মানচিত্র রচনার উদ্দেশ্যেও এটিকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে।

এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে উপবৃত্তাকারে পৃথিবী পরিক্রমা করছিল, তখন বেতারের নির্দেশ দিয়ে এটিকে যথানির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে এটিকে বৃত্তাকারে পৃথিবী পরিক্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছেন যে, এর মধ্যে এজন্যে বেরিলিয়াম কপারে তৈরি ২২৮.৬ মিটারে দৈর্ঘ্যের যে চারটি অ্যানটিনা আছে, তা খোলবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। এটিই মহাকাশের প্রকৃত রেডিও টেলিস্কোপ। এই সকল অল্প কম্পনযুক্ত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশী হলে ১০০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এজন্যেই অ্যানটিনার দৈর্ঘ্য সেই অনুপাতেই হতে হবে। এই উপগ্রহটি প্রথমে পৃথিবীর কাছে যে সকল গ্রহ ও ছায়াপথ আছে, তাদের থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে।

# কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

## জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৬৯

২২শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

পিকটোরিয়াল প্যারেড

**বোতলে করে মাছকে তরল খাদ্য খাওয়ানো হচ্ছে।**

কিছুকাল আগে জার্মেনীর ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউটে দু-জন বিজ্ঞানী (একজন জীব-বিজ্ঞানী ও অপরজন প্রাণী-বিজ্ঞানী) মাছকে এই ভাবে তরল খাদ্য খাইয়ে দ্রুততর বৃদ্ধি সাধনে সক্ষম হয়েছেন।

# নেপচুন ও প্লুটো আবিষ্কারের কাহিনী

সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কারের কাহিনী অনেকটা এই রকম; ইউরেনাস আবিষ্কৃত হবার পর বিজ্ঞানীরা তার কক্ষ এবং গতি-প্রকৃতি অঙ্ক কষে বের করেন। কিন্তু মুসকিল হলো কোথায় জান? গণিতের সাহায্যে যে গতি বেরুলো, আকাশে দৃষ্ট ইউরেনাসের গতির সঙ্গে তার কিছু অমিল হতে লাগলো—অবশ্য খুবই সামান্য। কিন্তু খালি চোখে তা ধরা সম্ভব নয়। তা বললে তো হবে না—গরমিল যখন হচ্ছে তখন এর রহস্য উদ্ঘাটন করতেই হবে, কেন এই রকমটি হচ্ছে। নিশ্চয়ই এর কোন কারণ আছে—হয়তো বা কোন অজ্ঞাত গ্রহের আকর্ষণেই ইউরেনাসের গতির এরূপ গরমিল হচ্ছে।

এই ধারণা পোষণ করেই ইংরেজ বিজ্ঞানী অ্যাডাম্‌স্ এবং ফরাসী বিজ্ঞানী লেভেরিয়ে, অজ্ঞাত গ্রহটির ওজন কিরূপ হওয়া উচিত এবং সেটি আকাশের কোথায় থাকলে ইউরেনাসের গতিতে উপরিউক্ত গরমিল হওয়া সম্ভব—তা নিয়ে অঙ্ক কষতে বসলেন—অবশ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে। অচিরেই তাঁরা তাঁদের গণনা-কার্য শেষ করলেন। তবে লেভেরিয়ের গণনা শেষ হবার এক সপ্তাহ আগেই অ্যাডাম্‌স্-এর গণনা শেষ হলো। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডাম্‌স্ তাঁর গণনার ফলাফল জানিয়ে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী চ্যালিসকে এই অজ্ঞাত গ্রহটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু চ্যালিস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দ্রুত এগুতে পারলেন না। কেন না, তখন ইংল্যাণ্ডে নক্ষত্রমণ্ডলের ভাল নক্সা ছিল না। অথচ নক্সা ছাড়া এটা লক্ষ্য করা মোটেই সম্ভব নয় যে, কোন জ্যোতিষ্ক স্থানচ্যুত হলো কিনা অথবা নতুন কোন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হলো কিনা। তাহলে সেটিই অজ্ঞাত গ্রহের সন্ধান দেবে। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে চ্যালিস কেম্ব্রিজের মানমন্দিরে বসে ইউরেনাসের পাশাপাশি অবস্থিত সমস্ত নক্ষত্রের নক্সা প্রস্তুত করতে লাগলেন। বেশ কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। কাজেই বুঝতে পারছো—এই কাজে তাঁর বেশ দেরী হতে লাগলো।

এদিকে লেভেরিয়ে গণনা শেষ করে এই অজ্ঞাত গ্রহটির অনুসন্ধান করবার জন্যে বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী গালেকে অনুরোধ জানান। বার্লিন মানমন্দিরে নক্ষত্রমণ্ডলের নিখুঁত নক্সা ছিল—কাজেই গালে আর মুহূর্ত দেরী করলেন না, সেই রাত্রেই অজ্ঞাত গ্রহটির অনুসন্ধানে লেগে গেলেন। দূরবীনের সাহায্যে লেভেরিয়ের নির্দেশিত নক্ষত্র-মণ্ডলে সত্যি সত্যি নক্ষত্রের চেয়ে খানিকটা বড় আলোর চাক্‌তির মত দেখতে

পেলেন। এটাই যে সেই অনাবিষ্কৃত গ্রহ—যা ইউরেনাসকে আকর্ষণ করছে, তাতে আর গালের কোন সন্দেহ রইলো না। গ্রহটি মহাকাশের আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে রোমক সমুদ্র দেবতার নাম অনুসারে এর নামকরণ হলো নেপচুন। সেটা ১৮৪৬ সালের কথা।

এই খবর শুনে বিজ্ঞানী চ্যালিস খুবই ব্যথিত হলেন। ব্যথিত হলেন অ্যাডাম্‌স্‌ও। কেন না, একটা বিরাট আশা নিয়ে তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে এই গণনা কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন আর তার শেষ পরিণতি যে এমন হবে, তা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। না পারাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁর কাজে তো কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না।

এক্ষেত্রে চ্যালিসেরও একটু ত্রুটি হয়েছিল। সে কথা তিনি পরে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজে আরও একটু মনোযোগী এবং সতর্ক হলে অনুসন্ধানের কাজে মনোনিবেশ করবার চতুর্থ দিনেই তিনি এই অজ্ঞাত গ্রহটি আবিষ্কার করতে পারতেন। এজন্যে হয়তো তাঁকে সারা জীবন অনুতাপ করতে হয়েছে।

তবে আশার কথা এই যে, বিজ্ঞান-জগতে খানিকটা সততা এখনো আছে, তাই নেপচুন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবার কৃতিত্ব এখন অ্যাডাম্‌স্‌ এবং লেভেরিয়েকে সমভাবেই দেওয়া হয়।

নেপচুন সূর্য থেকে ২৭৯ কোটি মাইল দূরে। অন্যান্য গ্রহের মত নেপচুনও সূর্যের চারদিকে ঘোরে—কিন্তু খুব আস্তে, সেকেণ্ডে মাত্র তিন পূর্ণ দুয়ের পাঁচ মাইল। তার সূর্যের চারদিকে ঘুরতে সময় নেয় ১৬৪ বছর ৬ মাস। এর ব্যাস ইউরেনাসের মতই বরং সামান্য হাল্‌কা এবং জলের চেয়ে সামান্য ভারী। নেপ-চুনের ব্যাস প্রায় ৩২,৯০০ মাইল—পৃথিবীর প্রায় চারগুণ। এর দিনগুলি বোধ হয় কিছু ছোট। নেপচুনের একটি মাত্র চাঁদ—'ত্রিতন', যাকে সহজে দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, নেপচুনের আরো একটি চাঁদ আছে।

নেপচুনকে কি ভাল করে দেখা যায় না?—ঠিক তাই। আমরা পৃথিবীর বুকে শুক্রকে যতটা ছোট দেখি, নেপচুন থেকে সূর্যকে বোধ হয় তত ছোটই দেখায়। আর সেই সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত নেপচুনের কতটুকুই বা আমরা দেখতে পাবো। তাই বিজ্ঞান দূরের এই গ্রহটি সম্বন্ধে খুব কমই জানে।

সৌরজগতের নবম গ্রহ হলো প্লুটো। শুধু মাত্র গণিতের হিসাবের উপর নির্ভর করে যেমন নেপচুন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল—ঠিক সেই উপায়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল প্লুটো।

ইংরেজী ১৯০৫ সালের কথা। উত্তর আমেরিকার ফ্ল্যাগষ্টাফ মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পার্সিভ্যাল লাওয়েল হিসেব করে দেখলেন যে, তখনকার আবিষ্কৃত

সবগুলি গ্রহের আকর্ষণ হিসাব করেও ইউরেনাসের গতির ব্যতিক্রম ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না। নেপচুনের বাইরে অন্য কোন গ্রহ থাকলে তবেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই পার্সিভ্যাল লাওয়েল নেপচুনের সীমা ছাড়িয়ে আরো কোন গ্রহ থাকা সম্ভব কিনা, তাই নির্ধারণ করতে উৎসাহী হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি সুদীর্ঘ নয় বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৯১৪ সালে তাঁর গণনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নির্মম পরিহাস যে, যশোলক্ষ্মী তাঁর ঘরের দুয়ারে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন; অর্থাৎ লাওয়েল যে অনুসন্ধান কার্য শুরু করেছিলেন, তা সাফল্যমণ্ডিত হবার আগেই ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলো। কিন্তু তাঁর সহকারীরা এই দুরূহ অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন অনুসন্ধান করেও তেমন কোন সাফল্য ওঁরা অর্জন করতে পারলেন না। অবশ্য তেমন কোন শক্তিশালী দূরবীনও তখন লাওয়েল মানমন্দিরে ছিল না। কাজের সুবিধার জন্যে প্রায় চব্বিশ বছর পরে ১৯২৯ সালে একটি ১৩ ইঞ্চি ব্যাসের নতুন দূরবীন লাওয়েল মানমন্দিরে বসানো হলো এবং তরুণ গবেষক টমবাউ-এর উপর অজ্ঞাত গ্রহটির অনুসন্ধানের ভার পড়লো। টমবাউ আকাশের সম্ভাব্য অঞ্চলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নতুন দূরবীনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে এক বছরের মধ্যেই ইংরেজী ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে নেপচুনের চেয়ে দূরে অবস্থিত নতুন গ্রহটির সন্ধান পেলেন। এর গতিবিধি সম্পর্কে নিখুঁতভাবে আরো পর্যবেক্ষণ করে ১৯৩০ সালের ১৩ই মার্চ লাওয়েল মানমন্দির থেকে এই গ্রহটি আবিষ্কারের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করা হলো। অচিরেই সব দেশের বিজ্ঞানীরা একে নবাবিষ্কৃত গ্রহ বলে স্বীকার নিলেন।

এবার গ্রহটির নামকরণের পালা। গ্রহটি সৌরজগতের শেষ সীমায় তমসাবৃত অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই গ্রীক পুরাণে বর্ণিত অন্ধকার পাতালপুরীর দেবতা প্লুটোর নাম অনুসারে এর নামকরণ হলো। এই নামকরণের সার্থকতা সব দিক দিয়েই সমান। প্লুটো নামের প্রথম দুই অক্ষর পি এবং এল আর যে বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েল এই গবেষণা সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁর নামের আদ্য অক্ষরও পি এবং এল।

সুনীল সরকার

# পাখীদের গৃহ-নির্মাণ

পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, মানুষের মত পাখাদেরও গৃহ-নির্মাণের প্রথম ধাপই হলো স্থান নির্বাচন। তবে ডিম পাড়বার আগে কোন পাখীর মধ্যেই গৃহ-নির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা দেখা যায় না। কিন্তু ডিম পাড়বার পরে অনাগত সন্তান-সন্ততির কথা চিন্তা করেই বোধ হয় পুরুষ পাখীকে গৃহ-নির্মাণের স্থান নির্বাচনের ভার গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এই নিয়মই যে সব জায়গায় মেনে চলা হয়, তা নয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় সেই সব পক্ষী-সমাজে, যেখানে স্ত্রী-পাখীর প্রতিপত্তি পুরুষ পাখীর তুলনায় অনেক বেশী। এই সব ক্ষেত্রে পুরুষ পাখীরা স্ত্রী-পাখীদের পছন্দের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল।

স্থান নির্বাচনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয় গৃহনির্মাণের পালা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যেমন—পায়রা, চড়ুই প্রভৃতির স্ত্রী ও পুরুষ যৌথ প্রচেষ্টায় গৃহ-নির্মাণ করলেও দাঁড়কাক, কাঠঠোক্‌রা প্রভৃতি পুরুষ অথবা স্ত্রী পাখীর একক প্রচেষ্টাই গৃহ-নির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট। আবার পুরুষ বাবুই পাখী একক প্রচেষ্টায় একাধিক গৃহ-নির্মাণ করে প্রতি গৃহেই একটি একটি স্ত্রী-বাবুইকে প্রতিপালন করে।

বর্তমানে প্রায় সব পাখীই গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজন অনুভব করলেও আদিতে পাখীদের মধ্যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত গৃহ-নির্মাণের স্পৃহা ছিল না বললেই চলে। এই সময়ে তারা গাছের ডালে অথবা অসংরক্ষিত বনভূমিতেই ডিম পাড়বার কাজটা সেরে নিত। কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সন্তান-সন্ততিকে বিপদমুক্ত করবার তাগিদে গড়ে ওঠে নানা ধরণের মাথা গোঁজবার ঠাঁই।

পাখীদের ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজন প্রথম অনুভব করে তীরভূমিতে বসবাসকারী কিছু সংখ্যক পাখা। গৃহ-নির্মাণের পথপ্রদর্শক হবার জন্যেই এদের তৈরি ঘরে নিপুণতার ছাপ বিশেষ একটা ছিল না। সমুদ্রতীরে ভবঘুরের মত বসবাস করবার জন্যে এদের গৃহ-নির্মাণের প্রয়োজন ছিল খুব অল্প, স্বভাবতঃই উপকরণও ছিল স্বল্প। কিছু কাঠ, খড় আর কিছু পাতা একত্র করে এরা তার মধ্যে ডিম প্রসব করতো একটি অথবা দুটি ডিম, যা থেকে জন্ম হতো ওদের সন্তানের। এই দায়সারা ব্যবস্থাটা ছোট্ট গায়ক পাখী বুলবুলের একদম পছন্দ হলো না। তাই কাদা মাটির সাহায্যে বুলবুল তৈরি করলো তার ছোট্ট সুন্দর কুঠুরী, যা শুধু শাবককেই নয়, শাবকের মাতা-পিতাকেও দিতে পারে নিশ্চিন্ত আশ্রয়—রক্ষা করতে পারে তাদের জল, ঝড় আর শত্রুর আক্রমণ থেকে। বুলবুলির এই কাদা মাটি ঘাঁটবার ধরণটা বোধ হয় ভাল লাগলো না আমেরিকার ওয়ারব্লার ~ সোনালী চড়ুইয়ের। তারা দেবদারু জাতীয় গাছের সরু

ডাল ও শুকনো পাতা দিয়ে নির্মাণ করলো শক্ত সুন্দর অনেকটা পান-পত্রের মত জলনিরোধক গৃহ। হামিং বার্ড বাসা তৈরি করেই ক্ষান্ত হলো না, এই বাড়ী সে আবার আচ্ছাদিত করলো এক প্রকার সবুজ পাতলা লাইকেন দিয়ে—ফল হলো দ্বিবিধ—প্রথমতঃ বাড়ী দেখতে হলো সুন্দর, দ্বিতীয়তঃ লাইকেনের সবুজ রং পাতার রঙের সঙ্গে মিলে তার আত্মরক্ষার কাজ করলো সম্পূর্ণ।

কারিগরির দক্ষতার কঠিন পরীক্ষায় অন্যান্য অনেক পাখীকেই হারিয়ে দিল ভিরিওল তাদের 'পেন্সিল নেষ্ট' তৈরি করে। গাছের একটা প্রান্তিক ডাল যেখানে দু-ভাগে ভাগ হয়ে ইংরেজী ওয়াই অক্ষরের আকার ধারণ করে, ঠিক তারই মাঝে বাকলের সাহায্যে ভিরিওল তৈরি করে তার ঝুলন্ত গৃহ। কারিগরি দক্ষতা, তথা শিল্প-নিপুণতার আর এক নিদর্শন বাবুই পাখার কুঁড়ে ঘর। ঘাস, নারিকেল ও সুপারী পাতার সরু সরু ফালি ও পালকের সাহায্যে অক্লান্ত পরিশ্রমে যে কুঁড়ে ঘর বাবুই পাখী গড়ে তোলে, তা দেখে সবাই হয় বিস্মিত ও বিমুগ্ধ। সাধারণতঃ জলাশয়ের ধারে কোন উঁচু গাছের পাতার ডগায় দোলনার মত দোলে বাবুই পাখীর সযত্নে নির্মিত কুঁড়ে ঘর। এহেন গৃহে আবার আলোর ব্যবস্থাও তো করা চাই, বাবুই খানিকটা কাদা সংগ্রহ করে তার মধ্যে কিছু জোনাকীর মাথা গুঁজে দেয়। পর্যাপ্ত আলো হয়তো এতে হয় না, কিন্তু ঐ স্বল্প আলোই ওদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

লম্বা ঠোঁটওয়ালা ধনেশ পাখী আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি, কিন্তু ধনেশের গৃহ-নির্মাণ পদ্ধতিটা আমরা অনেকেই বোধ হয় জানি না। পুরুষ ধনেশ পাখী বড় গাছের গুঁড়িতে কোটর তৈরি করে তাতে তুলা, ঘাস ও পাতা বিছিয়ে দিয়ে আরামদায়ক করে তোলে স্ত্রী-ধনেশকে আবাহন করে। এত করেও তার নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। পাছে স্ত্রী-ধনেশ রাগ করে অন্য কোন পাখীর সঙ্গে উড়ে যায়, সেই ভয়ে সে কোটরের চারপাশে কাদা দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ করে দেয় যাতে খাদ্য গ্রহণের জন্যে ঠোঁট ছাড়া স্ত্রী-পাখীর অন্য কোন অঙ্গ বাইরে বের হতে না পারে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানের পর পুরুষ ধনেশ খাদ্য সংগ্রহ করে স্ত্রী-ধনেশের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে যায়।

গৃহ-নির্মাণের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় ওরিওল নামে এক জাতের পাখীর তথাকথিত শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। পাথরের খাঁজে প্রবহমান জলধারার উপরে শুকনো ঘাস এবং খড় দিয়ে ওরিওল তৈরি করে এক ধরণের গোলাকার গৃহ। বিভিন্ন প্রকারের ঘাস ও শ্যাওলার দ্বারা আচ্ছাদিত করবার ফলে পরোক্ষভাবে এই গৃহ হয় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত।

ভাবতেও অবাক লাগে, কোন উন্নত যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই মানুষের চেয়ে অনেক অনুন্নত এক শ্রেণীর পাখী প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রগতির তালে তাল মিলিয়ে কেমন সার্থক ভাবে এগিয়ে চলেছে।

শ্রীসমর চক্রবর্ত্তী

# প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১ চকোলেট কি ভাবে তৈরি হয়?

সন্তোষ চক্রবর্তী, সরিষা
সোফিয়া বেগম, মুর্শিদাবাদ

উঃ ১। চকোলেট তৈরি হয় থিওব্রোমা ক্যাকাও নামক এক প্রকার গাছের বীজ থেকে। ক্যাকাও গাছ উষ্ণ এবং আর্দ্র অঞ্চলে সাধারণতঃ বিষুব রেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ২৫° অক্ষাংশের মধ্যে জন্মায়। এই গাছ ৩০ ফুট লম্বা হয়। গাছের ডালগুলি সাধারণতঃ লাল রঙের এবং পাতাগুলি গাঢ় সবুজ রঙের। থিওব্রোমা ক্যাকাও গাছ প্রধানতঃ তিন ধরণের হয়ে থাকে। বীজের রং অনুযায়ী এদের শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে। ক্যাকাও গাছে বছরে দু-বার ফল ধরে। এক-একটি ফল প্রায় আধ কিলোগ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এই গাছে প্রায় ৩০।৪০ বছর ফল ধরে। গাছের তুলনায় ফলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। এক-একটি ফলে ২৫।৩০টি বীজ থাকে।

ক্যাকাও বীজ প্রাথমিক অবস্থায় তিক্ত হয়। কয়েক দিন ফেলে রাখলেই বীজগুলি গেঁজে যায়। চকোলেট তৈরির ব্যাপারে এই বীজ গেঁজে যাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যে বীজগুলিকে রাসায়নিক উপায়ে গাঁজিয়ে নেওয়া হয়। গাঁজানের সময় উষ্ণতা ৪৫° সেঃ রাখা হয়। গেঁজে-যাওয়া বীজকে কৃত্রিম উপায়ে শুষ্ক করা হয়ে থাকে। এর পর বীজগুলিকে রোলারের সাহায্যে পেষা হয়। ফলে বীজের ভিতরের অংশ বীজের খোলা থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভিতরের অংশকে নিব বলা হয়। পরে এই নিবকে মেশিনের সাহায্যে গুঁড়া করা হয়ে থাকে। বীজের মধ্যে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে, তা গুঁড়া করবার সময় আলাদা হয়ে যায় ও বাকী অংশ কোকো পাউডারে পরিণত হয়। গলিত স্নেহপদার্থকে ক্যাকাও-মাখন বলা হয়। এই মাখন সাধারণতঃ শক্ত অবস্থায় থাকে। চর্মরোগে বিশুদ্ধ স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন হয় এবং চিকিৎসকেরা রোগীকে তাই এই ক্যাকাও-মাখন ব্যবহারের বিধান দেন।

সাধারণভাবে উপরে বর্ণিত নিবগুলিকে গুঁড়া করবার সময় স্নেহজাতীয় পদার্থ ও পাউডার একত্রে তরল অবস্থায় বেরিয়ে আসে। চকোলেট তৈরি করবার সময় এগুলিকে আরো ভাল করে পিষে নেওয়া হয়। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ দুধ ও চিনি মিশিয়ে ছাঁচে ঢেলে চকোলেট তৈরি করা হয়।

চকোলেটের খাদ্যমূল্য যথেষ্ট। বারো-চৌদ্দটি ডিম থেকে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, এক কিলোগ্র্যাম চকোলেট থেকে সেই সমপরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়।

ক্যাকাও বীজে স্নেহ ও শর্করাজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন, থিওব্রোমিন, কেফিন, পলিফিনল ইত্যাদি থাকে।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

# বিবিধ

## বিজ্ঞান-চক্রের আলোচনা সভা

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কলিকাতা শাখা পরিচালিত বিজ্ঞান-চক্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডক্টর খোরানার আবিষ্কার নিয়ে এক আলোচনা করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডক্টর শঙ্কর মিত্র।

বিজ্ঞান-চক্রের উদ্বোধন করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য ডক্টর সুশীল
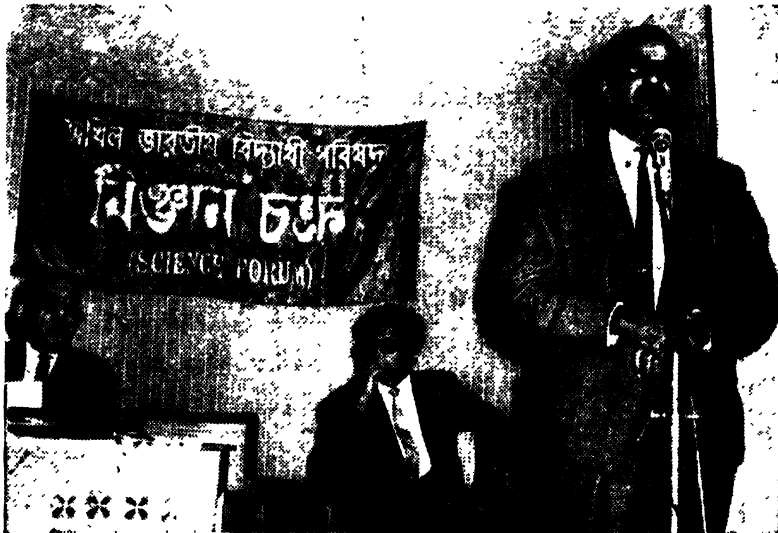
অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান-চক্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এস. কে. মুখার্জী ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁর ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট যথাক্রমে ডক্টর এস. মিত্র ও ডক্টর বি. মুখার্জী।

বিশেষ আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। গত ৩০শে নভেম্বর কলিকাতার ফুটনানী হলে "ডক্টর খোরানা এবং জেনেটিক কোড" সম্পর্কে

মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ছাত্র সমাজের মধ্যে সৃজনশীল মনোভাব জাগিয়ে অফুরন্ত কর্মশক্তিকে দেশের উন্নয়নের কাজে

লাগানোই ছাত্র সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্র সমাজকে আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে গঠনমূলক কাজে উদ্যোগী করছে জেনে ডক্টর মুখোপাধ্যায় পরিষদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর বি. মুখার্জী। বিজ্ঞান-চক্রের সভাপতি ডক্টর অরুণেন্দু সরকার তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন যে, ছাত্র সমাজের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা, বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের উন্মেষ করা ও বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করবার সুযোগ এনে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে শুভ সূচনা হয়েছে এই বিজ্ঞান-চক্রের। এই দিনকার অনুষ্ঠানে ডক্টর তারকমোহন দাসের Interference Microscopy-তে তোলা "Inside the living cell" চলচ্চিত্র ও অন্য দুটি বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

## হিমালয়ের হিমাঞ্চলের পরিবর্তন

নয়া দিল্লী থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসে যোগদানকারী রাশিয়ার ভূ-বিশেষজ্ঞ এ. ভি. স্নিতনিকভ এক বিভাগীয় সভায় বলেছেন, হিমালয়ের হিমাঞ্চল সরে যাচ্ছে।

বিভাগীয় সভায় তিনি এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তিনি বলেন, হিমালয়ের উত্তর ও দক্ষিণের ঢালু অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর অনুমান সত্য। উত্তরাঞ্চলের ক্ষেত্রে তাঁর অনুমান অধিক তথ্যনির্ভর। এই অঞ্চলের ঢালু ভূমির সম্মুখভাগ মধ্য এশিয়ার শুষ্ক অঞ্চলের দিকে বিস্তৃত। দক্ষিণ অঞ্চল বর্ষার দ্বারা প্রভাবিত।

এই রুশ বিজ্ঞানীর মতে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই নিয়মিতভাবে হিমাঞ্চল সরে যাওয়া আরম্ভ হয়েছে। আর এই অবস্থা বহুদিন ধরে চলবে।

আর একজন রুশ ভূ-বিজ্ঞানী বলেন, মধ্য এশিয়ার হিমবাহগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে যাচ্ছে।

এক ভারতীয় সন্ন্যাসী ভূগোল কংগ্রেসে চাঞ্চল্যকর আর একটি তথ্য পরিবেশন করেন। এঁর নাম স্বামী প্রণবানন্দ। তিনি কৈলাস ও মানস সরোবর অঞ্চলে ব্যাপক সফর করেছেন। স্বামীজী ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু, সিন্ধু ও কার্ণালি—এই বড় বড় চারটি নদীর উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, শতদ্রু নদীর বাসভূমি হলো ডনচু গুহার নিকটবর্তী কুন লুং হিমবাহ। এই স্থান মানস সরোবর থেকে ৫০ কিলোমিটার পূর্বে। সিন্ধুর উৎস হলো কৈলাসের উত্তরে সেনগী খামবার ঝরণাশ্রেণী। সেনগী খামবার কৈলাসের উত্তর-পূর্বে মানস সরোবর থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে।

## ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণের পরিকল্পনা

নয়া দিল্লী থেকে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ—পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ বিক্রম সরাভাই সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে বলেছেন, দেশে নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা ভারতের আছে। এর জন্যে চার-পর্যায়ের একটি রকেট নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। পূর্ব উপকূল থেকে এই রকেট উৎক্ষেপণের একটি প্রস্তাবও আছে।

ডাঃ সরাভাই পারমাণবিক শক্তি বিভাগ সম্পর্কে গঠিত সংসদীয় সদস্যদের বেসরকারী উপদেষ্টা কমিটিতে বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সভানেত্রী ছিলেন।

## আগামী চার বছরের মধ্যেই ভারতায় রকেট উৎক্ষেপণ

নয়া দিল্লী থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি লোকসভায় জানান যে, এখন থেকে চার বছরের মধ্যে ত্রিবান্দ্রমের কাছে ভেলি হেলি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ভারতে প্রস্তুত তিন স্তরের একটি রকেট উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## মানুষের প্রাচীনতম জীবাশ্মের সন্ধান

পৃথিবীতে ত্রিশ থেকে সত্তর লক্ষ বছর পূর্বে মানুষের মত জীবের উদ্ভব হয়েছিল। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলুইন সাইমনস্ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস. আর. কে. চোপরা একটি মুখের চোয়াল পর্যালোচনা করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। উত্তর ভারতের চকপাতান অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় এই জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে।

অধ্যাপক সাইমনস্ এই জীবাশ্ম সম্পর্কে বলেছেন, এটি একটি বৃহদাকার নতুন ধরণের জীবের। ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বছর পূর্বে এরা পৃথিবীতে বিচরণ করতো—এরা ছিল বানর জাতীয় জীব, অনেকটা মানুষের মত।

রেডিও-কার্বন বা তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে যে পাহাড়ে এই জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, সেই পাহাড়ের বয়স নিরূপণ করা হয়েছে, তাতে জানা গেছে, এর বয়স অন্ততঃ এক কোটি বছর।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, এটি যে মানুষের আগের পর্যায়ের পূর্ববর্তী পুরুষের, তা আমরা বলছি না। তবে এপর্যন্ত যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় যে, জায়গ্যান্টো পিথেকাস জাতীয় নয়, অন্য এক ধরণের স্তন্যপায়ী জীব থেকেই মানুষ, বাঁদর, হনুমান, লেমুর প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। এই জীবাশ্মটি সেই সুপ্রাচীন যুগের জীবেরই। এই ক্ষেত্রে এর চেয়ে প্রাচীনতর নিদর্শন এর আগে পাওয়া যায় নি। কিছুদিন পূর্বে আফ্রিকা থেকে ডাঃ লুইস লিকি মানুষের যে প্রাচীনতম জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছেন, তার বয়স ২০ লক্ষ বছর।

গত এপ্রিল মাসে হিমালয় পর্বতের পাদদেশে বিলাসপুরে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গ্র্যান্ট ই. মেয়ারের নির্দেশে একটি তথ্য-সন্ধানী অভিযান চালানো হয়েছিল। মিঃ মেয়ার ডাঃ সাইমনসেরই সহকর্মী। বিলাসপুরেই এই জীবাশ্মটি পাওয়া যায়।

ডাঃ চোপরা এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, গরিলার চোয়ালের চেয়েও এটি বড়। সামনের দাঁতগুলি ঠিক মানুষের মত। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ জীবটি ছিল মানুষের মত। লাঙ্গুলহীন বানরজাতীয় জীব ও আদিম মানব—এই দুই জাতীয় জীবের মাঝামাঝি পর্যায়ে ছিল এদের অস্তিত্ব।

## এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা


১। রাধাকান্ত মণ্ডল
(রসায়ন বিভাগ)
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

২। রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫।৪, বালীগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

৩। প্রভাতকুমার দত্ত
৩৬-বি, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫

৪। হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২৫।এ, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

৫। বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়
৩৯।৬, ব্রড ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৯

৬। পূর্ণাংশু রায়
(পদার্থবিদ্যা বিভাগ)
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৭। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

৮। প্রদোষচন্দ্র রায়চৌধুরী
বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ
বাঁকুড়া

৯। সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়
(ফুড টেক্‌নোলজী অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল
ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ)
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

১০। সুনীল সরকার
বি. পি. সি. জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল
পোঃ কৃষ্ণনগর
নদীয়া

১১। সমর চক্রবর্তী
১২, মুন্সী বাজার রোড
কলিকাতা-১৫

১২। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯



সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

# মডেল প্রতিযোগিতা

আগামী মার্চ '৬৯ মাসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নবনির্মিত ভবনে প্রবেশ-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞানবিষয়ক মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়বস্তুর উপর পূর্ণাঙ্গ মডেল প্রস্তুত করিতে হইবে। কোন মডেল পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হইলে ২২০ ভোল্ট এ. সি তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবস্থা থাকিবে, তবে অন্য কোন সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন হইলে প্রতিযোগীকেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে তাহার মডেলের সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার নিকট হইতে পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিয়া সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে। পরীক্ষকদের নিকট প্রতিযোগীদের তাহাদের মডেল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে হইতে পারে। মডেলের মৌলিকত্ব, সংগঠন, তাত্ত্বিক উৎকর্ষ ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ণীত হইবে এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার দেওয়া হইবে।

নিম্ন ঠিকানায় পরিষদের কার্যালয়ে বেলা ১২টা হইতে ৫টার মধ্যে মডেল পৌঁছাইবার শেষ তারিখ হইল ৭ই মার্চ, ১৯৬৯।

**বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ**
পি-২৩, সি. আই. টি. স্কিম নং ৬৪
রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

**জয়ন্ত বসু**
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ | দ্বিতীয় সংখ্যা


## জীবন-রহস্যের সন্ধানে আণবিক প্রজনন-বিজ্ঞান


প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়


আমাদের জ্ঞানের সীমানা বিগত কয়েক বছরের মধ্যে যেমন প্রসারিত হয়েছে, তেমনি পল্লবিত হয়েছে আজকের বিজ্ঞানও নানা নতুন শাখা-প্রশাখায়। এই শতকের বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম শাখাগুলির মধ্যে যে নামটি বোধ হয় সবচেয়ে বেশী রকম আলোচিত এবং সেই সঙ্গে কিছুটা বিতর্কিতও, সেটি আমাদের সবার কাছেই কয়েকটি কালজয়ী আবিষ্কারের দৌলতে আজ বিশেষভাবে পরিচিত।

যদিও বর্ণসঙ্কর করে উদ্ভিদ বা প্রাণীর মানের উৎকর্ষ কিছুটা কমানো বা বাড়ানো যে সম্ভব, সে সম্বন্ধে মেণ্ডেলের (১৮২২ থেকে ১৮৮৪) আগেও অনেকেই (যেমন জার্মেনীর জোশেফ ক্যোলরেয়টার, ইংল্যাণ্ডের নাইট কিম্বা গদ্) চিন্তা করেছিলেন, তবুও বলতে গেলে অষ্ট্রিয়ার নাম-না-জানা এই পাদরী সাহেবই আধুনিক প্রজনন-বিজ্ঞানের জন্মদাতা। তাঁর মৃত্যুর পর বহুদিন কেটে গেছে। এক জীবন থেকে নতুন জীবনে বংশগতির প্রবহমানতায় অভিভূত হয়ে আমরা খুঁজেছি তার উৎস প্রথমে সামগ্রিক ভাবে একটি জীবকোষে। পরে আমাদের নজরে পড়েছে কোষের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসে এবং তার ভিতরকার ক্রোমোজোমের উপর। তারও পরে আমরা তাকিয়েছি ক্রোমোজোমের মধ্যেকার জিনের দিকে আর ভেবেছি জিনই বুঝি সৃষ্টির সর্বশেষ কথা। কিন্তু না, এই খোঁজার বুঝি শেষ নেই। আজ জিনের মধ্যেকার সেই সাধারণ অথচ অসাধারণ নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে সেই

অণুটিকে আমরা খুঁজে পেয়েছি, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রকৃতির বিশাল বৈচিত্র্যের চাবিকাঠি।

জীবনের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে এই ভাবেই আজ আমরা অণু-পরমাণুর অচিন স্তরে প্রজনন-বিজ্ঞানের গবেষণা চালাচ্ছি। অণু-পরমাণুর অচিন স্তরেই হয়তো প্রজনন বিজ্ঞানের শেষ কথাটি লেখা আছে। তাই এই শতকের 'আণবিক প্রজনন-বিজ্ঞানের' (Molecular genetics) বিচিত্র গবেষণার অক্লান্ত সাধনায় উত্তীর্ণ হতে চাইছে প্রাণের গোপন রহস্যতলের সেই সুরলোকে, যার ছন্দ কত সহজে অথচ কি অদ্ভুত বিস্ময়ে ছড়িয়ে আছে গাছের সবুজ পাতায়, ফুলের নরম সৌন্দর্যে, পাখীর উড়ে চলার আনন্দে, জড়িয়ে আছে প্রকৃতির সব কিছুতে—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাসে, ব্যাক্টিরিয়োফাজে কিম্বা খোদ ব্যাক্টিরিয়ার অদৃশ্য আক্রমণে অথবা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মানুষের প্রতিভাদীপ্ত জীবনীশক্তির প্রতিটি স্পন্দনে।

যে ক্রোমোজোমকে মাত্র সম্বল করে যাত্রা সুরু করেছিল সেদিনের প্রজনন-বিজ্ঞান, ১৮৯১ সালে মিশারের নিউক্লিক অ্যাসিডের খোঁজ পাওয়ার পর, তার সেই সেকেলে চেহারা পাল্টে গেল, যদিও নিউক্লিক অ্যাসিডের সঙ্গে বংশগতির সম্পর্কের গভীরতাটুকু তখনো ভাল করে বোঝা যায় নি। এর অনেক দিন পর, নিউমোকক্কাস জাতের জীবাণুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে গ্রিফিথ দেখালেন, বংশগতির ধারাবাহিকতা এবং বৈচিত্র্যের মূলে রয়েছে একটি বিশেষ ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু, যার ডাক নাম হলো ডি-এন-এ (DNA)। ১৯৪৪ সালে আভেরী, ম্যাকলিয়ড এবং ম্যাককার্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এই কথারই সমর্থন করলো। এই ধারণাকেই দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিল ১৯৫২ সালে হার্সে ও চেজের কাজ ডি-এন-এ-র উপর কাজ। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে তামাক গাছের পাতা আক্রমণকারী টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাস (সংক্ষেপে: TMV) থেকে জানা গেল আর এক ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিডের কথা। নাম তার আর-এন-এ (RNA)।

এই দুটি নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো আণবিক প্রজনন-বিজ্ঞান। বহুর মধ্যে একের সন্ধান যেন পাওয়া গেল এইবার।

কিন্তু ক্রোমোজোমের মধ্যে—জিনের মধ্যে যে এই নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু রয়েছে এবং গোপনে গোপনে তার কাজ করে চলেছে, তার প্রমাণ কোথায়? চললো আরো গবেষণা। বাছুরের থাইমাস গ্রন্থির (Calf thymus glands) ক্রোমোজোমের পরীক্ষা করে মিরস্কি এবং রিস দেখালেন, তার মধ্যে রয়েছে ৪৬·৫% থেকে ৪৭·৬% এই ডি-এন-এ; ৭·৫% থেকে ১৪%-এর মত আর-এন-এ; আর বাকী অংশটুকুর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া গেল হিসটোন এবং অন্যান্য ভারী প্রোটিন। আরো প্রমাণ আসতে লাগলো একের পর এক। Feulgen stain শুধুমাত্র ডি-এন-এ-কেই রঞ্জিত করে। দেখা গেল নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমগুলি এতে উজ্জ্বল রং নিচ্ছে। সুইফ্ট ও অ্যালফার্ট আবার লক্ষ্য করলেন, কোষ বিভাজনের সময় কিভাবে ক্রোমোজোমগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডি-এন-এ-র পরিমাণ প্রথমে দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং পরে সমান দু-ভাগে দুটি অপত্য কোষে তা হারিয়ে যায়। নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু ২,৬০০Å আলোক-তরঙ্গের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি (UV) সবচেয়ে বেশী শোষণ করে থাকে। ক্যাসপারসন এবং ব্র্যাসে দেখালেন যে, যেহেতু ক্রোমোজোমগুলি নিউক্লিক অ্যাসিডের আধার, তাই মেটাফেজের (Metaphase) ক্রোমোজোমগুলিও ঐ একই দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গ সবচেয়ে বেশী শোষণ করে থাকে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ল্যাম্পব্রাশ জাতের (Lamp-brush chromosomes of vertebrate oocytes) প্রকাণ্ড ক্রোমোজোমের গঠন নিয়ে পরীক্ষা করে তার মধ্যে ডি-এন-এ অণুর প্রাধান্য দেখতে পেলেন ক্যালান এবং গল। আরও দেখা গেল—ডি-এন-এজ (DNA-ase) মানে, যে এনজাইম ডি-এন-এ-কে ধ্বংস করবার সামর্থ রেখে—প্রয়োগের ফলে ডি-এন-এ অণু নষ্ট হয়ে গেলে ক্রোমোজোমের সুনির্দিষ্ট আকারও নষ্ট হয়ে যায়। এই ব্যাপারে সবচেয়ে জোরদার প্রমাণ দিল হাওয়ার্ড, পেল্ক এবং টেলরের অটোরেডিওগ্রাফি। এতে করে হাইড্রোজেনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ—ট্রিটিয়াম, থাইমিডিনের মধ্যে ঢোকানো হলো। সেই ট্রিটিয়েটেড থাইমিডিন সহজেই প্রবেশাধিকার পেলো ক্রোমোজোমের ভিতরে ডি-এন-এ অণুর নিউক্লিয়োটাইডগুলির মধ্যে। ফটোগ্রাফিক প্লেটে তাই ক্রোমোজোমগুলিকেই কালচে দেখা গেল, তেজস্ক্রিয়তা বিচ্ছুরণের দরুণ। এসবের সঙ্গে সঙ্গে সাইটোফটোমেট্রিক নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিউক্লিক অ্যাসিড সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেল।

যে মুহূর্তে এই সত্যটিই বড় হয়ে দেখা দিল যে, জীবন-রহস্যের যাবতীয় বৈচিত্র্যের প্রকাশের মূলে রয়েছে নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের কিছু হের-ফের মাত্র, ঠিক সেই মুহূর্তেই বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সামনে যেন খুলে গেল অসীম সম্ভাবনা নিয়ে একটি দ্বিতীয় জগতের দরজা। কেন যে ক্রোমোজোমের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বা তাদের গঠনগত যে কোন পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে জীবনের প্রকাশকে বদ্‌লে দিতে পারে, সেটা এবার জলের মত সোজা হয়ে গেল তাঁদের কাছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই মিটলো না। প্রশ্ন দেখা দিল, কোন্ পথে ঠিক কি ভাবে চোখের আড়ালে থেকে সামান্য একটি অণু অসামান্য বহু—বহু রকমের জটিল বিক্রিয়া ঠিকমত চালিয়ে জীবনকে বিকশিত করে? তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই বা কোথায়?

বিজ্ঞানীরা আবার পড়লেন অথৈ জলে। সংক্ষিপ্তভাবে এবং সহজে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তো সহজ নয়! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে চললো নিরন্তর নীরব সাধনা, অজানাকে জয় করবার এক দুঃসাহসিক দুর্বার প্রচেষ্টা। অবশেষে ফল তার মিললো। উত্তর মিললো একটি প্রশ্নের নয়, অনেকগুলির। সমগ্র পৃথিবী আর একবার চমৎকৃত হলো।

ইতিপূর্বেই অ্যাসট্বারী, অসীমভ্, প্যলিং এবং স্যাঙ্গারের মত আরও অনেকের কাজের ফলে প্রোটিন অণুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছিল। আমরা জানতাম প্রোটিনের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ নিবিড়, কারণ এনজাইমগুলি প্রোটিনধর্মী। এবার জানা গেল এই ডি-এন-এ-ই নাকি তিন রকমের আর-এন-এ-র সহায়তায় জীবকোষে রাইবোজোমের উপর একটির সঙ্গে আর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড পেপ্‌টাইডের বাঁধুনাতে বেঁধে রকমারী প্রোটিন বা এনজাইম—যারা জীবনের জটিল বিক্রিয়ার পদে পদে কাজে লাগে—তৈরি করে। ২৪ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডের কথা এখন অবধি জানা গেছে। ক্রীক বললেন, খুব সম্ভব ডি-এন-এ-র নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ দুটি পিউরিন এবং দুটি পিরিমিডিনের মধ্যে বিভিন্ন সজ্জাক্রমে সাজানো প্রতি তিনটি (Triplet) ক্ষার একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ধরবার জন্যে দায়ী। মেসেঞ্জার বা দূত হিসেবে mRNA কিভাবে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে সাজানো হবে, তার ছক বা প্ল্যান বয়ে আনে ডি-এন-এ থেকে। mRNA-এর ফস্‌ফেট অণুগুলির সঙ্গে রাইবোজোমের প্রোটিন অণুগুলি আট্‌কে যায় বলে মনে করেন ওয়াটসন। তারপর ট্র্যান্সফার বা পরিবাহক—tRNA এক একটি নির্দিষ্ট (Specific) অ্যামিনো অ্যাসিড ধরে এনে mRNA-এর

প্ল্যান অনুযায়ী তাদের সাজিয়ে তৈরি করে দরকারমত প্রোটিন বা এনজাইম। এসব তথ্য নির্ভুল প্রমাণিত হলো কোষহীন পরিবেশে (Cell-free system) বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে। আরো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এলো চ্যাপভিল, লিপ্‌ম্যান ব্রেনার এবং বেঞ্জারের কাছ থেকে। দেখা গেল, প্রোটিন তৈরির ফরমুলা খাটছে একই ভাবে জীব-জগতের সর্বত্র (Universal code)। এহ্‌রেনষ্টাইন এবং লিপ্‌ম্যান হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের বেলায় কাজে লাগালেন E. coli-এর tRNA আর ইঁদুরের রেটিকুলোসাইটের mRNA ও রাইবোজোম। দুটি বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়া জিনিষ দুটি অদ্ভুতভাবে একই সূত্রে মিলে কাজ করলো ঠিকমতই। বিডল্ এবং টিটামের 'একটি জিন: একটি এনজাইম' মতবাদটিকে একটু পরিমার্জিত করবার এখন প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল—কেন না, জিনও যে আজ আর অবিভাজ্য থাকলো না। কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জিনের মধ্যেও তিনটি অংশের (Subunits) নামকরণ করলেন বেঞ্জার: সিস্‌ট্রন (Cistron), রেকন (Recon) এবং মিউটন (Muton)। rII পরিবর্তিত ফাজ $T_4$-এর উপর চললো গবেষণা। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে শ্রমের যে বিভাগ (Division of labour) দেখা যায়, অণু-পরমাণুর স্তরেও যেন তারই এক প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেল।

একটু একটু করে যেন সমস্ত জিনিষটা স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হতে লাগলো আমাদের চোখের সামনে। একটির পর একটি ধাপ পেরিয়ে জীবনের বিচিত্র বিকাশ (Differentiation) কিভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, কে যে কিভাবে বলে দেয় এই এগিয়ে চলবার পথে কখন কিরকম করে কতটুকু এনজাইম বা প্রোটিনের প্রয়োজন মেটানোর কথা—এই সবই ধরা দিল বিজ্ঞানীদের দুশ্চর তপস্যায়। জ্যাকব এবং মনো আগেই বলেছিলেন, কেমন করে নিয়ামক বা রেগুলেটর জিনের আদেশ অনুযায়ী অপারেটর বা চালক জিন তার পাশের সিস্‌ট্রনগুলি থেকে mRNA তৈরির কাজ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সোজা ভাষায় বললে এই দাঁড়ায় যে, চালক জিনের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আর-এন-এ পলিমারেজ (RNA-polymerase) এনজাইমটি অকেজো হয়ে থাকে। একটি জিন: একটি এনজাইমের বদলে এখন যেন বলা যেতে পারে—একটি অপেরন (Operon): এক বা একাধিক এনজাইম। তবে এখন যতদূর মনে হচ্ছে—যেন অনেকগুলি অপেরন (একটি অপেরনের মধ্যেই থাকে একটি অপারেটর জিন, একটি রেগুলেটর জিন এবং কয়েকটি স্ট্রাকচার্যাল জিন বা সিস্‌ট্রন) এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে থাকে। তার মানে এক নম্বর অপেরন যখন সক্রিয়, তার অনিবার্য ফল যেন দু-নম্বর অপেরনের নিষ্ক্রিয়তা। আবার এই দু-নম্বর অপেরনের এহেন নিষ্ক্রিয়তাই তিন নম্বর কি চার নম্বর অপেরনের সক্রিয়তার কারণ—অনেকটা এই রকম আর কি। এই ভাবেই অপেরনগুলিকে নিয়ে যেন একটি বৃত্ত রচনা করা যায়। কিন্তু অবস্থা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে তখনি, যখন এই সূত্র ধরে এক ক্রোমোজোমের সঙ্গে অন্য ক্রোমোজোমের সম্পর্ক বিচার করতে চাওয়া হয়। অপেরনের বেলায় যেমন, ঠিক সেইভাবেই একটি ক্রোমোজোম কি তার বিশেষ একটি অঙ্গ (Segment), জীবনের বিকাশের এক-একটি স্তরের জন্যে বোধহয় নির্দিষ্ট করাই থাকে এবং একটির সঙ্গে আরেকটি—এই ভাবে ক্রোমোজোমগুলির মধ্যেকার বোঝাপড়ার উপর ভর করেও হয়তো এই রকম আর একটি বৃহত্তর বৃত্ত রচনা করা সম্ভব, সামগ্রিকভাবে যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই জীবনের বহুমুখিতার মধ্যে।

কিছুদিন আগে অবধি আমাদের এই ধারণা ছিল যে, নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু বুঝি কেবলমাত্র

এনজাইম তৈরিই করে থাকে। এখন এই কথাটা একেবারে স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে, শুধু তৈরি করাই নয়, নিউক্লিক অ্যাসিডের অণু এই ডি-এন-এ ও আর-এন-এ এনজাইম বা প্রোটিন সংশ্লেষণের হার, পরিমাণ—এমন কি, তার কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে; অর্থাৎ তাহলে গভীরতর অর্থে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায় যে, এই ডি-এন-এ-ই যেন জীবনের পরিমাণগত (Quantitative) এবং গুণগত (Qualitative) সমস্ত ধর্মের গোড়ার কথা। প্রথমটি, অর্থাৎ পরিমাণগত যে সমস্ত গুণ, যেমন—রোগা / মোটা, লম্বা / বেঁটে, কি চুল ঘন / পাত্‌লা বা কটা / কালো অথবা চোখের মণির রং বাদামী / কালো—এরা যে প্রত্যেকেই ডি-এন-এ অণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের—বিশেষ করে চারটি ক্ষারের সজ্জাক্রমের হেরফেরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সে সম্বন্ধে আমরা বর্তমানে নিঃসন্দেহ। কিন্তু মানুষের অন্যান্য গুণগুলি—তার বুদ্ধি, স্মৃতি-শক্তি, ভালবাসা, প্রেম, প্রতিভা, অনুরাগ, বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা, ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক মাধুর্য বা দুর্বলতা—এসবের সঙ্গে ডি-এন-এ-র সম্বন্ধ কি রকম? সঠিক বলা হয়তো এই মুহূর্তেই সম্ভব নয়, যেমন বলা যাচ্ছে না আজও সঠিক করে সৃষ্টির সুরুতে প্রথমে ডি-এন-এ এসেছিল, না আর-এন-এ? আজ আমরা দেখছি, বলতে গেলে তিন রকমের আর-এন-এ-ই তৈরি হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ডি-এন-এ থেকে। ডি-এন-এ, আর-এন-এ-র মধ্যে তফাৎ সামান্যই। প্রথমটিতে পাওয়া যায়—ডি-অক্সি-রাইবোজ এবং থাইমিন, দ্বিতীয়টিতে রাইবোজ চিনি এবং ইউরাসিল (Uracil)। এছাড়া প্রথমটির বেলায় দুটি নিউক্লিয়োটাইডের চেন বা শেকল জড়ানো থাকে (Double helix), যাদের মধ্যে থাকে মইয়ের ধাপগুলির মত হাইড্রোজেন পরমাণুর বাঁধুনী, আর দ্বিতীয়টিতে নিউক্লিওটাইড-গুলি থাকে একটি চেনে (Single chain)। এখন আবার এসব তফাৎগুলির ব্যতিক্রমও চোখে পড়ছে অহরহ। যেমন—একটি চেনওয়ালা ডি-এন-এ পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে কাজ ডি-এন-এতে থাইমিনের জায়গায় ইউরাসিল। এসব ছাড়াও আর-এন-এ-সম্পন্ন ভাইরাসকে দেখা গেছে ডি-এন-এ-র অনুপস্থিতিতে আর-এন-এ থেকেই নতুন একটি আর-এন-এ অণুর জন্ম দিতে। এইসব দেখে শুনে এবং বিবর্তনের গতি সরলতা থেকে জটিলতার দিকে ধরলে যেন মনে হয় আর-এন-এই প্রথমে এসেছে। কারণ তার গঠনও যেমন ডি-এন-এ-র চেয়ে অনেক সরল—কম পলিমেরাইজড্ (Polymerised) এবং অনেক কম জড়ানো (Helical), তেমনি সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে যে সব ভাইরাস তৈরি হয়েছিল, তাদের বেশ বড় রকম একটা অংশের মধ্যেই আর-এন-এ-রই প্রাধান্য। তবে কি সৃষ্টির মূল্যায়নের মাপকাঠিতে আর-এন-এ থেকে ডি-এন-এ তৈরির পথটি আজ কোন অসুবিধার দরুণ বন্ধ হয়ে গেছে? না কি ডি-এন-এ থেকে আর-এন-এ তৈরি হচ্ছে, আবার দরকার পড়লে আর-এন-এ থেকেও ডি-এন-এ তৈরি হবার অবকাশ রয়েছে এমন কোন পথে যা আমরা এখনো খুঁজে পাই নি? এছাড়াও যে প্রোটিন তৈরি করছে নিউক্লিক অ্যাসিড—সেই নিউক্লিক অ্যাসিডেরই একটি অণু তৈরি করতে লাগছে আবার এনজাইম বা প্রোটিন। তাহলেও তো প্রশ্ন জাগে, দুটির কোন্‌টি আগে এসেছিল? না কি দুটিই হঠাৎ এক সঙ্গে এসে গিয়েছিল?

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে কি করে জন্ম নিয়েছিল এই জীবন্ত অণু (Living molecule), আমরা এখনো বোঝবার চেষ্টা করছি। যে ভাবেই হোক না কেন, আমরা আজ একথাটা বুঝতে পেরেছি বেশ ভালভাবেই যে, এই নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর সঙ্গে আমাদের দেহের এবং মনের নাড়ীর যোগ রয়েছে। প্যলিং-এর সাম্প্রতিক গবেষণা সাক্ষ্য দিচ্ছে—মানসিক অসুস্থতার

সময় প্রোটিন তৈরির কাজে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এথেকেই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, হয়তো ডি-এন-এ স্তরেই বাঁধে গোলযোগ। ক্যান্সারের মত অনেক আণবিক রোগেরই (Molecular diseases) মূল কারণ লুকিয়ে আছে মনে করা হচ্ছে—এই অসাধারণ একটি নিউক্লিক অ্যাসিডে, অণুর কোন এক অজানা স্তরে। ভিনোগ্র্যাড (১৯৬৮) কয়েকটি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তো ডি-এন-এ অণুর অদ্ভুত বাহ্যিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতা যদি ডি-এন-এ অণুর উপর নির্ভরশীল হয়, তবে প্রেম, বুদ্ধি এবং অন্যান্য ভাবাবেগও সম্ভবতঃ, সম্ভবতঃ কেন নিশ্চয়ই তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

নবজাতকের জন্মের সময়েই একটি ডি-এন-এ অণুতেই যেন লেখা থাকে তার ভাগ্যলিপি। তার আর নড়চড় হবার যো থাকে না ( অবশ্য পরিব্যক্তি বা মিউটেশন না হলে )। সে শুধু বিভিন্নভাবে বিকশিত হতে পারে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশ অনুযায়ী। এই দিক দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সমগ্র জীবজগতের বিবর্তনও যেন কোন্ পথে কতদূর হবে—সেটাও বহুকোটি বছর আগেই কেউ স্থির করে লিখে দিয়েছে. সেদিনের সেই সবে গড়ে ওঠা ডি-এন-এ-র বুকে, তার গোপন ভাষায় (Code)। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই এতে। মুলর বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতেই আমরা এই অসামান্য অণুটিকে হাত করতে পারবো—তার হৃদয়ের সাঙ্কেতিক ভাষায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারবো এবং পছন্দমত তৈরি করতে পারবো রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, নিউটন কিম্বা বিবেকানন্দ।

জীবন-রহস্যের সন্ধানে আণবিক প্রজনন-বিজ্ঞানের এগিয়ে চলায় সাহায্য করতে গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞানের কত নতুন নতুন শাখা অল্পদিনের মধ্যেই। এই শতকের বিজ্ঞানের মিলনক্ষেত্র সে। তার যাত্রা অসীমের নিমন্ত্রণে আপনাকে জানবার জন্যে। এই জানার বুঝি শেষ নেই!

# কিণ্বন-পদ্ধতি বা ফার্মেণ্টেসন

শ্রীসতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী

কিণ্বন অর্থাৎ ফার্মেন্টেসন এমনি একটি পদ্ধতি, যার সাহায্যে সস্তা ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থকে জীবাণুর সাহায্যে মূল্যবান পদার্থে পরিণত করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে যে সব উপজাত দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, সেগুলিরও অর্থনৈতিক গুরুত্ব কম নয়। এই পদ্ধতির মস্ত বড় একটা আকর্ষণ এই যে, সাধারণ বায়ু-চাপ ও ঘরের তাপমাত্রাই এর সুষ্ঠু ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট। জৈব রাসায়নিকেরা জীবাণুকে কাজে লাগাবার সময় কোন বিষাক্ত দ্রব্য, যেমন—ফস্‌ফরাস অক্সিক্লোরাইড অথবা ১০ বা ততোধিক বায়ু-চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। কিন্তু রসায়নবিদ্‌দের কোন কোন পণ্য উৎপাদনের জন্যে উপরিউক্ত ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হয়। সুতরাং সেটা যে খুব ব্যয়সাপেক্ষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে আকাঙ্খিত বস্তুকে অতি সহজেই অন্যান্য উপাদান থেকে পৃথক করা সম্ভব, যদিও একথা সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, বহু প্রয়োজনীয় পণ্য, যেমন—অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন, বুটানল, সাইট্রিক অ্যাসিড অথবা ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড প্রভৃতির অন্যান্য উপজাত পদার্থ থেকে পৃথকীকরণ অতি সহজেই করা হয়েছে এবং তাদের রাসায়নিক প্রকৃতিরও কোন পরিবর্তন ঘটে নি। রাসায়নিক পদ্ধতিতেও উপরিউক্ত দ্রব্যাদি তৈরি করা সম্ভব, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্যে এখন এর ব্যাপক ব্যবহার হয় না। কিন্তু এমন অনেক জিনিষ আছে, যা কেবল ফার্মেন্টেসন পদ্ধতির সাহায্যেই তৈরি করা সম্ভব—রাসায়নিক পদ্ধতি যেখানে একেবারেই অচল, যেমন—ভিটামিন বি$_{১২}$। আবার এও দেখা গেছে যে, অনেক জিনিষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবেই তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তার জৈব ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে; যেমন—অ্যামিনো অ্যাসিড। রাসায়নিক পদ্ধতিতে যেখানে ১০।১২টি ক্রমিক বিক্রিয়ার পর কোন জিনিষ উৎপাদন করা যায়, সেখানে জীবাণুর সাহায্যে একটিমাত্র বিক্রিয়ায় তা করা সম্ভব; যেমন—ষ্টেরয়েড প্রস্তুতিকরণ। সুতরাং যদি কোন জীবাণুর সাহায্যে সহজলভ্য ও সস্তা কাঁচা মালকে প্রয়োজনীয় পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়, তবে পণ্য উৎপাদনে তার ব্যবহার খুবই যুক্তিযুক্ত। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাবষ্ট্রেট (Substrate—জীবাণুর খাদ্য এবং যার উপর বিক্রিয়া সংঘটিত হয়) হলো কাঁচা মাল এবং জীবাণু হলো যন্ত্র, যা নতুন পদার্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম, অর্থাৎ সাবষ্ট্রেট + জীবাণু → আকাঙ্খিত পদার্থ

এখন প্রশ্ন হতে পারে—কিণ্বন বা ফার্মেন্টেসন পদ্ধতি কি? ফার্মেন্টেসন কথাটার আভিধানিক অর্থ হলো স্ফুটন। এরূপ নামকরণের কারণ হলো এই যে, এই জাতীয় বিক্রিয়া অ্যালকোহল তৈরি করবার সময়ই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা হয়েছিল। জীবাণুর সাহায্যে অ্যালকোহল তৈরি করবার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রচুর পরিমাণে বুদ্‌বুদের আকারে তরলের উপর নির্গত হয় এবং অ্যালকোহল তৈরির চরম সময়ে তরলের এত বেশী আলোড়ন হয় যে, দেখে মনে হয়, তরলটা যেন ফুটছে। এজন্যেই এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে ফার্মেন্টেসন। যদিও অন্যান্য অনেক

ক্ষেত্রে স্ফুটন পরিলক্ষিত হয় না তবুও জীবাণুর সাহায্যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করাকেই ফার্মেন্টেসন বলে অভিহিত করা হয়। সুতরাং ফার্মেন্টেসনের সংজ্ঞা হলো—যে পদ্ধতিতে জীবাণু থেকে নিঃসৃত জারক রসের (Enzyme) সাহায্যে কোন জৈব পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করে নতুন পদার্থ সৃষ্টি করা হয়, তাকেই ফার্মেন্টেসন পদ্ধতি বলে।

## ফার্মেন্টেসন পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্য ও তার ব্যবহার

লুই পাস্তুর ১৮৫০ সালের শেষার্ধে শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন। তখন ভিনিগার, মদ ও রুটি তৈরি করতেই জীবাণুর ব্যবহার করা হতো। প্রথম যে রাসায়নিক পদার্থটিকে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল বলে অভিহিত করা হলো, তা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং ব্যাক্টিরিয়া হলো তার হোতা। এক বছর পরে ১৮৫৮ সালে ঈষ্ট-এর সাহায্যে তৈরি করা হলো গ্লিসারল ও ইথানল, ১৮৮৭ সালে কালো মোল্ড (Black mould, যার বৈজ্ঞানিক নাম Aspergillus niger) ব্যবহার করা হলো ট্যানিন থেকে গ্যালিক অ্যাসিড তৈরি করবার জন্যে। ১৮৭৬ সালে অ্যানেরোবিক ব্যাক্টিরিয়ার (Anaerobic bacteria—যে সব ব্যাক্টিরিয়ার অক্সিজেনের কোন প্রয়োজন হয় না) সাহায্যে বুটানল তৈরি করা সম্ভব হলো এবং ১৮৯৩ ও পরবর্তী সালে বৈজ্ঞানিক ওহেমরের (Wehmer) অবদান হলো পেনিসিলিয়াম মোল্ডের সাহায্যে সাইট্রিক ও অক্সালিক অ্যাসিড তৈরি করা। আমেরিকায় প্রথম ল্যাক্টিক অ্যাসিডের উৎপাদন শিল্প প্রবর্তিত হয় ১৮৮১ সালে; কিন্তু বৃহৎ শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার অ্যালকোহল তৈরি করবার ব্যাপারেই বিশেষভাবে চালু হয়েছিল। এভাবে ধীরে ধীরে জীবাণুর সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করবার দিকে বৈজ্ঞানিকদের একটা ঝোঁক পড়লো এবং যার ফলে ১৯২৯ সালে পেনিসিলিন তৈরি করা সম্ভব হলো। এই অত্যাশ্চর্য ফল অনুধাবন করেই বৈজ্ঞানিকদের ফারমেন্টেসন পদ্ধতির দিকে একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা দিল, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো বর্তমান শতাব্দীর বহু প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য রাসায়নিক পদার্থ। পণ্য উৎপাদনে যে সব জীবাণু ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলি সাধারণতঃ ঈষ্ট, মোল্ড ও ব্যাক্টিরিয়া পর্যায়ভুক্ত। যে সব রাসায়নিক পদার্থ এই ফার্মেন্টেসন পদ্ধতির সাহায্যে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, তার তালিকা ও মোটামুটি ব্যবহার এখানে দেখানো হলো।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | ভিটামিন | বি$_2$, বি$_{12}$ ও $\beta$-কেরোটিন | ওষুধ প্রস্তুতিকরণ ও প্রাণী-খাদ্য। |
| | জারক রস (Enzyme) | অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ, পেকটিনেজ, সেলুলেজ, ক্যাটালেজ, লিপেজ, ইন্‌ভারটেজ। | গবেষণাগার, ওষুধ প্রস্তুত ও খাদ্য-শিল্পে। |
| | প্রোটিন | ঈষ্ট-কোষ প্রোটিন | প্রাণী-খাদ্য ও 'বি' ভিটামিনের উৎস হিসাবে। |
| ৪। | অ্যামিনো অ্যাসিড | গ্লুটামিক অ্যাসিড, লাইসিন, মেথিয়ো-[illegible], ট্রিপ্‌টোফেন, থিয়োনিন প্রভৃতি | খাদ্য-শিল্প ও ওষুধ প্রস্তুতিতে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫। | পলিমার | ডেকষ্ট্রান | খাদ্যশিল্পে। |
| ৬। | অ্যান্টিবায়োটিক্স | পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরামফেনিকল্, টেট্রাসাইক্লিন্স্, ব্যাসিট্রাসিন, গ্রামিসিডিন, টাইরোসিডিন, নিয়োমাইসিন, গ্রিথিয়োফালভিন, নিস্টাটিন, এরিথ্রোমাইসিন, মাইটোমাইসিন-সি, কানামাইসিন প্রভৃতি। | ওষুধ হিসাবে |
| ৭। | জৈবঅ্যাসিড | (ক) সাইট্রিক ও ল্যাক্টিক অ্যাসিড | (ক) খাদ্য অম্লীকরণে, খাদ্য শিল্পে। |
| | | (খ) ফিউমারিক ও ইটাকনিক অ্যাসিড | (খ) প্লাস্টিক শিল্পে। |
| | | (গ) গ্লুকোনিক অ্যাসিড | (গ) কালি তৈরি করতে। |
| | | (ঘ) অ্যাসিটিক অ্যাসিড | (ঘ) ভিনিগার হিসাবে খাদ্যে। |
| | | (ঙ) পাইরুভিক, অক্সালিক, কোজিক ও সাক্সিনিক অ্যাসিড প্রভৃতি। | (ঙ) জৈব রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে। |
| ৮। | দ্রাবক | ইথানল, অ্যাসিটোন, বুটানল, অ্যামাইল অ্যালকোহল, গ্লিসারল ও ফিউজেল অয়েল প্রভৃতি। | দ্রাবক হিসাবে। |
| ৯। | অ্যালকালয়েড | লাইসারজিক অ্যাসিড ও তাথেকে উদ্গত পদার্থ (Derivative), ডিমেথিলেটেড কল্চিসিন (Colchicine) | শারীরিক কার্য নিয়ন্ত্রণকারী ওষুধ হিসাবে। |
| ১০। | জিবারেলিন | জিবারেলিক অ্যাসিড, জিবারেলিন-এ। | বার্লির অঙ্কুরোদ্গম ও ফল পাকাবার জন্যে। |
| ১১। | ষ্টেরয়েড | ১১-৫-হাইড্রক্সিপ্রোজেষ্টেরন, করটিজোন ও হাইড্রোকরটিজোন থেকে উদ্গত পদার্থ। | ওষুধ প্রস্তুতিকরণে। |
| ১২। | বিবিধ | (ক) সরবোজ | (ক) ভিটামিন-সি তৈরির অন্তর্বর্তী রাসায়নিক হিসাবে। |
| | | (খ) ফ্রুকটোজ | (খ) মিষ্ট তরল হিসাবে। |
| | | (গ) ডাইহাইড্রক্সিঅ্যাসিটোন | (গ) চর্ম শিল্পে। |
| | | (ঘ) ফিনাইল অ্যাসিটাইল কার্বিনল | (ঘ) L এফিড্রিন তৈরির অন্তর্বর্তী হিসাবে। |

উপরিউক্ত তালিকায় অনেকগুলি যৌগিক পদার্থের নাম করা হয়েছে, কিন্তু এদের মধ্যে অনেকগুলিরই বেশী চাহিদা নেই। তবুও এদের নাম উল্লেখ করবার কারণ হলো, ফারমেণ্টেসন পদ্ধতিতে রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা কিভাবে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, সেটা লক্ষ্য করবার জন্যে। এখন দেখা যাক, এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির আর্থিক মূল্য কি হতে পারে?

## ফার্মেণ্টেসন পদ্ধতিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য তালিকা

( টাকা প্রতি পাউণ্ড হিসাবে )

### অ্যালকোহল ও দ্রাবক

| | |
|---|---|
| অ্যাসিটোন— | ০·৪৯ |
| বুটানল— | ১·০১ |
| ইথানল— | ০·৫৯ |
| ফিউজেল অয়েল— | ১ ১৬ |
| গ্লিসারল— | ১·১৬ |

### অ্যাসিড

| | |
|---|---|
| সাইট্রিক— | ২·২১ |
| ল্যাকটিক— | ১·১৬ |
| ইটাকোনিক— | ২·২১ |
| অক্সালিক— | ১·৩৯ |
| টারটারিক— | ২ ৭৪ |
| গ্লুকোনিক— | ১·১৬ |
| ফিউমারিক— | ১ ৩৯ |

### বিবিধ

| | |
|---|---|
| ঈষ্ট— | ০ ২০ |
| ডাইহাইড্রক্সি— | |
| অ্যাসিটোন— | ২৭·৩০ |
| এফিড্রিন— | ৮১ ৬০ |

### অ্যামিনো অ্যাসিড

| | |
|---|---|
| মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট— | ৪ ২৮ |
| লাইসিন হাইড্রোক্লোরাইড— | ২৯·২৫ |
| ডি-এল মেথিয়োনিন— | ২২·৫০ |
| এল-ট্রিপ্টোফেন— | ৩৩৭·৫০ |

### অ্যান্টিবায়োটিক্স

| | |
|---|---|
| পেনিসিলিন— | ৭৬·১৩ |
| স্ট্রেপ্টোমাইসিন— | ৮৮·৬৫ |
| নিয়োমাইসিন— | ৩০৬·৪৫ |
| টাইরোথ্রিসিন— | ১,৭০২·৫০ |
| বেসিট্রাসিন— | ৪,৪২৫·০০ |
| গ্রামিসিডিন— | ১৪,৪৭৫·০০ |

### ভিটামিন

| | |
|---|---|
| বি১২— | ১,৫৩,০০০·০০ |
| বি১— | ১০৯·০৫ |

### কাঁচামাল

ফার্মেণ্টেসন পদ্ধতিতে কাঁচামাল হিসাবে সাধারণতঃ কোন কার্বন আধার, নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ এবং ভিটামিন ও সামান্য ধাতব লবণ তরলাকারে জীবাণুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কার্বন আধার হিসাবে গ্লুকোজ (৫-১০%), কালো চিটাগুড়, শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ, ওয়েষ্ট সালফাইট লিকার, হাইড্রোকার্বন, যেমন—কেরোসিন তেল প্রভৃতি এবং অন্যান্য শাকসব্জির অপ্রয়োজনীয় অংশ। নাইট্রোজেন যৌগ ও ভিটামিন হিসাবে সয়াবিন অয়েল, ডিষ্টিলারস্ সলিউবল্, কর্ণষ্টিপ লিকার প্রভৃতি। উপরিউক্ত পদার্থে ধাতব লবণও থাকে। তবুও কিছু পরিমাণ (০·০৫-০·১%) ধাতব লবণ বাইরে থেকে যোগ করা হয়।

### উপজাত দ্রব্য

ফারমেন্টেসন শেষ হবার পর তরল পদার্থ অপসারিত করলে পাত্রে যে পদার্থ পড়ে থাকে, তাকে সাধারণতঃ ফারমেন্টেসনের অবশিষ্টাংশ বলে। এতে জীবাণুর কোষ, জীবাণু থেকে নিঃসৃত পদার্থ (কিঞ্চিৎ পরিমাণে) এবং অন্যান্য অব্যবহৃত কাঁচামাল থাকে। একে শুষ্ক করে গবাদি পশু, মুরগী প্রভৃতির খাদ্য হিসাবে বাজারে বিক্রয় করা হয়। মদের কারখানায় ফার্মেন্টেসনের যে অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়, তা হলো ঈষ্টকোষ; এতে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন ও ভিটামিন-বি থাকে। সুতরাং একেও শুষ্ক করে প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্প হিসাবে ফার্মেন্টেসন পদ্ধতির প্রয়োগ খুবই সামান্য। অ্যান্টিবায়োটিক্স, যেমন—পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন ও মদ তৈরি করবার জন্যেই আমাদের দেশে প্রধানতঃ এর প্রচলন আছে। কিন্তু অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরির ব্যাপারে আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করি না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় এই পদ্ধতির সাহায্যেই অন্যান্য সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা হয়ে থাকে এবং দেখা গেছে যে, খরচ ও পরিশ্রম এতে খুবই কম। সুতরাং সরকারী আনুকূল্যে এর বহুল প্রচলন আমাদের দেশেও করা উচিত এবং তা করলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের জন্যে আমাদের আর অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না।

# অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

দ্বিজেশচন্দ্র রায়

নিউইয়র্কের হাডসন নদীর তীরে রিভারসাইড (Riverside) গীর্জার ভিতরে আছে ছয় শতটি মূর্তি—পুরাকাল, বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসিদ্ধ মনীষীদের। এর ভিতরে একটি প্যানেলে রাখা আছে চৌদ্দজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, যাঁদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছেন হিপোক্রেটাস (Hypocratus), যাঁর মৃত্যু হয়েছে খৃষ্টজন্মের প্রায় ৬৭০ বছর আগে। এই গীর্জায় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে একদিন এলেন এক প্রৌঢ় দম্পতি, যাঁদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁদের দু-জনেরই মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। ভদ্রলোকটির মাথায় বড় বড় কোঁকড়ানো চুল—এলোমেলো, অবিন্যস্ত, মুখে শিশুর সারল্য, বড় বড় চোখ দুটির দৃষ্টি স্বপ্নালু ও ঈষৎ বিষাদগ্রস্ত। ভদ্রমহিলার মুখে এক প্রগাঢ় শান্ত সৌন্দর্য, স্নেহ ও করুণার ছাপ। দু-জনে মূর্তিগুলি দেখছেন। এক সময়ে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর হাত ধরে একটি মূর্তির দিকে নির্দেশ করে বললেন, "এলবারতল্, ঐ দেখ তোমার মূর্তি"। দু-জনে এসে দাঁড়ালেন সেই মূর্তির কাছে। ভদ্রলোক একটু লজ্জিত ও সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁর মূর্তিটির দিকে তাকালেন, কি ভাবতে ভাবতে তাঁর ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠলো আরও স্বপ্নালু। তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর অবিন্যস্ত চুল আরও অবিন্যস্ত করতে লাগলেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। বাকী পাঁচশত নিরানব্বইটি মূর্তি যাঁদের, সেই সব মনীষী মৃত। শুধু এই মূর্তিটি যে জীবন্ত মনীষীর, তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন নিজের মূর্তির কাছে, দেখছেন নিজেকে পাথরের ভিতর,

নিজের অভূতপূর্ব কীর্তির চিহ্নস্বরূপ বিদ্বজ্জনেরা সর্বসম্মতিক্রমে রেখেছেন যে মূর্তি অন্য সব কীর্তিমানের মূর্তির পাশাপাশি। অন্য সব মূর্তিগুলি যেন বিস্ময়ে দেখছেন জীবন্তকে ও তাঁর পাথরের মূর্তিকে। পাথরের মূর্তিটি যেন একটু মুচ্‌কি হেসে বলছে—"আমি তোমার কীর্তি, তুমি আমার রক্তমাংসের শরীর। তোমার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা, যে কথা কয়েকবার তুমি বলেছ অন্যের প্রশ্নে—তুমি মরতে ভয় পাও কিনা এবং যার উত্তরে তুমি বলেছ এবং এখনও মনে মনে বলছ, 'না, আমি মরতে ভয় পাই না'। আমি প্রতিটি প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বলে মনে করি যে, এই অনন্ত প্রাণপ্রবাহের কোন এক জনের পৃথক অস্তিত্বের সুরু ও শেষ সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র উৎসুক নই।' সর্বকালের ও সর্বস্তরের মানুষ থেকে তুমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে চাও না—কেমন ঠিক কি না?" এই মূর্তির নীচে লেখা আছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—জন্ম ১৪ই মার্চ, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যুর তারিখ সেদিন লেখা ছিল না। আজ কেউ গেলে দেখবেন, মৃত্যু ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ সাল।

আইনষ্টাইন স্ত্রীকে নিয়ে সেবার এসেছিলেন বার্লিন থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকার পাসাডিনার ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার জন্যে। পাসাডিনায় যাবার পথে নিউইয়র্কে ছিলেন দিন কয়েক। পাসাডিনা থেকে ফেরবার পথে গেলেন আরিজোনাতে, সেখানে রেড ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে গেলেন। তারা আইনস্টাইনকে তাদের সম্প্রদায়ের সভ্য করে নিল ও তাঁকে তাদের জাতীয় পোষাক উপহার দিল। মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরে আইনস্টাইন দম্পতিকে সেখানকার বিরাট বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি দেখাবার সময় শ্রীমতী এল্‌সা আইনস্টাইন ঐ প্রকাণ্ড যন্ত্রটির প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে উত্তর পেলেন যে, যন্ত্রটির প্রয়োজন হয় মহাবিশ্বের আকৃতি সম্বন্ধে তথ্য জানবার জন্যে। তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর স্বামী তো কোনদিন এরূপ যন্ত্র ব্যবহার করেন না, তিনি এই সব তথ্য বের করেন এক টুকরা কাগজে, হয়তো পুরনো চিঠির খামের পিছনে অঙ্ক কষে। বস্তুত; আইনস্টাইন ছিলেন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের একজন অনন্যসাধারণ গবেষক। দু-শ' বছর পূর্বে নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মসূত্র বেঁধে দিয়েছিলেন, তার পরিবর্তে আইনস্টাইন তাঁর যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ প্রচারিত করেছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদের একটি বিশেষ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এই যে, কোনও নক্ষত্র থেকে আলোক-রশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে আসবার সময় তা বেঁকে যাবে। মানমন্দিরে তোলা আলোকচিত্রে এই সিদ্ধান্তটি পরীক্ষিত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময়। আবার ভর ও শক্তির সমতুল্যতাসূচক একটি অভিনব সূত্র আইনস্টাইন প্রবর্তিত করেছিলেন। এটি হলো—$E=mc^2$। এখানে $E$ হচ্ছে শক্তি, $m$ হচ্ছে ভর এবং $c$ হচ্ছে শূন্যে বা বায়ুমণ্ডলে আলোর গতিবেগ ( সেকেণ্ডে ৩০,০০০,০০০ সেন্টিমিটার )। ১৯৪৫ সালে ৬ই অগাষ্ট জাপানের হিরোসিমায় যে মর্মান্তিক পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার পশ্চাতে আছে অটো হান (Otto Hahn) ও স্ট্রাসমান (Strassemann)-এর পরমাণু-কেন্দ্রিনের বিভাজনের (Nuclear fission) আবিষ্কার। এই বিভাজনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া পায়, তার মূলে রয়েছে আইনস্টাইনের ভর ও শক্তির সমতুল্যতাসূচক সূত্রটি। অবশ্য আইনস্টাইন তখন জানতেন না যে, তাঁর সূত্রটির এরূপ পাশবিক প্রয়োগ হবে! আপেক্ষিকতাবাদের উদ্ভাবন এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে নব নব তাত্ত্বিক

গবেষণা আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীর দ্বারাই সম্ভব, যিনি বাস্তব জীবন থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তার জগতে আত্মনিরপেক্ষ (Objective) জগতের স্বরূপ সমীক্ষায় মনোনিবেশ করতে সক্ষম।

আইনস্টাইন আজীবন ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত ও ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, মোৎসার্টের (Mozart) সুর সৃজনা (Composition) ও বৈজ্ঞানিক তথ্য দুই-ই তাঁর কাছে সমান আদরের। তিনি ছয় বছর বয়স থেকে শিক্ষকের কাছে বেহালা বাজনা শিখতেন ও চোদ্দ বছর বয়সে পারিবারিক অনুষ্ঠানে বেহালা বাজাতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন শান্ত ও সংযত। তিনি সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গ ও দুরন্তপনা পরিহার করে চলতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতি-প্রিয়। যুদ্ধের বাজনার তালে তালে সৈন্যদের মার্চ করে যাওয়া তাঁর মনে গভীর ভীতি ও বিরাগের সৃষ্টি করতো। এই অনুভূতিই ভবিষ্যতে তাঁকে করে তুলেছিল একজন বড় শান্তিবাদী, যার জন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) প্রমুখ বিখ্যাত শান্তিবাদী মনীষীদের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির বিরুদ্ধে গান্ধীজীর শান্তিবাদী অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আগ্রহভরে লক্ষ্য রাখতেন। তিনি অনেকবার গান্ধীজীর বিষয় উল্লেখ করে নানাভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং গান্ধীজীর নিজের সত্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হওয়ায় তিনি বলেছিলেন, "আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করি যে, আমাদেরই সমসাময়িক এক মহামানব তাঁর নিজের সত্যের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিরাট শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমেরিকার প্রিন্সটনে (Princeton) পড়ার টেবিলের সামনে থাকতো গান্ধীজীর ফটো।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন কবিগুরু বার্লিনে যান, তখন এই দুই মহামানবের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির সত্য এবং পশ্চিম দেশীয় ও ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তা যেমন মনোরম, তেমনি শিক্ষামূলক। কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'The Golden Book of Tagore' নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাতে আইনস্টাইন কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

আইনস্টাইনের জটিল আপেক্ষিকতাবাদ প্রকাশিত হবার বেশ কয়েক বছর পরে এর যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্ব প্রকাশিত হবার পর তিনি একবার এক সভায় তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যা করবার সময় শ্রোতারা না বুঝে হাসাহাসি করছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, "আমার তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণিত হলে সুইজারল্যাণ্ড বাসীরা বলবে আমি সুইস, জার্মানরা বলবে আমি জার্মান। কিন্তু যদি এর সত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, সুইসরা বলবে আমি জার্মান আর জার্মানরা বলবে আমি ইহুদী।"

এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের হৃদয় ছিল সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি, বিশেষ করে বালক-বালিকাদের প্রতি দরদ ও ভালবাসায় ভরা। তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কেউ অন্যায় বা অবিচার করছে জানতে পারলে তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। এই জন্যেই হিটলার তাঁর প্রতি বিরূপ হয় এবং তাঁর জীবন বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে, যার জন্যে তাঁকে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় কপর্দকশূন্য ভাবে জার্মেনী থেকে চলে যেতে হয়েছিল। পারমাণবিক বোমা ব্যবহার না করবার জন্যে তিনি

আমেরিকার সরকারকে বহু অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তা উপেক্ষা করে হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং যার জন্যে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হয়। তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে, আবার যদি নতুন করে জীবন সুরু করা সম্ভব হয়, তবে তিনি বিজ্ঞান-চর্চা না করে ছুতোর মিস্ত্রী কিংবা ঐরূপ কোন কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুব বেশী নয়। তাঁর প্রসিদ্ধ তত্ত্বগুলি হচ্ছে, (১) ব্রাউনিয়ান গতিবিধির (Brownian movement) ব্যাখ্যা; (২) ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্টের (Photo-electric Effect) ব্যাখ্যা এবং আলোর ও বিভিন্ন শক্তির ফোটন (Photon) রূপ প্রতিষ্ঠিত করা—যার জন্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন; (৩) বিশেষ বা পরিমিত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Special or restricted Theory of Relativity) ও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General Theory of Relativity)। জীবনের শেষ ত্রিশ বছর তিনি চেষ্টা করেছিলেন মহাকর্ষ ক্ষেত্র (Gravitational field), বৈদ্যুতিক চৌম্বক ক্ষেত্র (Electro-magnetic field), পরমাণুর কেন্দ্রিনের ক্ষেত্র (Nuclear field)—এই সব প্রাকৃতিক ক্ষেত্রগুলির সমন্বয় সাধন করে এক একীভূত তত্ত্ব (Unified field theory) আবিষ্কার করা। কিন্তু তিনি সফলকাম হয়ে যেতে পারেন নি। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সুসামঞ্জস্যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে জন্যে তিনি গভীর আশা পোষণ করতেন যে, ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই এরূপ সমন্বয় তত্ত্বের আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

আইনস্টাইন বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি থেকে কিছু কিছু বাক্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

(১) "আমি প্রতিদিন শতবার স্মরণ করি যে, আমার মানসিক ও শারীরিক জীবন নির্ভর করছে জীবিত কি মৃত ব্যক্তিদের পরিশ্রমের উপর। আমি যে খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছি, সে খাদ্য ফলাচ্ছে অন্য লোক, আমি যে পোষাক পরছি, সে পোষাক তৈরি করছে অন্য লোক, আমি যে গৃহে বাস করছি, সে গৃহ তৈরি করছে অন্য লোক, শৈশব কাল থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা পেয়েছি অন্য লোকের কাছ থেকে। আমাকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, যতটা পরিমাণে দান আমি পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি, সেই পরিমাণে আমার দান করতে হবে।"

(২) "যে আদর্শ আমার চলার পথকে আলোকিত করেছে ও বহুবার আমাকে শান্ত ও প্রফুল্লচিত্তে জীবনের সম্মুখীন হতে সাহস জুগিয়েছে সে হচ্ছে সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর।"

(৩) "আমি জীবন পথে একক যাত্রী। আমি কোন দেশকে নিজের বলে মনে করি নি, আমার গৃহ আমার বন্ধুবান্ধব—এমন কি, আমার নিকটতম পরিবারবর্গকেও আমার সর্বান্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারি নি, এই সমস্ত বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার মনোভাবকে, একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন বোধকে কখনও হারাই নি আর এই অনুভূতি বেড়ে যাচ্ছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে।"

(৪) "আমি এবিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, কোন পরিমাণ ধন-দৌলতই মানবজাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাতে পারে না—এমন কি, এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কোন মহান কর্মীর হাতে এই ধন-দৌলত দিলেও না। মহৎ ও পবিত্র চরিত্রের উদাহরণই একমাত্র জিনিষ, যা সুন্দর আদর্শের ও মহৎ কর্মের সৃষ্টি করতে পারে। অর্থ শুধু স্বার্থপরতার সৃষ্টি করে ও এর অধিকারীকে অসৎ উপায় অবলম্বনের প্রেরণা জোগায়। কেউ কি কার্ণেগীর (Carnegie) টাকার থলে হাতে মোসেস্ (Moses), জীসাস (Jesus) কি গান্ধীকে কল্পনা করতে পারে"?

(৫) "আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। কোন নেতাকে, সে ধর্মীয়ই হোক কি রাজনৈতিকই হোক, দেবতার আসনে বসিয়ে পুজা করবার আমি বিরোধী। জনগণ, যারা পরিচালিত হবে তাদের যেন জোর করে নেতার পথে চলতে কি তার মতবাদ মানতে বাধ্য না করা হয়। একনায়কত্ব যা নিজের মতবাদকে প্রাধান্য দিযে বলপূর্বক কিছু চালাতে চায়, বেশীদিন সুষ্ঠুভাবে তা কাজ করতে পারে না, শীঘ্রই তার অবনতি ঘটে। কারণ বল প্রয়োগ শুধু নীচুস্তরের লোকদেরই আকর্ষণ করে আর প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রতিভাবান অত্যাচারী নেতার পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় নীচুস্তরের ক্ষুদ্রমনারা। রাজনৈতিক প্রণালী এমন হওয়া উচিত যে, তাতে যেন জনসাধারণের রোগ, অশিক্ষা, অভাব ও অভিযোগ যতটা দূর করা যায় তার বন্দোবস্ত থাকে।"

(৬) "সব চেয়ে সুন্দর জিনিষ, যা আমরা অনুভব করতে পারি, সেটি হচ্ছে রহস্যাবগুণ্ঠিত প্রকৃতি। এই অনুভূতিই হচ্ছে প্রকৃত কলা কি বিজ্ঞানের আদি মূলমন্ত্র। যে ব্যক্তি এটি বোঝে না, ভাবতে চেষ্টা করে না বা বিস্ময়ে অভিভূত হয় না, সে বেঁচে থেকেও মৃত, সে একটি নিবে যাওয়া প্রদীপের মত। এই রহস্যের অনুভূতিই জন্ম দিয়েছে তথাকথিত ধর্মের। যে জ্ঞানের দ্বারা বোঝা যায়, একটা কিছুর অস্তিত্ব, যার গভীরে আমরা প্রবেশ করতে পারি না, একটা মহত্তম প্রজ্ঞার এবং উজ্জ্বলতম সৌন্দর্যের নানাভাবে প্রকাশ—এই সবের অতি সামান্যই সহজভাবে আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে বোধগম্য হয়—এই জ্ঞান ও হৃদয়ের আবেগ থেকেই সৃষ্ট হয় প্রকৃত ধর্মীয় মনোভাব। এই অর্থেই এবং শুধুমাত্র এই অর্থেই আমি একজন পরম ধার্মিক লোক। আমি কল্পনা করতে পারি না মানুষের প্রতিমূর্তিসম্বলিত এক ঈশ্বরের, যিনি আমাদের প্রার্থনা শুনতে পারেন, যিনি আমাদের পুরস্কৃত করেন অথবা শাস্তি দেন। কোন লোকের মৃত্যুর পরেও তার অস্তিত্ব থাকবে, যাকে বলা হয় আত্মার অমরতা, এটিও আমার বোধের বাইরে।"

প্রজ্ঞা ও মানবিকতার সমন্বয়ে পরিপূর্ণ ও সমস্ত সংস্কারমুক্ত এই মহামানবকে নমস্কার জানিয়ে আমাদের কবির ভাষায় বলি

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।"

# অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন-পদ্ধতি

শ্রীনিশীথকুমার দত্ত

সাম্প্রতিক কালে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা যাবে যে, অ্যালুমিনিয়ামের কদর লোহার চেয়ে বেশী। অ্যালুমিনিয়ামকে বিংশ শতাব্দীর ধাতু বললেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই ধাতুর খুব একটা প্রচলন ছিল না। বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক খনন-কার্যের নিদর্শন থেকে আমরা দেখি যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই তামা, লোহা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল এবং এখনও রয়েছে। কিন্তু ঐ সকল পুরাতাত্ত্বিক খনন-কার্যে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর ব্যবহারের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নি। অ্যালুমিনিয়াম আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়ামের নিষ্কাশন খুব সহজ ব্যাপার নয়। যে উপায়ে তামার আকরিক থেকে তামা এবং লোহার আকরিক থেকে লোহা পাওয়া যায়, সেই উপায়ে কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় না।

অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক হলো বক্সাইট (Bauxite)। বক্সাইটের ফর্মুলা হলো— $Al_2O_3 2H_2O$. এই বক্সাইটকে কার্বনের সাহায্যে বিজারণে (Reduction) যে তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়, তা হলো অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্কের চেয়ে বেশী। স্বভাবতঃ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ($Al_2O_3$) কার্বনের দ্বারা বিজারিত হয়ে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম তৈরি হলেও তা বাষ্পীভূত হয়ে যাবে।

$$Al_2O_3 + C \rightleftharpoons 2Al + CO$$
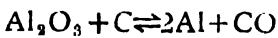
এই বাষ্পায়িত অ্যালুমিনিয়ামকে ঘনীভূত করতে গেলেও উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি বিপরীতমুখী হয়ে যায় এবং পুনরায় $Al_2O_3$-কেই ফিরে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতি উচ্চ তাপমাত্রাই অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের পথে বহুদিন যাবৎ বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে আমেরিকার এক ২২ বছর বয়স্ক বালক এই সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করলো এবং সফলও হলো। এই বালকের নাম চার্লস মার্টিন হল (Chales Martin Hall) এবং এঁরই নামানুসারে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন পদ্ধতির নাম হয়েছে 'হল-পদ্ধতি'। ফ্রান্সে ঐ একই সালে আর এক তরুণ Paul L. T. Heroult হলেরই অনুরূপ এক পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করেন। কিন্তু হলের পদ্ধতিটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় প্রথম কৃতিত্ব হলেরই প্রাপ্য হয়েছিল

হল-পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করতে হলে প্রথমে আকরিক বক্সাইট থেকে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনা অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পেতে হবে। বক্সাইটের মধ্যে ফেরিক অক্সাইড ($Fe_2O_3$), টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড ($TiO_2$) ও সিলিকন ডাইঅক্সাইড বা সিলিকা ($SiO_2$) প্রভৃতিও থাকে। বেয়ার (Bayer) পদ্ধতির দ্বারা আকরিক বক্সাইট থেকে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনাকে পৃথক করা হয়। আকরিক বক্সাইটকে প্রথমে গুঁড়া করা হয় এবং পরে বাতাসে পোড়ানো (Calcination) হয়। এরপর এই বক্সাইট চূর্ণকে চাপ ও তাপের সংযোগে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে আলোড়িত করা হয়, ফলে বক্সাইটস্থিত অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড সোডিয়াম অ্যালুমিনেটে ($NaAlO_2$) পরিণত হয় এবং দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এই দ্রবণকে ছেঁকে ফেলে পৃথক করা হয় এবং জলের দ্বারা

কিছুটা লঘু করলে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaAlO_2 + H_2O$$

$$2NaAlO_2 + 4H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 + 2NaOH$$
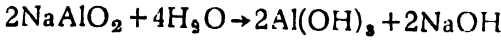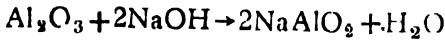
অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষেপকে ছেঁকে পৃথক করা হয় এবং উচ্চতাপে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইঅক্সাইড বা অ্যালুমিনায় পরিণত হয়।

$$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\text{উচ্চতাপে}} Al_2O_3 + 3H_2O$$
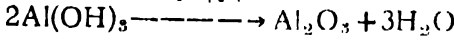
অ্যালুমিনা থেকে ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করবার সাফল্যের জন্যেই মার্টিন হলের নাম স্মরণীয়। গতানুগতিক ধারানুযায়ী কার্বনের দ্বারা বিজারিত না করে করলেন তড়িৎ-বিশ্লেষণ। অ্যালুমিনাকে গলিত ক্রায়োলাইট ($AlF_3$, $3NaF$) ও ফ্লুরস্পার ($CaF_2$) মিশ্রণে দ্রবীভূত করে ঐ দ্রবণকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করে হল্ ধাতব অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন। তড়িৎ-বিশ্লেষণ কক্ষটি হলো নির্গম-নলযুক্ত একটা ইস্পাতের চৌবাচ্চা। এই চৌবাচ্চার ভিতর গ্যাস-কার্বনের আস্তরণ দেওয়া থাকে। এই আস্তরণ ক্যাথোড হিসাবে কাজ করে। চৌবাচ্চায় গলিত মিশ্রণের মধ্যে তামার দণ্ড থেকে কতকগুলি কার্বন-দণ্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তামার দণ্ডটি ব্যাটারীর পরা-মেরুর (Positive Pole) সঙ্গে ও গ্যাস-কার্বন আস্তরণকে অপরা-মেরুর (Negative Pole) সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বড় বড় অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় এই রকম অনেকগুলি চৌবাচ্চা সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। এই সারিকে Pot Line বলে। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে গলিত অ্যালুমিনিয়াম চৌবাচ্চার তলদেশে জমা হয় এবং কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এই অ্যালুমিনিয়ামকে নির্গম-নল দিয়ে বের করে নেওয়া হয়। এই হলো অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের আদি পদ্ধতি। বেয়ার পদ্ধতি দ্বারা বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনা পেতে হলে বক্সাইটে ৫৫%—৬০% অ্যালুমিনিয়াম থাকতে হবে এবং ৭%-এর উপর সিলিকা থাকা চলবে না; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জাতের বক্সাইটেই কেবল বেয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু নিকৃষ্ট জাতের বক্সাইটে এবং কোন কোন কয়লা খনি অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়ামঘটিত যে শ্লেট জাতীয় পদার্থ (ইংরেজীতে যাকে বলে সেল) পাওয়া যায়, তাতে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগেরও কম এবং সিলিকার পরিমাণও শতকরা ৭ ভাগের বেশী। এই জাতীয় নিম্নস্তরের বক্সাইট এবং সেল থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের জন্যে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গবেষণা চালিয়েছেন এবং কিছু কিছু নতুন উপায়ও উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো SM-NACCO পদ্ধতি। এটি যুগ্মভাবে উদ্ভাবন করেছেন আমেরিকার Strategic Materials Corporation এবং North American Coal Corporation। এই পদ্ধতিতে বক্সাইটস্থিত $Al_2O_3$-কে সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করা হয় এবং পরে এই দ্রবণ থেকে সহজেই $Al_2(SO_4)_3, 18H_2O$ (Aluminium Sulphate Hydrate) স্ফটিকাকারে অধঃক্ষিপ্ত হয়। তাপমাত্রা এবং অ্যাসিডের ঘনত্ব এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে বক্সাইটস্থিত অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলির সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের কোন রকম বিক্রিয়া না ঘটে। অ্যালুমিনিয়াম সালফেট হাইড্রেট স্ফটিকগুলিকে ছেঁকে ফেলে পৃথক করা হয় এবং উত্তপ্ত করা হয়। উত্তপ্ত করবার ফলে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট অ্যালুমিনা ($Al_2O_3$) এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইডে ($SO_3$) পরিণত হয়।

$$Al_2(SO_4)_3 \xrightarrow{\text{উত্তাপ}} Al_2O_3 + 3SO_3$$
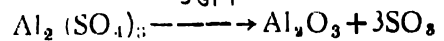
নির্গত $SO_3$ গ্যাসকে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির জন্যে ব্যবহার করা হয়।

অ্যালকান'স গ্রস পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে বক্সাইটকে উচ্চতাপে কার্বনের দ্বারা আংশিকভাবে বিজারিত করা হয়। এই বিজারণের ফলে বক্সাইটস্থিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ধাতব অ্যালুমিনিয়ামে, ফেরিক অক্সাইড লৌহে এবং টাইটানিয়াম অক্সাইড টাইটানিয়ামে পরিণত হয়। এই ধাতুগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে Al-Fe-Ti সঙ্কর ধাতু তৈরি করে। এই সঙ্কর ধাতুটি ১০০০°—১২০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১ বায়ুচাপের $AlCl_3$ বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে AlCl অ্যালুমিনিয়াম মনোহ্যালাইড) তৈরি করে। (Fe ও Ti $AlCl_3$-এর সঙ্গে কোন বিক্রিয়া করে না)। এই বিক্রিয়াটি একটি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে সম্পন্ন করানো হয়। অ্যালুমিনিয়াম মনোহ্যালাইড বাষ্পকে একটি কনডেন্সারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করালে Fe, Ti প্রভৃতি অবাঞ্ছিত পদার্থগুলি কনডেন্সারে আটকে পড়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ AlCl বাষ্প ঠিকই বেরিয়ে আসে। এই অ্যালুমিনিয়াম মনোহ্যালাইড বাষ্প ঘূর্ণায়মান গলিত অ্যালুমিনিয়ামের সংস্পর্শে এসে পুনরায় ধাতব অ্যালুমিনিয়ামে এবং অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড বাষ্পে পরিণত হয়।

$$3AlCl \longrightarrow AlCl_3 + Al$$
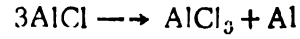
( মনোহ্যালাইড ) ( ট্রাইহ্যালাইড )+ ( অ্যালুমিনিয়াম )

বাষ্পায়িত $AlCl_3$-কে পুনর্ব্যবহারের জন্যে সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা যায়। বৃহদাকারে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের জন্যে অবশ্য এই পদ্ধতিকে এখনও অবলম্বন করা হয় নি। জাপানের দু-তিনটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করছে।

নাইট্রাইড পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনাকে কার্বন ও নাইট্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইডে পরিণত করা হয়। এই অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইডকে উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করলে গ্যাসীয় অ্যালুমিনিয়াম ও গ্যাসীয় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। গ্যাসীয় অ্যালুমিনিয়ামকে ঘনীভূত করলেই ধাতব অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। বিক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ—

$$Al_2O_3 + 3C + N_2 \rightarrow 2AlN + 3CO$$

$$AlN \rightarrow 2Al + N_2$$

বৃহদাকার নিষ্কাশনের জন্যে অবশ্য এই পদ্ধতিকে

গ্রস পদ্ধতি
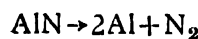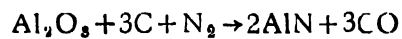
এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে না। নাইট্রাইড পদ্ধতির আরও উন্নতিসাধন করলে এই পদ্ধতিকে বৃহদাকার নিষ্কাশনের জন্যে ব্যবহার করা যায়।

উৎপাদন—এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান, চীন ও ভারতই অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপানই প্রথম ১৯৩৩ সালে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করে এবং আজও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপানই সবচেয়ে বেশী অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করে, যদিও জাপানের বক্সাইটের পরিমাণ খুবই কম। জাপান ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বর্মা প্রভৃতি দেশ থেকে বক্সাইট আমদানী করে থাকে। চীন ১৯৩৯ সালে প্রথম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করে। ১৯৪২ সালে ভারত প্রথম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করে এবং বর্তমানে এই শিল্পে বিশেষ উন্নতি সাধন করেছে। এশিয়ার মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথম হলো জাপান, দ্বিতীয় চীন ও তৃতীয় ভারত।

ভারতে ছোট-বড় অনেকগুলিই অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা রয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো Aluminium Corporation of India Ltd. এবং Indian Aluminium Corporation Ltd. এছাড়াও রয়েছে Madras Aluminium Company এবং মহীশূরে Bharat Aluminium Company.

ব্যবহার—অ্যালুমিনিয়ামের বহুমুখী ব্যবহারের মধ্যে যেটা আমাদের নিত্যই চোখে পড়ে, তা হলো বাসনপত্রের ব্যবহার। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আজকাল সকলেই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহার করে।

বৈদ্যুতিক শিল্পে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। কিছুদিন আগেও তামাই ছিল বিদ্যুৎ পরিবহনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ইদানীং বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারই বেশী। অ্যালুমিনিয়ামের বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতা খুব ভাল, দ্বিতীয়তঃ অ্যালুমিনিয়াম দামেও সস্তা। তামার তারের বেশী মূল্যের জন্যে প্রায়ই দেখা যায় যে, দুর্বৃত্তেরা জনবিরল অঞ্চলে বা রেল লাইনের ধারে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে ব্যবহৃত তামার তার কেটে নেয়, ফলে বিদ্যুৎ পরিবহনে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অ্যালুমিনিয়ামের তারের দাম বেশ সস্তা হওয়ায় দুর্বৃত্তেরা কিন্তু এই ধরণের চৌর্যকার্যে প্রবৃত্ত হয় না। পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে অ্যালুমিনিয়ামের তার ব্যবহারই সমীচীন।

বাতাস কিংবা বৃষ্টির জলে অ্যালুমিনিয়ামের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় না বলে অ্যালুমিনিয়ামের চাদর বা বড় বড় পাত্‌কে বাসের বডি তৈরি করবার জন্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পাশ্চাত্যে রেলগাড়ী এবং মোটর গাড়ীর আচ্ছাদন তৈরির জন্যেও অ্যালুমিনিয়ামের পাত্‌ ব্যবহার করা হয়। অ্যালুমিনিয়ামের পাত্‌ দিয়ে ওষুধ-পত্রের কৌটা এবং মোড়কও তৈরি করা হয়।

ইমারত তৈরির কাজেও লোহার পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতুর ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতু ওজনে হাল্‌কা এবং মরচে ধরে না। ওজনে হাল্‌কা হবার ফলে অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্কর ধাতুর দ্বারা বিভিন্ন ধরণের আকাশযান তৈরি করা হয়।

# কৃষি বিভাগের বীজ-ক্ষেত্রসমূহের ব্যর্থতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

পশ্চিম বঙ্গে সরকারী বীজ-ক্ষেত্রসমূহের (Seed farms) সংখ্যা হইতেছে—জেলা বীজ-ক্ষেত্র ১৬টি এবং ব্লক বীজ-ক্ষেত্র ১৯৪টি। মাঝে মাঝে কৃষি বিভাগ জোর গলায় ইহাদের সাফল্য প্রচার করিয়া থাকেন। ১৯৬৮ সালের ১৩শে অক্টোবরের Statesman-এ প্রকাশিত 'State Seed farms have generally failed' শীর্ষক একটি বিবরণী কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এই সকল বীজ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে মূল্য নির্ধারণ আধিকারিক (Directorate of evaluation) একটি সমীক্ষা চালাইয়াছিলেন এবং এই সমীক্ষাই Statesman-এ প্রকাশিত উক্ত বিবরণীর ভিত্তি। সুতরাং বিবরণীতে প্রকাশিত তথ্যগুলি সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না

এই সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ বীজ-ক্ষেত্রগুলির প্রথম ও প্রধান গলদ হইতেছে, সেগুলির স্থান নির্বাচন। অনেক ক্ষেত্রেই গড়-পড়তা জমি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জমি নির্বাচন করা হইয়াছে। পূর্বে কখনও কর্ষণ করা হয় নাই, এইরূপ জমিতে অর্থাৎ পোড়ো জমিতে এই সকল বীজ-ক্ষেত্র স্থাপন করা খুবই ব্যয়সঙ্কুল এবং ইহা করা ভুল হইয়াছে। কারণ এইরূপ জমির যে সকল প্রতিবন্ধক আছে, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই এখনও অতিক্রম করা যায় নাই অর্থের অভাবে। এই বিষয়ে তেমন জোরালো চেষ্টা করাও হয় নাই—এমন কি, জল সেচনের সুবিধা অনেক বীজ-ক্ষেত্রে এখনও তেমন সন্তোসজনক নহে। অনেক বীজ-ক্ষেত্রের জল সেচনের পরিকল্পনা বহুদিন হইতেই গভর্নমেন্টের নিকট পড়িয়া আছে, মঞ্জুর করা হয় নাই। ইহার ফলে এই সকল বীজ-ক্ষেত্র তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সাধন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে উন্নত কৃষি-প্রণালী প্রবর্তন করিতে অক্ষম হইয়াছে এবং এই সকল বীজ-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উন্নত কৃষি-পদ্ধতির প্রতি স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই আবার বীজ-ক্ষেত্রগুলি রেল লাইন হইতে বহু দূরে অবস্থিত। অধিকাংশ জমি জলাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হইতেছে না। মোট ২৫৬৮ একর জমির মধ্যে কেবল মাত্র ২০০ জমিতে বৎসরে একাধিক শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছে। লজ্জার বিষয় নয় কি? অথচ লোকে শুনিতেছে, কৃষি বিভাগ একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদন করিবার জন্য জোরালো প্রচারকার্য করিতেছেন। তাঁহাদের নিজের বীজ-ক্ষেত্রের অবস্থা যদি এই হয়, তবে লোকে প্রচার কাজে কান দিবে কেন?

২৪ পরগণা জেলার জেলা বীজ-ক্ষেত্রটি (মন্মথনগর বীজ-ক্ষেত্র) ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহার স্থান নির্বাচন অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। জেলার সদর হইতে এই বীজ-ক্ষেত্রে যাইতে হইলে অনেক নদী-নালা পার হইয়া যাইতে হয় এবং ৫ ঘণ্টা সময় লাগে। চারিদিকে দক্ষিণ বাংলার বিক্ষুব্ধ লবণাক্ত জলের দ্বারা আবদ্ধ চর জমিতে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। বীজ-ক্ষেত্রে জল নিষ্কাশন একটি গুরুতর সমস্যা। ইহা ছাড়া জল সেচনের এবং পানীয় জল সরবরাহের যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

আবার কতকগুলি বীজ ক্ষেত্র, যেমন—কল্যাণী বীজ-ক্ষেত্রের সমস্ত আয়তন এক সঙ্গে সংযুক্ত

নহে, ২।৩ অংশে বিভক্ত। কল্যাণী বীজ-ক্ষেত্রের সমগ্র আয়তন ২৫৮ একর, কিন্তু ৩টি ভাগে বিভক্ত ৮৭, ৪২ এবং ১২৯ একর, একটি ভাগ আর একটি ভাগ হইতে দূরে অবস্থিত। সমীক্ষকদল এইরূপ ছড়ানো (Scattered) বীজ-ক্ষেত্র স্থাপনের কোন সন্তোষজনক কারণ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে, কোন বীজ-ক্ষেত্রের আয়তন এক সঙ্গে সংযুক্ত (Compact) না হইলে ক্ষেত্রের কাজ-কর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না। সমীক্ষকদল আরও মনে করেন যে, বীজ-ক্ষেত্র স্থাপনের নীতি হয়তো এই ছিল যে, অনাবাদী জমিতে বীজ-ক্ষেত্র স্থাপন করিলে অনাবাদী জমি আবাদী হইবে। এই নীতি সম্পূর্ণ ভুল, কারণ অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা বীজ-ক্ষেত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল না

প্রধানতঃ দেখা গিয়াছে যে, জল সেচনের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবই বীজ-ক্ষেত্রগুলির প্রধান অন্তরায়। যে সকল বীজ-ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালানো হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র শতকরা ২৫.১৬ ভাগ জমিতে জল সেচন করা হইয়াছে। ফসলের দিক হইতে শতকরা ৪৮.৬২ ভাগ উচ্চ ফলনশীল ধানের জমিতে জল সেচন করা হইয়াছিল। সমস্ত উন্নত ফলনশীল শস্যের জমিতে জল সেচনের হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, কর্ষিত জমির শতকরা ১৯.১৩ ভাগ জল সেচনের সুবিধা পায়। জল সেচনের অসুবিধার জন্যই উচ্চ ফলনশীল খরিপ ধানের ফলনের তারতম্য খুবই হইয়াছে—একর প্রতি ২,১০০ কিলোগ্র্যাম হইতে ৩০ কিলোগ্র্যাম ফলন দেখা যায়। জল সেচনের সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে বীজ-ক্ষেত্রগুলি স্থানীয় কৃষিতে কোন অপরিবর্তনশীল ছাঁচ (Pattern) প্রবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, উচ্চ ফলনশীল শস্যই অধিকতর ফলন দেয় এবং ইহাদের বর্ধিত হইবার সময়ও অপেক্ষাকৃত কম এবং উচ্চ ফলনশীল শস্যসমূহের আশানুরূপ ফলন পাইতে হইলে জলের বিশেষ দরকার।

শ্রমিক সমস্যাও অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। শতকরা ১০টি বীজ-ক্ষেত্র খরিপ ঋতুতে এবং শতকরা ২০টি বীজ-ক্ষেত্র রবি ঋতুতে শ্রমিকের অভাবের কথা বলিয়াছেন। সমীক্ষকদল মনে করেন যে, শ্রমিকদিগের পারিশ্রমিকের হার এবং আনুষঙ্গিক বিষয় পুনর্বিচার করিয়া দেখা উচিত, এই সঙ্গে তাহাদের বাসস্থানের বিষয়ও পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। সমীক্ষকদলকে বলা হইয়াছে যে, ফুলিয়া জেলা বীজ-ক্ষেত্রের শ্রমিকগণের বাসস্থানের উন্নতি করিবার পর সেখানে শ্রমিক সমস্যা অনেকটা লাঘব হইয়াছে।

সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, স্থানীয় কৃষির উপর বীজ-ক্ষেত্রে অবলম্বিত উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রভাব বিস্তার করিতে গেলে এবং বীজ-ক্ষেত্রকে আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্ররূপে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঁড় করাইতে হইলে স্থানীয় কৃষকগণকে বীজ-ক্ষেত্রের কার্যাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত করিতে হইবে। রিপোর্টে ইহাই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বীজ-ক্ষেত্রের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকিবে এবং উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীগণ ব্যতীত কয়েকজন অভিজ্ঞ কৃষক থাকিবেন। এইরূপ কমিটি কয়েকটি রাজ্যে আছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে নাই।

সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অধিকাংশ বীজ-ক্ষেত্রেই কর্মচারী-বৃন্দ উপযুক্তভাবে শিক্ষিত নহে। সহকারী ফার্ম ম্যানেজারগণের মধ্যে শতকরা ১ জন মাত্র কৃষি-স্নাতক এবং সহকারী ফার্ম ম্যানেজারগণই ব্লক বীজ-ক্ষেত্রগুলির তত্ত্বাবধান করেন। শতকরা ৬০ জন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং শতকরা ৩৯ জন উক্ত পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ নহেন।

সমীক্ষকদল দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বীজ-ক্ষেত্রগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার পূর্ণ চিত্র দেওয়া সম্ভব হইল না, কারণ ইহা দিতে হইলে যে সকল তথ্যের দরকার, তাহা পাওয়া যায় নাই। একর প্রতি চাষ-আবাদের প্রত্যেক বিষয়ের খরচের, যেমন—লাঙ্গল দেওয়া, শস্য বোনা ও কাটা, সার, কীটনাশক ঔষুধের, জল সেচানর, শ্রমিকদের বেতন ইত্যাদি খরচের কোন ছাঁচ (Norms) নাই। মোটামুট দেখা গিয়াছে যে, ১৯৬৭-'৬৮ সালে জেলা বীজ-ক্ষেত্রগুলিতে মোট খরচের শতকরা ২৮ ভাগ এবং ব্লক বীজ-ক্ষেত্রগুলিতে শতকরা ৩৯ ভাগ কেবলমাত্র কর্মচারীগণের বেতন ইত্যাদি বাবদ খরচ হইয়াছিল, অর্থাৎ Establishment-এর জন্য খরচ হইয়াছিল। ইহা খুবই বেশী।

সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বীজ-ক্ষেত্রের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করা দরকার। উহাতে প্রত্যেক বীজ-ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক চিত্র পরিষ্কারভাবে দেখাইতে হইবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রের কাজ পরিচালনা করিতে কি কি অসুবিধা হইতেছে ও ঐ সকল অসুবিধা অতিক্রম করিতে কি কি প্রয়াস চলিতেছে, তাহারও বর্ণনা করিতে হইবে।

কৃষি বিভাগের, বিশেষতঃ বীজ-ক্ষেত্রগুলির কার্যকলাপের সহিত যাহারা কিছু মাত্র পরিচিত আছেন, তাঁহারা সকলেই উপরিউক্ত সমীক্ষায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করিবেন। কিন্তু কোন উপায় নাই। কৃষি বিভাগের স্তূপীকৃত আবর্জনা কেহই পরিষ্কার করিতে পারিবেন না। কিন্তু কথা হইতেছে যে, যেখানে খাদ্য-সঙ্কট এত বেশী প্রকট এবং যে প্রকটতা কৃষি বিভাগের সুষ্ঠু কর্মপদ্ধতির দ্বারা প্রধানতঃ হ্রাস পাইতে পারে, সেখানে কৃষি বিভাগের এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতা কেহ প্রতিরোধ করিতে পারেন না? আর কতকাল সাধারণের অর্থের এইরূপ অপচয় হইবে?

৩১শে অক্টোবরের Statesman পত্রিকায় আরও প্রকাশ, তৃতীয় প্ল্যানের সময় পশ্চিমবঙ্গে যে ১০২৩টি বীজাগার নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বীজাগারের পক্ষে অব্যবহার্য। প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, নিম্ন জমিতে নির্মাণ, ত্রুটিপূর্ণ নক্সা, নির্মাণে গলদ ইহার প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। কৃষি বিভাগের কর্ণধারগণ কি বলিবেন?

# সন্ধানী দণ্ড বা Divining rod

শ্রীবিষ্ণু দাস

পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মেনী, ফ্রান্স এবং বোহেমিয়ায় সন্ধানী দণ্ড বা Divining rod-এর সাহায্যে মাটির তলার ধাতব সঞ্চয় খুঁজে বের করা হতো।

জিনিষটা ইংরেজী Y অক্ষরের মত দুই বাহু-বিশিষ্ট বর্ধিষ্ণু গাছের একটা ডাল। অভিজ্ঞ লোকের হাতে সেটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো। ডালটাকে মাটির উপর দিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কোন জলাভূমিতে এসে বার কয়েক ডোবালেই সেটা খুব জোরে জোরে মোচড় দিতে উঠতো এবং দেখা যেত সেইখানেই মাটির তলায় কোন না কোন ধাতব সঞ্চয় আছে। সবারই অবশ্য এই ক্ষমতা ছিল না। ফলে বহু বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল সেকালে এবং তাদের এই বিশেষ ক্ষমতার জন্যে বহুবার অনেক সন্ধানীকে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতেও হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যারণ দ্য বিউসোলেইল-এর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এবং তাঁকে আর তাঁর স্ত্রীকে ব্যাস্তিল দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। তাঁরা নাকি ডাকিনীবিদ্যা জানেন, এই ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। কারণ তাঁরা ফ্রান্সে Divining rod বা সন্ধানী দণ্ডের সাহায্যে ১৫০টিরও বেশী সোনা, রূপা, তামা, সীসা, দস্তা, অ্যান্টিমনি, লোহা, গন্ধক এবং অ্যানথ্রাসাইট কয়লার খনি খুঁজে বের করেছিলেন।

এঁদের দুর্ভাগ্য দেখেও কিন্তু দমলেন না একজন। তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী রুডলফ্ গ্লাবার। কয়েক বছর ধরে তিনি এই বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। ১৬৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর খনিবিদ্যা সম্বন্ধীয় বইতে এই বিষয় তিনি বর্ণনা করে গেছেন।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে অ্যাবে ভ্যালিমেন্ট 'Occult Physics or Treatise on the Divining rod' নামে একটি বই লেখেন। প্রায় ঐ সময়েই ফাদার লেব্রান 'Critique of the Superstitious secret relations which have confused the people and embarrassed the scientists' নামে আর একটি বই প্রকাশ করেন।

অ্যাবে ভেলিমেন্ট যুক্তি দিয়ে দেখান যে, চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক শক্তিই গাছের ডালটার মধ্যে মোচড়ানোর ভাব সৃষ্টি করে। কিন্তু ফাদার লেব্রানের মতে, এসবই শয়তানের কাজ।

তারপর থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে এই ঘটনার। কেউ বলেছেন জৈব-চৌম্বক শক্তি, কেউ বলেছেন জৈব-রাসায়নিক শক্তির ফলে উৎপন্ন বিদ্যুৎই এর জন্যে দায়ী। একটার পর একটা ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হয়েই চলেছে।

## বিংশ শতাব্দীর ব্যাখ্যা

সন্ধানী দণ্ডের বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসেও আলোচনা হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা এর রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করে চলেছেন। ১৯১৬ সালে নিকোলাই কাসকারভ্ নামে টমস্ক টেক্‌নোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের একজন অধ্যাপক এবং ইঞ্জিনীয়ার এই বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখান যে, জলমগ্ন সজীব উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের বৈদ্যুতিক পরিবর্তনে যে কোন যন্ত্রের

চেয়ে ভাল সাড়া দিতে পারে। এই বৈদ্যুতিক পরিবর্তন কোন ধাতব সঞ্চয়ের উপরিস্থিত জোলো জায়গাতেই বেশী দেখা যায়। কাসকারভ্ কিন্তু এর কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি।

১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে ইঞ্জিনীয়ার বোরিস টারেইয়েভ্ সিমোভ ভূগর্ভে বসানো বিদ্যুৎবাহী তারের উপরের জলাভূমিতে সজীব গাছের ডালের ব্যবহার পরীক্ষা করে দেখান। তিনি দেখতে পান যে, সদ্য কেটে আনা যে কোন গাছের ডালেরই এই অদ্ভুত গুণ আছে, কিন্তু শতকরা মাত্র তিনজন লোক এই গুণকে কাজে লাগাতে পারে।

সংবেদনশীল অভিজ্ঞ লোকের হাতে গাছের ডালটা কেবল সাড়াই জাগায় না, কখনও কখনও সত্য সত্যই ঘুরতে থাকে এবং এই ঘটনা ঘটে তখনই, যখন সে কোন ভূগর্ভস্থিত বিদ্যুৎবাহী তারের উপর দিয়ে বা মাটির অল্প নীচে জমা জলের উপর দিয়ে পার হয়। এই সমস্ত লক্ষ্য করে দু-জন বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন—সন্ধানী দণ্ড হচ্ছে সহজতম জৈব-বৈদ্যুতিক যন্ত্র।

সদ্য কাটা গাছের ডাল অতিমাত্রায় স্পর্শ-কাতর এবং গ্যালভেনোমিটারের কাঁটাকে নড়াতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় গাছের ডালটার মোচড় খাবার জন্যে। ডালের এই আশ্চর্য গুণ বহনকারীর গতি বা ভূগর্ভস্থ তারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের শক্তির দ্বারা কোন ভাবেই প্রভাবিত হয় না—এমন কি, বহনকারী ব্যক্তি এবং ভূগর্ভস্থ তারের মাঝে যদি লোহার বা রবারের পাত্ দিয়ে আবরণ সৃষ্টি করে রাখা হয়, তাতেও কোন পরিবর্তন হয় না। তারের উপরকার সীসার আবরণের জন্যেও কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। কেবল মাটির নীচে জল যদি রবারের হোস পাইপ দিয়ে বের করে আনা হয়, তাহলে গাছের ডালটাতে আর কোন রকম সাড়া জাগে না।

ঐ দু-জন বিজ্ঞানী বললেন, সন্ধানী দণ্ডকে যন্ত্র বিজ্ঞানের কাজে লাগানো যেতে পারে এবং এর দ্বারা মাটির নীচের বিদ্যুৎবাহী তারের বা মাটির নীচের জলবাহী নলের গোলযোগ খুঁজে বের করা যেতে পারে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোন বর্ধিষ্ণু গাছ থেকে সদ্য কাটা হওয়া চাই ডালটা। দু-তিন দিনের মধ্যে ঐ ডালের কার্যকারিতা অনেক কমে যায়। তাছাড়া ডালটা যদি না কেটে ভেঙ্গে নওয়া হয়, তাহলে ডালের এই আশ্চর্য গুণ আর থাকে না।

## আধুনিক সংস্করণ

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে লেনিনগ্র্যাডের ভূ বিজ্ঞানী নিকোলাই সোকেভানভ্ মস্কোর জীববিদ্যা বিভাগের বড় একদল ভূ-বিজ্ঞানী, ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী এবং শারীরতত্ত্ববিদের পরীক্ষার কথা জানান।

প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ হয় উত্তর কিরঘিজ এবং বৈকাল অঞ্চলে। তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, ধাতব আকরিকের (Mineral ore) তাজা গাছের ডালের উপর প্রভাব বেশী। নদীর জলে ডোবালে ডালটা দু-বার ঘোরে, স্রোতের জলে একবার, কিন্তু আরসা অঞ্চলের এক সীসা এবং দস্তার সঞ্চয়ের দশ গজ দূরে রাখলে প্রায় ১৮ বার ঘুরতে পারে। এটা অবশ্য একটা ব্যতিক্রম, কারণ ঐ সঞ্চয় ছিল অত্যন্ত ধাতু-সমৃদ্ধ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, কেবলমাত্র চার থেকে ছয় ইঞ্চি পুরু স্তরই গাছের ডালটাতে সাড়া জাগাতে পারে।

ডালটা উপরে-নীচে নড়াচড়া না করে ঘোরবার চেষ্টা করে কেন? এই ঘটনার কারণ নির্ণয় করবার জন্যে সোকোভানভ্ উল্টো U

অক্ষরের মত আকারের একটা ধাতুর দণ্ড তৈরি করেন এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এটাও গাছের ডালটার মতই কাজ করতে থাকে। আধুনিক সন্ধানী দণ্ড তৈরি করা হয় তিন বা চার মিলিমিটার মোটা তার দিয়ে এবং এর আকারটা হয় Antenna-এর মত। সোকোভানভ্ বলেছেন—অনুসন্ধানকারীর গতিবেগ যখন প্রতি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের মত হয়, তখন দণ্ডের ঘূর্ণন সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। এথেকেই বোঝা যায়, এক্ষেত্রে পার্থিব চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন প্রভাবই কাজ করে না, কারণ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র যদি এই পরীক্ষায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারতো, তাহলে অনুসন্ধানকারীর গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি একক সময়ে বেশী সংখ্যক চৌম্বক বলরেখা ছেদ করতো।

খোলা গাড়ীতে বা মিনিবাসে ভ্রমণরত অবস্থায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ফলাফলের কোন পরিবর্তনই হয় না। সুতরাং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাটাও বাতিল হয়ে গেল।

পশম বা রবারের দস্তানা কোন পৃথক ফলাফল নির্দেশ করে না, কিন্তু চামড়ার দস্তানা করে। সন্ধানী দণ্ডের গুণাগুণকে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে দেবার ক্ষমতা আর একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করলো।

দণ্ডের স্পর্শকাতরতা বাড়াবার জন্যে যদি ওটার আকার বড় করা হয় এবং অনুসন্ধান-কারীর কব্জির সঙ্গে যদি পাঁচ ফুট লম্বা তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় যে, দণ্ডের স্পর্শকাতরতা দশভাগের এক ভাগ মাত্র হয়ে যায়।

অনুসন্ধানকারীর মাথার পিছন দিকে যদি একটা শক্তিশালী অশ্বক্ষুরাকৃতির চুম্বক রাখা হয় এবং চুম্বকটা আস্তে আস্তে মাথার কাছে আনতে থাকলে দণ্ডের ঘূর্ণন-সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে দেখা যায়। চুম্বকটা যখন মাত্র আট ইঞ্চি দূরে, হঠাৎ তখন ঘূর্ণনের অভিমুখ পাল্টে যায়। এই ঘটনার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি।

তিনজন অনুসন্ধানকারীকে কৃত্রিম নিদ্রার অবস্থায় লেনিনগ্র্যাডের এক পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করেন অ্যালেক্সি জাকহারভ্। অনু-সন্ধানকারীরা তাঁর পরীক্ষায় কোন সাড়া দেয় নি অর্থাৎ সন্ধানী দণ্ডের ঘূর্ণন-সংখ্যার কোন বৃদ্ধি হতে দেখা যায় নি। হয়তো ঘূর্ণন-সংখ্যা কমে গিয়েছিল, অনুসন্ধানকারীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে আসায়।

অনুসন্ধানকারীর অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর হাত, সন্ধানী দণ্ড ধরা কোন সাধারণ লোকের হাত স্পর্শ করলে দণ্ডটা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা গেছে—এমন কি, কয়েকজন অনুসন্ধানকারী এক সঙ্গে হাতে হাত ধরে থাকাতেও কোন ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় নি। ঘূর্ণনের সংখ্যা মাত্র একজন অনুসন্ধানকারীর হাতে যেমন হওয়া দরকার, ঠিক তেমনিই থেকে গেছে।

সোকেভানভ্ মন্তব্য করেছেন, আমরা এখনও জানি না ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্ধানী দণ্ডকে কি কাজে লাগানো যেতে পারে, তবে এই ঘটনা অবশ্যই লক্ষ্য করা গেছে যে, ভূ-বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধানী দণ্ডের উত্তেজনা অবশ্যই বৃদ্ধি পায়।

সন্ধানী দণ্ডের রহস্য উদ্ধার করতে হলে বহু প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানতে হবে তবে একটা জিনিষ ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সন্ধানী দণ্ড সজীব পদার্থ এবং পরিবাহী সীমারেখার (Conducting contour) সমন্বয়ে গঠিত। এর পিছনে অতিন্দ্রিয় ঘটনা কিছুই নেই, এটা একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা মাত্র।

সম্ভবতঃ একটি অতি প্রাচীন অনুসন্ধান পদ্ধতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে যাচ্ছি, যেটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার দ্বারা এমন কতকগুলি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, যা ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানের অতি আধুনিক পদ্ধতিতেও সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না।*

[ সন্ধানী দণ্ডকে মানুষ চেনবার কাজেও লাগানো যায়। মানুষকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে পড়ে স্ত্রীলোকেরা। অনুসন্ধানকারী সন্ধানী দণ্ড হাতে করে কোন স্ত্রীলোকের দিকে এগোতে থাকলে দেখা যায় যে, তাঁর হাতের দণ্ড সেই স্ত্রীলোকের দিকে ঘুরে যায়। বাকী তিনটি ভাগের মধ্যে পড়ে পুরুষেরা। কেউ কেউ দণ্ডটাকে সম্পূর্ণ বিকর্ষণ করে, অন্যেরা তাদের কাঁধের কাছে ধরলে দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং শেষভাগে যারা পড়ে, তাদের বেলায় ঠিক উল্টো। তাঁদের কাঁধে আকর্ষণ এবং পিঠ ও পেটের কাছে বিকর্ষণ হতে দেখা যায়। ]

*ভিক্টর পোপভকিনের কাছে ঋণী রইলাম।

# শ্যাওলা

অঞ্জলী রায়

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের জীবনযাপন প্রণালী এখন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য-সমস্যার এক চরম সঙ্কটে আমরা পীড়িত। জনসংখ্যার হার যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সঙ্গে তাকে রেখে প্রচলিত খাদ্যসম্ভারের উৎপাদন বৃদ্ধি করা খুব সহজসাধ্য হয়ে উঠছে না। ফলে বিশ্বের কয়েকটি ঘনবসতি সমন্বিত অঞ্চলে খাদ্যাভাব বর্তমানে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। চিরাচরিত খাদ্যরূপের পরিবর্তন করে এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা, সেই ভাবনায় বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহলে এখন জোর গবেষণা চলেছে, আর এপর্যন্ত যে ফলাফল জানা গেছে, তা খুবই আশাব্যঞ্জক। একটি আপাতঃ তুচ্ছ জিনিষের গুরুত্ব বিজ্ঞানীদের কাছে আজকাল খুব বেড়ে গেছে। এই জিনিষটি হচ্ছে শ্যাওলা। গবেষণার ফলে শ্যাওলা সম্বন্ধে এপর্যন্ত যেসব তথ্য জানা গেছে, তা খুবই বিস্ময়কর।

শ্যাওলা বলতে প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নর্দমার কালচে রঙের পিচ্ছিল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্ভিদের ছবি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্যাওলার নানা রূপ আর নানা রং। এরা হচ্ছে এক শ্রেণীর শ্যাওলা। বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে, তাই পৃথিবীর সব অঞ্চলেই এদের দেখা যায়। নর্দমার জলের উপরে পাত্‌লা পর্দার মত যেমন কতকগুলি শ্যাওলা ভেসে থাকতে পারে, তেমনি সাগরের গভীর তলদেশে ঝোপঝাড় সৃষ্টি করেও কয়েক রকমের শ্যাওলা জন্মে থাকে। আবার কঠিন পাথরের গায়ে ভেলভেটের মত নরম আবরণ তৈরি করতেও কতকগুলি শ্যাওলা খুব পটু। কতকগুলি শ্যাওলা যেমন সূক্ষ্ম এককোষী উদ্ভিদ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া শুধু চোখে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের দেখা যায় না, আবার এমন বহুকোষী শ্যাওলারও অভাব নাই, যেগুলি ডালপালা ছড়িয়ে ছোট ছোট আগাছার মত রূপ নিয়ে থাকে।

পথে-ঘাটে, জলে-স্থলে নিতান্ত অবহেলায়

এরা জন্মায় বলে আমাদের চোখে শ্যাওলা অতি তুচ্ছ জিনিষ, অথচ শ্যাওলা থেকে আজকাল রাসায়নিক উপায়ে নানা রকম দরকারী জিনিষ অনেক দেশেই তৈরি হয়ে থাকে, যেমন—অ্যালকোহল, আয়োডিন, ভিনিগার, প্লাষ্টিক ইত্যাদি। এইভাবে সামুদ্রিক শ্যাওলা দিয়ে অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। জীবাণু সম্বন্ধীয় গবেষণায় অ্যাগার-অ্যাগার নামে জিলাটিন জাতীয় যে জিনিষটির বিশেষ প্রয়োজন হয়, তাও সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকেই পাওয়া যায়। আজকাল কয়েক রকমের শ্যাওলার অ্যান্টিবায়োটিক গুণও বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্যাওলার ব্যবহার করেই বিজ্ঞানীরা খুসী হতে পারছেন না। আরও কত রকম ভাবে শ্যাওলা মানুষের কাজে লাগানো যেতে পারে, তা জানবার জন্যে বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহলে এখন পুরাদমে গবেষণা সুরু হয়েছে এবং বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক কতকগুলি তথ্যও এখন জানা গেছে।

গবেষণা করে দেখা গেছে, শ্যাওলার পুষ্টিগুণ খুবই বেশী এবং আগামী শতাব্দীর ভিতরেই বিশেষ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার হিসাবে আমাদের সমাজে শ্যাওলার প্রচলন হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করছেন। অবশ্য পৃথিবীর কতকগুলি দেশে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আহার্য তালিকায় শ্যাওলার এক বিশেষ স্থান আছে। চীন, জাপান, মালয়, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে মানুষের দৈনন্দিন ভোজ্য তালিকার এক বিশিষ্ট অংশই সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে তৈরি হয়ে থাকে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলুতে সবচেয়ে বেশী সমাদর যে শ্যাওলার, তার স্থানীয় নাম হচ্ছে লিমু। সেখানে অন্যান্য শ্যাওলা ছাড়াও কেবলমাত্র লিমুই বিক্রী হয় বছরে প্রায় পাঁচ হাজার পাউণ্ড, তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডে সামুদ্রিক শ্যাওলা দিয়ে রকমারী মুখরোচক খাবারও তৈরি হয়ে থাকে—এমন কি, ফলের রসের সঙ্গে মিশিয়ে নানা রকম জেলী আর দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আইসক্রীমও সে সব দেশে তৈরি হয়।

তবে সামুদ্রিক শ্যাওলার ব্যবহারে সব দেশকে ছাড়িয়ে গেছে চীন ও জাপান। উপকূলবাসীদের প্রধান ব্যবসাই হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ ও শ্যাওলা সংগ্রহ করে বিক্রী করা। তাছাড়া সমুদ্রের ধারে শ্যাওলার চাষও করা হয়। খুব কম করেও কুড়ি রকমের শ্যাওলা জাপানে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে পরফাইরা আর ক্লোরেলা নামে দু-রকমের শ্যাওলার প্রচলন সবচেয়ে বেশী।

শ্যাওলার পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যাক। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছেন যে, পুষ্টির বিচারে শ্যাওলার ধারেকাছে যেতে পারে, এমন জিনিষ আমাদের খুব কমই আছে। বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, শ্যাওলাতে প্রোটিনের অংশ আছে শতকরা পঞ্চাশ থেকে সত্তর ভাগ। এর আরও একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, আমাদের প্রচলিত খাদ্য-শস্যাদি থেকে যে প্রোটিন আমরা পাই, তাতে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব রকম অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না, কিন্তু শ্যাওলাতে মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব রকম অ্যামিনো এসিডই বর্তমান। দুধ ও ডিম বিশেষভাবে প্রোটিনসমৃদ্ধ বলে আমরা জানি, কিন্তু কোন কোন শ্যাওলাতে তার চেয়েও বেশী পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া গেছে। শ্যাওলাতে ভিটামিনও আছে খুব ভাল রকম। আমাদের পরিচিত শাক-সব্জীর মধ্যে পালং শাকেই ভিটামিন-সি সবচেয়ে বেশী আছে বলে আমরা জানি। শ্যাওলার ভিটামিন সি-এর পরিমাণ পালং শাকের চেয়ে অনেক বেশী বলে জানা গেছে। শরীরের রক্তাল্পতা-জনিত দুর্বলতা দূর করবার পক্ষে ভিটামিন-বি-১২

একটি বিশেষ কার্যকর ওষুধ। শারীরিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে ডাক্তারেরা পাঠার মেটুলী খাবার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কারণ প্রাণী-দেহের যকৃৎ-এ (যাকে আমরা মেটুলী বলে থাকি) ভিটামিন-বি-১২ থাকে প্রতি এক গ্র্যামে এক মাইক্রন। এই দিক থেকে কোন কোন শ্যাওলার ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ হতে পারে, কারণ এদের মধ্যে এই ভিটামিনের পরিমাণ খুব বেশী রকম আছে। জাপানে পরফাইরা শ্যাওলা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাতে প্রতি গ্র্যামে দশ থেকে কুড়ি মাইক্রন পর্যন্ত ভিটামিন-বি-১২ আছে।

শ্যাওলার খনিজ সম্পদও কম নয়। বিশ্লেষণে যে মৌলিক পদার্থগুলি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, দস্তা ও আয়োডিন। সমুদ্রের শ্যাওলা এই দিক দিয়ে আরও বেশী সমৃদ্ধ। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী যোসেফাইনের মতে, সমুদ্রের জলে খুব কম করেও আটচল্লিশ রকমের মৌলিক পদার্থ আছে, আর সামুদ্রিক শ্যাওলা প্রয়োজনমত জল থেকে এই পদার্থগুলি নিজেদের শরীরে টেনে নেয় বলে এই শ্যাওলা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে শরীর রক্ষার জন্যে দরকারী সব রকম খনিজ লবণই আমরা পেতে পারি। শ্যাওলার আয়োডিন সমৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয়োডিনের অভাবে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই রকম ক্ষেত্রে কেল্প নামে এক ধরণের সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে এক রকম বড়ি তৈরি করে রোগীকে দিনে তিনটি করে খাইয়ে দেখা গেছে যে, দু-মাসের মধ্যেই তার শরীর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে।

শ্যাওলার পুষ্টিকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্যে গবাদি পশুর উপরে পরীক্ষা করেও খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। শূকর ও মুরগীর ছানাদের ক্লোরেলা মেশানো খাবার খেতে দিয়ে দেখা গেছে কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যেই এদের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী বেড়ে যায়।

শ্যাওলা সম্বন্ধে এত সব জানবার পর কেউ যদি মনে করেন, এগুলি দিয়ে এখনই আপনার খাদ্য-সমস্যার সমাধান করবেন, তবে একটু ভুল হবে। বাজার বা বাগান থেকে আনা শাক-সব্জী যদি কাঁচা অবস্থায় আপনার খাবার থালায় পরিবেশন করা যায়, তবে সেগুলি যেমন সুস্বাদু ও সুপাচ্য হবে না, শ্যাওলার বেলায়ও সেই একই কথা বলা চলে। থালায় পরিবেশনযোগ্য হবার জন্যে শ্যাওলাকে প্রথমে রান্না ঘরে ঢুকতে হবে। কি ভাবে এই শ্যাওলাকে সহজেই সুপাচ্য ও সুস্বাদু করা যায়, তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের এখন গবেষণা চলছে।

খাদ্য হিসাবে শ্যাওলা যে বিশেষ পুষ্টিসমৃদ্ধ এবং মানুষের ভোজ্য হিসাবে শ্যাওলার চাষ করা যে অতি প্রয়োজনীয়, সে কথা প্রথম জানা যায় ১৯৪২ সালে। দু-জন জার্মান বৈজ্ঞানিক প্রথম এই মত প্রকাশ করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে ডাঃ হার্ডার ও ডাঃ উইস। পরে আমেরিকাও এর গুরুত্ব বুঝতে পারে। সেখানে এই বিষয়ে প্রথম কাজ সুরু করেন ডাঃ স্পোর ও ডাঃ মিলনার। ক্রমশঃ ভোজ্য হিসাবে শ্যাওলার গুরুত্ব সকলেই বুঝতে পেরেছে, তাই নানা দেশে এখন শ্যাওলা চাষ করে তা নিয়ে গবেষণা চলছে।

শ্যাওলার চাষ করবার প্রণালীটি খুবই সহজ। কাঁচের আধারে জলের সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি খনিজ লবণ মিশিয়ে তার মধ্যে অনায়াসেই শ্যাওলা চাষ করা যায়। চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে সমুদ্রের পাড়ে বড় বড় জলাধার তৈরি করে সেখানে শ্যাওলার চাষ হয়। শ্যাওলা চাষের প্রধান সুবিধা হচ্ছে, এগুলি অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। মাটিতে বীজ বুনে গাছ

বড় করে ফসল পেতে যে সময় লাগবে, তার চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যেই শ্যাওলার চাষ সুরু করে তাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। শ্যাওলার এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা একে এক বিশেষ মর্যাদা দিচ্ছেন। চাঁদে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে হলে মানুষের পক্ষে প্রথমেই দরকার খাবার সংগ্রহ করা। এই সমস্যার সমাধান হিসাবে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা চাঁদে গিয়ে প্রথমেই শ্যাওলার চাষ করবার বিষয়ে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁদের ধারণা, চাঁদের জমিতে গাছপালা নেই, তাই সেখানে গিয়ে প্রথমেই গাছের ফসল সংগ্রহ করে পেট ভরবার উপায় নেই। আবার বীজ বুনে তা থেকে ফসল পেতেও অনেক দেরী হবে। কাজেই চাঁদে নেমে প্রথমেই সেখানে শ্যাওলার চাষ করবার চিন্তা বিজ্ঞানীদের মাথায় এসেছে। সেখানে বড় বড় জলাধার তৈরি করে রাসায়নিক সার ঢেলে তার মধ্যে শ্যাওলার চাষ করলেই গ্রহান্তর যাত্রীদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। শ্যাওলা চাষের আরও একটা সুবিধা হচ্ছে—ধান, গম ইত্যাদি যে সব শস্যাদির চাস করা হয়ে থাকে, তাথেকে প্রয়োজনীয় শস্যগুলি সংগ্রহ করে ডাঁটা, পাতা, শিকড় সমস্ত গাছগুলিই আমরা ফেলে দিয়ে থাকি। পুষ্টির বিচারে এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফসলগুলিই দরকারী। বাকী এক বিরাট অংশের কোন পুষ্টিগুণ মানুষের কাছে অন্ততঃ নেই। তাই সেগুলির অপচয় হয়ে থাকে। সেই দিক থেকে শ্যাওলার চাষ করা খুবই লাভজনক। কারণ এদের সবটাই ভোজ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে, কোন অংশেরই অপচয় হবে না। শ্যাওলা চাষের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যে সব জমিতে আমাদের প্রচলিত খাদ্যশস্যাদির চাষ হয়, শ্যাওলা চাষ করবার জন্যে সেই জমির দিকে নজর দেবার দরকার নেই। পতিত অনাবাদী জমিতে অনায়াসেই শ্যাওলার চাষ করা যায়। এই দিক দিয়ে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ উপকূল বিশেষভাবে উপযোগী। এখানে জলাধার তৈরি করে রাসায়নিক তরল সার ঢেলে প্রচুর শ্যাওলা জন্মানো যেতে পারে—যেমন, চীন ও জাপানে হয়। এর ফলে আবাদী জমিতে উৎপন্ন আমাদের প্রচলিত খাদ্যগুলি ছাড়াও অনাবাদী জমিতে শ্যাওলার চাষ করে তাও আহার্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। তাতে প্রচলিত খাদ্যের সঙ্গে নতুন খাদ্য সংযোজন করে একদিকে যেমন আমাদের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করা যাবে, আর এক দিকে শরীরের পুষ্টির অভাব পূরণ করে আমাদের সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীর গঠন করাও সম্ভব হবে। কি ভাবে ব্যবহার করলে এই শ্যাওলা থেকে যথাসম্ভব অল্প খরচে যথাসম্ভব বেশী পুষ্টি মানুস গ্রহণ করতে পারে, তা এখন গবেষণার বিষয় এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহলে এখন সেই বিষয়েই পুরাদমে গবেষণা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, এই শতাব্দীর মধ্যেই নানা রকম টনিক আর ট্যাবলেটের চেহারা নিয়ে নতুবা রকমারী সুপাচ্য খাবার হিসাবে শ্যাওলা আমাদের ঘরে ঘরে সমাদর পাবে।

# সঞ্চয়ন

## উন্মুক্ত মহাকাশে মানুষ

চব্বিশ ঘণ্টা মুক্তভাবে উড্ডয়নের পর 'সোয়ুজ-৪' ও 'সোয়ুজ-৫' মহাকাশ যান দুটি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই সর্বপ্রথম মনুষ্যবাহী দুটি মহাকাশযানের মিলন ঘটলো। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো, মহাকাশে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক কক্ষ-পরিক্রমাকারী ষ্টেশন স্থাপন। পরে দরকার হলে এরূপ তৎপরতা চালাবার জন্যে এটিকে ব্যবহার করা যাবে। এদিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থায়ী পরিক্রমাকারী ষ্টেশন নির্মাণের কাজ চলবে।

একটি যান থেকে দু-জন মহাকাশচারীর উন্মুক্ত মহাকাশ দিয়ে অন্য যানে প্রবেশ যুক্ত অবস্থায় 'সোয়ুজ-৪' ও 'সোয়ুজ-৫' মহাকাশ যান দুটির উড্ডয়নকালে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রহোদ্দীপক পরীক্ষা।

সোয়ুজ শ্রেণীর মহাকাশযানগুলি পৃথিবীর প্রায় ২০০ কিলোমিটার উপর দিয়ে কক্ষ পরিক্রমা করে, এখানে বস্তুতঃ কোন আবহমণ্ডল নেই। উন্মুক্ত মহাকাশের পরিবেশ একান্ত প্রতিকূল এবং তা যে শুধু মানুষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবের দরুণ, তা নয়।

তীব্র সৌরবিকিরণ, যার একটা বড় অংশ তীব্র অতিবেগুনী প্রদ্যোতনের উপর পড়ে, তা জীবদেহের পক্ষে মারাত্মক। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মহাকাশযানের সূর্যালোকিত অংশটি সেই সৌরশক্তির প্রভাবের অধীন, আবহ-মণ্ডল যাকে দূরীভূত করে না বা আত্মসাৎ করে না। সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশযানের সূর্যের বিপরীত দিকটি মহাকাশেই শৈত্যের অধীন। অতিতপ্ত ও অতিশীতল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থাদির দরকার।

মহাকাশযানের বাইরে চাপ শূন্য। যাহোক, এটা জানা কথা যে, যে তাপমাত্রায় তরল পদার্থ ফুটতে সুরু করে, চাপ কমলে আরও কম তাপ-মাত্রায় তা ফুটতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাকাশচারীর রক্ষাকারী পোষাকে চাপ কমিয়ে দিলে রক্ত তৎক্ষণাৎ ফুটতে থাকবে ও মৃত্যু ঘটবে।

সর্বশেষে মহাজাগতিক প্রদ্যোতনের কথা মনে রাখা দরকার। এর অধিকাংশ শক্তি ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় না এবং ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে মলিকিউলের বিদারণ ও আয়নেই নিঃশেষ হয়ে যায়। মহাকাশের উচ্চতায় কিন্তু বিকিরণ থেকে বিশেষ রক্ষা-ব্যবস্থা রাখা দরকার। এসব ও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি মিলে মহাকাশে মানুষের বিভিন্ন তৎপরতাকে দুরূহ করে তোলে।

সাফল্যের সঙ্গে এসব অসুবিধার মোকাবেলা করেছেন বিজ্ঞানী ও ডিজাইনারেরা। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ইতিহাসে সর্বপ্রথম আলেক্সেই লিওনোফ মহাকাশে পদচারণা করে প্রমাণ করেন যে, এরূপ পরিবেশে মানুষ থাকতে পারে। এবার দু-জন মহাকাশচারী একটি মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিভাবে এটা সম্ভব হলো?

সোয়ুজ যানগুলির ভিতরকার স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক পরিবেশ ভিতরে থাকাকালে মহাকাশচারীদের মহাকাশ-পোষাক ছাড়াই অবস্থান সম্ভবপর করে। উন্মুক্ত মহাকাশে পদচারণার আগে মহাকাশচারী আলেক্সেই ইয়েলিসেইয়েফ ও ইয়েভ্‌গেনি

খ্রুনোফ অর্বিট্যাল কেবিনে গিয়ে মহাকাশ-পোষাক পরিধান করেন। মহাকাশযান থেকে নিষ্ক্রমণের নিশ্চয়তাদানকারী ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে দেখবার পর তাঁরা উড্ডয়ন কমাণ্ডারকে জানালেন, মহাকাশযান ত্যাগ করবার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত। চালকদের কেবিন ও অর্বিট্যাল কেবিনের মাঝখানের ঢাক্‌নাটি দৃঢ়-রুদ্ধ করে বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং অর্বিট্যাল কেবিনের চাপ বাইরের চাপের সমান করে দেওয়া হলো।

মহাকাশ-পোষাকের ভিতরকার চাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় রেখে দেওয়া হলো, যাতে তা মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্য বিপন্ন না করে এবং তাদের চলাফেরা ব্যাহত না হয়। মহাকাশ-পোষাকের ভিতর ও বাইরের চাপে বেশী ফারাক ঘটলে পোষাকটি ফুলে ফুটবলের মত হয়ে যেতে পারে ও চলাফেরা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

নিষ্ক্রমণের দরজা খুলে মহাকাশচারীরা মহাকাশযান ত্যাগ করেন। ঝোলার ব্যবস্থা শ্বাস-প্রশ্বাস, গ্যাস মিশ্রণের রাসায়নিক গঠন ও পোষাকের ভিতরকার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করছিল। মানুষ যখন অধিকতর প্রয়াস চালায় তখন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাকে পৃথিবীর চেয়ে মহাকাশে প্রতিটি চলাফেরার জন্যে অধিকতর শক্তি ব্যয় করতে হয়।

মহাকাশ-পোষাকের বহুস্তর স্থিতিস্থাপক চামড়া তৈরি হয়েছে খুব শক্ত ও স্থায়ী মালমশলা থেকে। পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়, এরূপ বিশেষ কাচযুক্ত শিরস্ত্রাণ তাঁরা পরেছিলেন—এটি সৌর শিখা থেকে চোখকেও রক্ষা করে। অবাধে ঘোরানো যায়, পোষাকের বিভিন্ন অংশ এরূপ জোড়ের সাহায্যে যুক্ত থাকায় মহাকাশচারীরা অবাধে চলাফেরা করতে পেরেছেন।

মহাকাশযানের বাইরে এসে মহাকাশচারীরা অবিরাম মহাকাশযান দুটির কমাণ্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন তাদের পোষাক ও মহাকাশযান দুটির মধ্যে সংযোগকারী ব্যবস্থার সাহায্যে। যোগাযোগ ছাড়াও এই ব্যবস্থা মহাকাশ-পোষাককে বিদ্যুৎ জোগায়, মহাকাশ-চারীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে টেলিমেট্রিক তথ্য পাঠায়। বাইরের টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে কমাণ্ডা-রেরা তাঁদের সহযোগীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে সক্ষম হচ্ছিলেন।

কর্মসূচী অনুযায়ী উন্মুক্ত মহাকাশে তৎপরতা শেষ করবার পর ইয়েলিসেইয়েফ খ্রুনোফ সোয়ুজ-৪ মহাকাশযানের অর্বিট্যাল কেবিনে প্রবেশ করেন। তখন কেবিনের ভিতরের চাপ বাইরের চাপের সমান করা হয়েছিল ও প্রবেশ ঢাক্‌না খুলে দেওয়া হয়েছিল। মহাকাশযানে প্রবেশ করবার পর ঢাক্‌না বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পোষাকের ও কেবিনের চাপ স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। পোষাক খুলে তাঁরা সাময়িক ঢাক্‌নার মধ্য দিয়ে চালক-কেবিনে প্রবেশ করেন। তারপর উড্ডয়ন কমাণ্ডারকে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের সংবাদ জানান।

দল বেঁধে মহাকাশযান থেকে উন্মুক্ত মহাকাশে নিষ্ক্রমণ বিপুল ব্যবহারিক তাৎপর্যপূর্ণ। এতে শুধু চালকদল বদলই নয়, কলকব্জা জোড়া দেওয়া বা মেরামতি কাজে দল বেঁধে অংশগ্রহণেরও সম্ভাবনা খুলে গেছে।

# উদ্ভিজ্জ পদার্থের কয়লায় রূপান্তর

শ্রীরঘুনাথ দাস

অনেকেরই হয়তো জানা আছে যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কয়লার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। এতে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, কয়লা উৎপত্তির প্রধান উৎস উদ্ভিদ। পৃথিবীর প্রতিকূল আবহাওয়ায় এই সকল উদ্ভিদ এককালে মাটির নীচে চাপা পড়ে আস্তে আস্তে বিভিন্ন রাসায়নিক ও ভৌতিক (Physical) ক্রিয়ার ফলে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। কয়লার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ তত্ত্ব প্রচলিত আছে, কিন্তু তার মধ্যে দুটিই মাত্র গ্রহণযোগ্য।

(১) In situ বা Autochthonous theory.

(২) Drift বা Transportation theory.

প্রথমটির মতে, কয়লায় রূপান্তরণে উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলির স্থানচ্যুতি ঘটে নি; অর্থাৎ যে স্থানে উদ্ভিদ মাটির নীচে চাপা পড়েছে, সে স্থানেই কয়লার উৎপত্তি হয়েছে—এতে কোন স্থান পরিবর্তন হয় নি। এই মতের স্বপক্ষে অবশ্য প্রচুর যুক্তি আছে।

দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠপোষকগণ মনে করেন যে, ভূমিকম্প ও প্রবল বর্ষণের জন্যে উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি বাহিত হয়ে কোন হ্রদ বা সমুদ্রে জমা হয় এবং সেখানে জলের নীচে ধীরে ধীরে তাদের রূপান্তর ঘটতে থাকে। বহু দৃষ্টান্তই এই তথ্যের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্য দুটি তত্ত্বই সমান স্বীকৃতি পেয়েছে। বিভিন্ন জায়গার কয়লা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কোন কোন স্থানে প্রথম তত্ত্বটি প্রযোজ্য আবার কখনও বা এরা দ্বিতীয় সূত্রটি অনুসরণ করে।

কয়লার উৎপত্তিস্থল যাই হোক, আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হলো, কেমন করে উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি কয়লায় রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে, কয়লায় রূপান্তরণে প্রথমে উদ্ভিদদেহ থেকে পীট (Peat) তৈরি হয় এবং পরে সেটা আস্তে আস্তে লিগ্‌নাইট, বিটুমিনাস, অ্যান্‌থ্রাসাইট প্রভৃতি কয়লায় পরিবর্তিত হতে থাকে। পীট তৈরির সময় উদ্ভিদের মধ্যে সেলুলোজ, লিগ্‌নিন, মোম এবং রেজিন প্রভৃতি পদার্থগুলি একে একে বিয়োজিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অথবা এদের মধ্যে বিবর্তন ঘটতে থাকে। কোন্ অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন পদার্থগুলির কতখানি রূপান্তর ঘটে, তারই উপর নির্ভর করে উৎপন্ন পীটের ধর্ম এবং প্রকৃতি। ফলে সর্বশেষ কয়লার ধর্মও এই পীটের ধর্মানুযায়ী স্থিরীকৃত হয়। যদি উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি বেশী রকম ভাবে বিয়োজিত হয়, তাহলে সেই পীট থেকে যে কয়লার জন্ম হয়, তার মধ্যে Caking property কমতে থাকে। তাই শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী কয়লার উদ্ভিজ্জ পদার্থের সম্পূর্ণ ধ্বংস অভিপ্রেত নয়।

সাধারণভাবে উদ্ভিদদেহ থেকে পীটের রূপান্তরে তিনটি পদার্থ অংশ গ্রহণ করে—(১) হিউমিক অ্যাসিড (Humic acid), (২) Sapropeliths, (৩) Liptobioliths। এর মধ্যে হিউমিক অ্যাসিড কয়লার একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় উৎপন্ন হয় এবং এর ফলে তৈরি হয় ব্রাইট কোল। Sapropeliths-এর জন্ম স্থির জলে এবং নানারকম ব্যাক্টিরিয়ার বিক্রিয়ার ফলে। সর্বশেষে Liptobioliths-এর মধ্যে থাকে রজন, মোম এবং স্পোর। এগুলি সহজে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না এবং উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ক্রিয়

পদার্থ। তাই উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিয়োজন রোধ করতে হলে এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মাটির নীচে বা জলের তলায় থাকতে হবে—কেন না, তাহলে বাইরের বাতাস বা অক্সিজেন চলাচল করতে পারবে না। ফলে যে সব ব্যাক্টিরিয়া উদ্ভিদ-দেহের রূপান্তরের জন্যে দায়ী, তারাও বাঁচতে পারবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক অবস্থায় হিউমিক অ্যাসিড প্রভৃতির ক্রিয়ায় উদ্ভিদের ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্যে যে সব বিষাক্ত পদার্থ (Toxic material) উৎপন্ন হয়, সেগুলিই আবার পরবর্তী বিয়োজন প্রক্রিয়ার জন্যে দায়ী। তাই যদি উদ্ভিদের পুরা স্তূপটি কোন স্থির জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত থাকে, তবে এই বিষাক্ত পদার্থের কিছু না কিছু অংশ এতে দ্রবীভূত হবে এবং তার ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রতিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব। আবার যদি এই জলের স্তর স্থির না হয়ে সব সময় প্রবাহিত হতে থাকে, তবে এর মধ্যে প্রচুর অক্সিজেন সরবরাহ হয় এবং ব্যাক্টিরিয়ার জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ-দেহের মধ্যে বেশী রকমের বিয়োজন সাধিত হয় এবং এতে যে কয়লা উৎপন্ন হয়, তার মধ্যে Caking property-র ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

এখন দেখা গেছে যে, উদ্ভিদ-দেহের রূপান্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে যে পীট্ তৈরি হয়, তারই উপর নির্ভর করছে উৎপন্ন কয়লার যা কিছু ধর্ম। কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ কোন্ পদার্থের বিয়োজনের ফলে পীট্ তৈরি হলো, তারই উপর নির্ভর করে সর্বশেষ কয়লার প্রকৃতি ও ধর্ম। সাধারণভাবে পীট্ তৈরির সময়ে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং এদের reactivity নীচের ক্রম অনুযায়ী সাজানো—(১) সেলুলোজ, (২) লিগ্‌নিন, (৩) মোম ও (৪) রজন।

তাই স্থির এবং বিষাক্ত জলের নীচে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সবচেয়ে কম ধ্বংস সাধিত হয় এবং এতে কেবলমাত্র সেলুলোজই বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এই জাতীয় পীটে অন্যান্য পদার্থগুলি অপরিবর্তিত থাকে। এই পীট্ থেকে যে কয়লা উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞানী Thiessen তার নাম দিয়েছেন Anthraxylon এবং বিজ্ঞানী Stopes এর নামকরণ করেছেন Vitrain। এই জাতীয় কয়লায় Caking property বিদ্যমান। আবার অল্প বিষাক্ত জলের নীচে উদ্ভিজ্জ পদার্থের ধ্বংসের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশী। তাই এখানে সেলুলোজের সবটাই বিয়োজিত হয় এবং লিগ্‌নিন, মোম ও রজন অপরিবর্তিত থাকে। এই জাতীয় পীট্ থেকে যে কয়লা পাওয়া যায়, Stopes-এর ভাষায় তার নাম Clarain। এই কয়লার মধ্যেও Caking property রয়েছে।

কিন্তু বাতান্বিত জলে সম্পূর্ণ সেলুলোজ এবং কিছু পরিমাণ লিগ্‌নিনও বিয়োজিত হয়, ফলে এই পীট্ থেকে যে কয়লার উৎপত্তি হয়, তাতে কোন Caking property নেই বিজ্ঞানী Thiessen এর নাম দিয়েছেন Attritus এবং Stopes-এর ভাষায় এটি হলো Durain। আবার বেশী পরিমাণ অক্সিজেনসমন্বিত জলের নীচে যে পীট্ তৈরি হয়, তাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রায় সবটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কেবলমাত্র কিছু পরিমাণ স্পোর, রজন এবং মোম প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকে। এথেকে যে কয়লা উৎপন্ন হয়, তার ধর্ম পীটের ধর্মেরই অনুরূপ। একে বলা হয় Cannel coal বা Fusain ( Stopes-এর মতে ) এবং এর কোন Caking property নেই।

এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম, কেমন করে উদ্ভিদ থেকে পীট্ তৈরি হয় এবং কোন্ কোন্ পরিবেশের পীট্ কি কি জাতের কয়লা উৎপাদন করে। এবার দেখা যাক পীট্ থেকে কিভাবে সর্বশেষে কয়লা উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াটি খুব বেশী সময়সাপেক্ষ এবং পীটের

জন্মকালের পর থেকে এটি সুরু হয়। দু-রকমের পরিবর্তনের ফলেই সর্বশেষে কয়লার জন্ম হয়।

(১) Colloidal chemical change.

(২) Dynamo-chemical বা Metamorphic change.

আমরা দেখেছি যে, পীট্ তৈরির সময়ে প্রাথমিক অবস্থায় হিউমিক অ্যাসিড তৈরি হয়। সেটাই আবার উদ্ভিদ-দেহের আভ্যন্তরীণ জলীয় পদার্থের সঙ্গে মিশে একটা Hydrosol বা এক ধরণের কলয়েড দ্রবণ সৃষ্টি করে। ক্রমে আস্তে আস্তে জলীয় অংশের পরিমাণ কমতে থাকলে তাথেকে Hydrogel প্রস্তুত হয়। বহু বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত এই হিউমিক অ্যাসিড Gel এক প্রকার অদ্রবণীয় হিউমিক যৌগে পরিণত হয়। এই সব পদার্থগুলি পীটের আভ্যন্তরীণ স্তরে জমা হয় এবং অন্য পদার্থের অনুপ্রবেশ রোধ করে। ফলে পীটের সচ্ছিদ্র অংশগুলি হিউমিক যৌগে ভর্তি থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পীটের মধ্যে যত বেশী পরিমাণ হিউমিক যৌগ জমা হয়, তত বেশী জৈব পদার্থ এর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকে এবং জলীয় পদার্থের পরিমাণ তত কমতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পীট্ আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হয়ে লিগ্নাইট ও সাববিটুমিনাস কয়লায় রূপান্তরিত হয়। পীটের মধ্যে যত বেশী দিন এই প্রক্রিয়া চলে, তত বেশী উঁচুজাতের (High rank) কয়লা পাওয়া যায় এবং এতে জলীয় অংশের পরিমাণ কমতে থাকে।

সর্বশেষ প্রক্রিয়ায় লিগ্নাইট এবং সাববিটুমিনাস কয়লা ভূগর্ভের অভ্যন্তরের প্রচণ্ড চাপ এবং তাপে বহুদিনের ক্রিয়ায় বিটুমিনাস এবং অ্যান্‌থ্রাসাইট কয়লায় রূপান্তরিত হয়। চাপ এবং তাপের ফলে যে, কয়লার রূপান্তর সম্ভব, তা প্রমাণ করবার জন্যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Bergius নানা পরীক্ষা চালান। জলীয় পদার্থের উপস্থিতিতে ১৪০ বায়ু-চাপ এবং ৩৪৬° সি. তাপে তিনি সেলুলোজকে কয়লাজাতীয় এক প্রকার কালো রঙের কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত করেন। এথেকে বুঝা যায় যে, লিগ্নিন সেলুলোজেরই একটি রূপান্তরিত অংশ। আবার লিগ্নিন নিয়ে একই রকম পরীক্ষা করে তিনি ব্রাইট কোল তৈরি করেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, তাপ ও চাপের পরিমাণ বাড়িয়ে-কমিয়ে যে কোন জাতের কয়লাই প্রস্তুত করা সম্ভব। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ১০০০ ফুট মাটির নীচে গড় তাপমাত্রা ১৮০° সি. এবং চাপ ১২০০ psi.। তাই বহুদিনের পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লিগ্নাইট, সাববিটুমিনাস পদার্থগুলি বিটুমিনাস, অ্যান্‌থ্রাসাইট প্রভৃতি কয়লায় রূপান্তরিত হতে থাকে। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, উচ্চ জাতের কয়লার স্তরগুলি খনির গভীরতর প্রদেশে অবস্থিত, যেখানে চাপ এবং তাপের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। Hilt's hypothesis-ও এই তথ্যের উপর রচিত। তাঁর মতে, খনির গভীরতা যত বাড়ে, উত্থিত কয়লায় উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণও তত কমে এবং কার্বনের পরিমাণ তত বাড়ে—অর্থাৎ কয়লা তত উঁচু জাতের হয়।

সর্বশেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কয়লার ধর্ম এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার পূর্ব-ইতিহাসের উপর। কোন্ জাতীয় পীট্ থেকে এর উৎপত্তি, খনির কত নীচে এর অবস্থিতি, সেখানের তাপ ও চাপের পরিমাণ কত এবং কত বছর ধরে মাটির নীচে এর সমাধি ঘটেছে, তার উপরই কয়লার গুণাবলী নির্ভর করে।

# কার্বন ডাইঅক্সাইড

আব্দুল হক খন্দকার

নানাবিধ প্রয়োজনে যখন আমরা কয়লা পোড়াই, তখন সামান্য পরিমাণ ছাই ছাড়া তার আর কিছুই পড়ে থাকে না। কিন্তু দৈনন্দিন এমনিভাবে কয়লা পোড়াবার ফলে হাজার হাজার মণ কয়লা যে অদৃশ্য হয়—সে কি তবে ধ্বংস হয়ে যায়? না, তা হয় না। বিজ্ঞানীরা বলেন, কোন পদার্থের এমনিভাবে কখনও ধ্বংস হয় না। এই হাজার হাজার মণ কয়লা এই বিশ্বচরাচরে তখনও বিরাজ করে, কিন্তু তা কয়লা হিসাবে নয়—এক অদৃশ্য গ্যাসের উপাদান হিসাবে বাতাসের বুকে বিলীন হয়ে থাকে। এই অদৃশ্য গ্যাস আর কিছুই নয়, কার্বন ও অক্সিজেনের সংযোগে গঠিত এক যৌগিক পদার্থ—কার্বন ডাইঅক্সাইড। যে কয়লাকে পুড়িয়ে আজ আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করছি, তা এককালে এই বাতাসে মিশ্রিত বর্ণহীন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এককালে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল প্রচুর। উদ্ভিদের একটি খাদ্য হলো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড। উদ্ভিদের পাতার রন্ধ্রে বাতাস যখন প্রবেশ করে, তখন বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে শোষণ করে। মাটির বুকে জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইডও মূলের সূত্রে উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে। এমনিভাবে পাতা ও মূলের মাধ্যমে উদ্ভিদ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে, তাথেকেই উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন কার্বন যৌগের অর্থাৎ তার খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতি চলে, দেহের কঠিন অংশ গঠিত হয়। বাতাসে যখন এককালে (আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের ফলে) কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন স্বভাবতঃই যেমন উদ্ভিদের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল, তেমনি তাদের বৃদ্ধিও ঘটেছিল। বিরাট বিরাট বৃক্ষ ও বন-জঙ্গলে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। কালে সে সকল বিরাট বনানী যখন ভূগর্ভে প্রোথিত হয়, তখন ভূপৃষ্ঠের চাপে, ভূগর্ভের তাপে এবং জীবাণুর দৌরাত্ম্যে উদ্ভিদ-দেহের কার্বন যৌগসমূহ একদিন কালো কয়লায় রূপান্তরিত হয়। কাজেই আমরা যখন কয়লা পোড়াই, তখন কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন বিমুক্তির ফলে হাজার হাজার বছর পূর্বে একদিন যে কয়লায়, তথা কার্বনে পরিণত হয়েছিল, তাই বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি করে এবং পুনর্বার বাতাসের বুকে বিলীন হয়। এমনিভাবে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে কার্বন এবং কার্বন থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ ও মানুষের কার্যকারিতায় চক্রবৎ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং যেদিন থেকে পৃথিবীতে উদ্ভিদের উদ্ভব ঘটেছে এবং যতদিন তারা ধরাতলে জীবিত থাকবে, ততদিন এই চক্রবৎ পরিবর্তন চলতে থাকবে।

শুধু কয়লা পোড়ালেই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়, তা নয়। অঙ্গার, কাঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম—মোট কথা কার্বনঘটিত যে কোন দ্রব্যকে পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। আমাদের দেহেও প্রতিনিয়ত এই গ্যাস তৈরি হচ্ছে। প্রশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত বাতাসের অক্সিজেন আমাদের ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং রক্তে মিশ্রিত

খাদ্যদ্রব্যের সারাংশের সঙ্গে মৃদু দহন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই মৃদু দহন-ক্রিয়ার ফলে দেহে যে তাপের সৃষ্টি হয়, তাই আমাদের কর্মক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে সকল দেহযন্ত্রকে কর্মক্ষম ও সচল রাখে। দৈহিক এই প্রক্রিয়ার ফলেও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় এবং রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে পরিবাহিত হয়ে ফুস্ফুসের মধ্য দিয়ে পরিশেষে নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত হয়। তাই আমরা যখন নিঃশ্বাস ছাড়ি, তখন সেই বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ থাকে শতকরা ৪ ভাগ, অথচ বাতাসে সাধারণতঃ কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আয়তনের অনুপাতে থাকে শতকরা ০'০৩ ভাগ। চুন তৈরির জন্যে যখন চুনাপাথর অথবা চক্ পোড়ানো হয়, তখনও কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় এবং এভাবে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি হয়ে বাতাসে মিশ্রিত হয়। সোডা, লেমোনেড জাতীয় পানীয় দ্রব্যের বোতল যখন আমরা খুলি, তখন বুদ্বুদের আকারে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই বেরিয়ে এসে সেই পানীয় দ্রব্যকে উজ্জ্বল ও ফেনাযুক্ত করে। কিণ্বন প্রক্রিয়ায় (Fermentation) মদ কিংবা অন্যান্য দ্রব্য যখন তৈরি করা হয়, তখনও এই গ্যাস প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় এবং অনেক ধাতু নিষ্কাশনের ক্ষেত্রেও বহুল পরিমাণে এই গ্যাস পাওয়া যায়। লেবরেটরিতেও সহজে এই গ্যাস তৈরি করা যেতে পারে। যেমন—একটি বোতল কিংবা ফ্লাস্কে কিছু মার্বেল পাথরের টুক্‌রা নিয়ে তাতে অ্যাসিড—এমন কি, মৃদু অম্লাত্মক পদার্থ সির্কা ঢাললেও বোতল থেকে বেশ জোরে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন, সামান্য গন্ধযুক্ত এবং বাতাসের চেয়ে দেড়গুণ ভারী এক রকমের গ্যাস। হাইড্রোজেনের মত এটি জ্বলে না বা অক্সিজেনের মত দহন-কার্যেরও সাহায্য করে না। এই গ্যাসের মধ্যে কোন জ্বলন্ত জিনিষ ধরলে জলে ডোবানোর মতই তা নিবে যায়। প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডকে তাই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাহায্যে দমন করা সম্ভব। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেমন নেবাতে পারে, আমাদের জীবন-প্রদীপকেও তেমনি নির্বাপিত করতে পারে। কার্বন ডাইঅক্সাইড যদিও বিষাক্ত নয়, তবু কোন জীবজন্তু এতে বাঁচতে পারে না—কেন না, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তারা মারা যায়। এমনি অঘটন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটতে দেখা গেছে। মাটির নীচের ঘরে বা গুদামে, খাদে কিংবা বহুদিনের অব্যবহৃত কূপে প্রবেশ করে অজান্তে অনেকেই মৃত্যু বরণ করেছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে বেশ ভারী বলে এই সব নীচু জায়গায় তা জমা হয় এবং স্বচ্ছ বলে তার উপস্থিতি বুঝতেও পারা যায় না। কাজেই এসব স্থানে প্রবেশ করবার পূর্বে সেখানে মারাত্মক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড জমেছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। পরীক্ষা করবার পদ্ধতি অতি সহজ। একটি বাতি কিংবা মোমবাতি জ্বালিয়ে সেখানে নামিয়ে দিয়ে যদি দেখা যায় যে, বাতি নিবছে না, তবে শঙ্কার কোন কারণ নেই, কিন্তু যদি বাতির আলো নিবে যায়, তবে সেখানে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে কখনও প্রবেশ করা উচিত নয়।

কার্বন ডাইঅক্সাইড কোথাও কোথাও ভূগর্ভ থেকে গ্যাস হিসাবে কিংবা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় নির্গত হয়। আগ্নেয়গিরি কিংবা ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে এই গ্যাস উত্থিত হয়ে নিকটবর্তী খাদে বা নীচু জায়গায় জমা হয়। জাভার 'ভ্যালী অফ ডেথ' বা মৃত্যুপ্রান্তর এমনি ভূগর্ভ থেকে উত্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে ভরপুর থাকে। এই এলাকায় এক কালে কত যে জীবজন্তু শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়েছে, তার

ইয়ত্তা নেই। তাই অসংখ্য মানুষ, পশু-পক্ষীর কঙ্কাল আজও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। নেপেল্‌সের গ্রোটা ডেলকেন গুহার মেঝের উপরে সব সময় ২.৩ ফুট উঁচু কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি স্তর অবস্থান করে বলে একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। ঐ গুহার মধ্যে মানুষ নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু সঙ্গে যদি কুকুর থাকে, তবে সেটি ছট্‌ফট করতে করতে শীঘ্রই মারা যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্তরটি ২.৩ ফুট উঁচু বলে মানুষের নাক পর্যন্ত তা নাগাল পায় না, কিন্তু কুকুর অনায়াসে তার আওতার মধ্যে পড়ে যায়। পশ্চিম আমেরিকার ইওলোষ্টোন পার্কের ডেথ গালচেও কার্বন ডাইঅক্সাইড উত্থিত হয় এবং সেখানেও মৃত্যুমুখে পতিত অনেক জীবজন্তুর কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। চুন তৈরির চুল্লীর নিকট শীতপ্রধান দেশের অনেক দরিদ্র ব্যক্তি শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় আস্তানা নিয়ে থাকে, কিন্তু তা করতে গিয়ে অনেকে মারাও পড়েছে—কেন না, চুনা পাথর পুড়িয়ে চুন তৈরি করবার প্রাক্কালে যথেষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় এবং তা নিকটবর্তী এলাকায় জমা হয়ে মানুষের অজান্তে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যাহোক, পৃথিবীতে নানা প্রাকৃতিক সূত্রে এবং মানুষের কার্যকারিতায় বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্রমাগত জমা হচ্ছে। কখনও আগ্নেয়গিরি ও ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে, কখনও পেট্রোলিয়ামের কূপ খনন করতে গিয়ে, প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তা বেরিয়ে আসছে। বস্তুতঃ আগ্নেয়গিরি ও ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়েই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়ে বাতাসে মিলিত হয়। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস উত্থিত হয়ে বাতাসকে কলুষিত করছে। কাজেই আদিকালে পৃথিবীতে যখন আগ্নেয়গিরির প্রাচুর্য ছিল,তখন কি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড যে বাতাসে মিশ্রিত হতো এবং এই সূত্রে কত প্রাণীর যে জীবন নাশ ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই ধ্বংসের পরিমাণ যে কত বিরাট, তা একটি মাত্র নজির থেকেই বুঝতে পারা যায়। ১৭৮৩ সালে আইসল্যাণ্ডের একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ভূগর্ভের যে গ্যাস নির্গত হয়, তাতে ৯০০০ মানুস ও ২২৯,০০০ গৃহপালিত পশু মারা যায়।

যাহোক, যখনই কয়লা বা অঙ্গার কিংবা কার্বনের কোন যৌগ, অথবা চুনাপাথর পোড়ানো হচ্ছে, তখনই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি হচ্ছে —জীবজন্তুও প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তা সৃষ্টি করছে, জৈব পদার্থের পচন ও কিণ্বন প্রক্রিয়াতেও প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস প্রস্তুত হচ্ছে।

হিসাবে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি লোক প্রত্যহ প্রায় দুই পাউণ্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাসে বিমুক্ত করে। একটি লোক যদি ৭০ বছর বাঁচে, তবে তার জীবিতকালে একমাত্র প্রশ্বাসের সূত্রেই পাওয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দাঁড়াবে ২২ টনের মত। সমগ্র মানবজাতি মাত্র একদিনে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড এমনিভাবে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, তার ওজন দাঁড়াবে ১,০০০,০০০ টনেরও অধিক। কিন্তু এ তো গেল একদিনের হিসাব, তাছাড়া মানুষই শুধু যে এই গ্যাস প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করছে তা নয়, *অন্যান্য* জীবজন্তুও এই গ্যাস সৃষ্টির কাজে সহায়তা করছে। আবার একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর বুকে আজকেই যে প্রাণী বসবাস করছে তা নয়, বহুদিন ধরেই পৃথিবীতে প্রাণীর আনা-গোনা চলছে। কাজেই বাতাসে একমাত্র প্রাণীর সূত্রেই কত বিপুল পরিমাণ কার্বন

ডাইঅক্সাইড যে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, তা কল্পনা করাও কঠিন। আবার কয়লা পুড়িয়ে মানুষ যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সৃষ্টি করছে, তার পরিমাণ আরও অধিক। প্রত্যহ নিঃশ্বাসের সঙ্গে মানুষ যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে—দৈনন্দিন কাজে শুধুমাত্র কয়লা পোড়াবার ফলে তার চেয়ে দশগুণ বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইডের সৃষ্টি হয়।

এথেকে হয়তো মনে হতে পারে যে, এমনিভাবে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রতিনিয়ত বাতাসে মিশ্রিত হচ্ছে, তাতে বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না কেন? কেন বাতাসে আয়তনের অনুপাতে শতকরা মাত্র ০'০৩ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিলক্ষিত হয়, কেন তার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে না? এর কারণ অবশ্য প্রকৃতিতেই রয়েছে, যার ফলে বাতাসে নানাভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের অহির্নিশ মিশ্রণেও তার পরিমাণ কখনও বৃদ্ধি পায় না, অনেকটা পরিমিত থাকে এবং কোন প্রাণীর জীবন-সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। নদী, খাল, বিল, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতির জল প্রতিনিয়ত এই গ্যাসকে দ্রবীভূত করে বাতাস থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, জলজ উদ্ভিদ ও কোন কোন প্রাণী তা গ্রহণ করে তাদের দৈহিক গঠনের কাজে ব্যবহার করছে। পাহাড়-পর্বতের পাথর প্রভৃতির ক্ষয়ের কাজে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রতিমুহূর্তে অদৃশ্যভাবে অংশ-গ্রহণ করছে এবং এমনিভাবে পাথরকে ক্ষয় করতে গিয়ে যে সকল দ্রবণীয় কার্বনেট তৈরি করছে, তাই আবার একদিন সাগর জলে সংমিশ্রিত হচ্ছে। সাগর, মহাসাগরের বুকে যে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করে, তারা এসকল দ্রবীভূত কার্বনেট গ্রহণ করছে এবং তা দিয়ে কোন কোনটি তাদের দেহের শক্ত খোলস গঠন করছে, আর তারা মরে গেলে তাদেরই দেহের শক্ত খোলস জমে জমে তৈরি হচ্ছে চুনা পাথর, বা ডলোমাইটের বিরাট বিরাট পাহাড় কিংবা শত শত মাইল বিস্তৃত এমনি পাথরের স্তর। কিন্তু সর্বপ্রধান যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারিত হয় এবং যার সূত্রে আমাদের ও অন্যান্য জীবের খাদ্য সংস্থান হয়, তা হলো উদ্ভিদের কার্বন আত্তীকরণ (Carbon assimilation) প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের কার্বন উদ্ভিদের দেহে সংগৃহীত হয় এবং অক্সিজেন মুক্তি পায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত কালে কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের যে সংযোগ ঘটে, তাই আবার এমনিভাবে বিযুক্ত হয় এবং অক্সি-জেন পুনরায় বাতাসে ফিরে আসে। গাছের পাতার রন্ধ্রে বাতাস যখন প্রবেশ করে, তখন সূর্যালোকের সংস্পর্শে এবং দেহস্থ পত্রহরিতের (Chlorophyl) সাহায্যে উদ্ভিদ বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করে জলের সংযোগে তার দেহে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সৃষ্টি ও সঞ্চয় করে। এসব উৎপাদিত দ্রব্য একদিকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যেমন যোগান দেয় ও তার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি অন্যদিকে সমস্ত প্রাণিজগতের জীবনধারণ উদ্ভিদের এই সব খাদ্যদ্রব্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল। কিন্তু এখানে একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এমনিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি স্থিতিশীল পদার্থ; অর্থাৎ এই যৌগিক পদার্থে কার্বন ও অক্সিজেনের সংযোগ সহজে ছিন্ন হয় না। ১২০০ থেকে ১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত উচ্চতাপেও কার্বন ডাইঅক্সাইড যৎসামান্যই বিশ্লিষ্ট হয় অথচ সবুজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণ তাপেই শুধু মাত্র সূর্যকিরণ ও পত্রহরিতের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে অতি সহজেই

বিশ্লিষ্ট করে কার্বন আত্মসাৎ করে। কি করে উদ্ভিদ যে এই অলৌকিক কার্য সমাধা করে, তা বিজ্ঞানীদের কাছে আজও অনেকটা অজানা। তবে ইদানীং এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কোন দিন এই বিস্ময়কর প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীরা যদি অনুধাবন করতে ও আয়ত্তাধীনে আনতে পারেন, তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে মানব-সমাজ আজ যে বিরাট খাদ্য-সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধান অতি সহজেই যে সাধিত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খাদ্যের জন্যে তখন আর মাঠে মাঠে আমাদের খাদ্যশস্যের চাষ করবার প্রয়োজন পড়বে না—ছোট্ট একটি বদ্ধ কক্ষেই যেমন আমরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে পারবো, তেমনি চাষের কাজে নিযুক্ত বিরাট ভূখণ্ডকে তখন অন্য কাজে নিয়োজিত করবার কোন প্রতিবন্ধকতাও আর থাকবে না।

কাজেই দেখা যায়, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সামান্য হলেও এর প্রয়োজন সামান্য নয়। বাতাসে এই স্বল্প পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতিই পৃথিবীতে প্রাণীর অস্তিত্বকে বজায় রাখতে সাহায্য করছে।

যাহোক, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা তাই এখন সহজেই বুঝতে পারছি যে, বাতাসে একদিকে নানাভাবে যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড সঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি নানা কারণে তা আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপসারিত হচ্ছে। কাজেই বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অনেকটা পরিমিত থাকে, বিশেষ বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের কখনও কোন বিপত্তি ঘটায় না।

সাধারণতঃ যাকে আমরা বিশুদ্ধ বায়ু বলি—তাতে আয়তনের অনুপাতে শতকরা ০.০৩ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। জনমানব-পূর্ণ কোন হল ঘরে এই পরিমাণ শতকরা ০.০৫ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের বৃদ্ধি তেমন ক্ষতিকারক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা শতকরা ৩ ভাগের বেশীতে না পৌঁছে। বৃদ্ধির পরিমাণ যদি কখনও এমনি দাঁড়ায়, তবে দারুণ মাথার যন্ত্রণায় কাতর হতে হয়। এর চেয়ে বেশী হলে শ্বাসকষ্ট তীব্র হয়ে ওঠে এবং কাজ করবার ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাস পায়। কিন্তু সে পরিমাণ যদি শতকরা ২৫ ভাগের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, তবে সে বাতাসে কোন প্রাণীর বাঁচবার আর আশাই থাকে না—শীঘ্রই তার মৃত্যু ঘটে।

যাহোক, পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রকৃতিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড অপসারণ করবার জন্যে নানা-বিধ বন্দোবস্ত রয়েছে, কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড যে সকল কারণে বাতাসে সঞ্চিত হয় কিংবা অপসারিত হয়, তা যে সব সময়ে অপরিবর্তিত থাকে, এমন নয়। যেমন—হঠাৎ করে হয়তো আগ্নেয়গিরির দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেড়ে গেল, অথবা আমরাই হয়তো এক সময়ে এত জ্বালানী দ্রব্য ব্যবহার করলাম যে, তার ফলে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে মিশ্রিত হলো, যা গাছপালা, জল প্রভৃতি তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পূর্ণ অপসারণ করতে পারলো না কিংবা কোন সময়ে আমরা হয়তো আমাদের প্রয়োজনে এত গাছপালা কাটা সুরু করলাম যে, গাছের সংখ্যা অনেক কমে গেল, যার ফলে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের অপসারণও ব্যাহত হলো। আর এমনিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাতাসে এই গ্যাসের পরিমাণ একেবারে অপরিবর্তিত থাকে না, সময়ে সময়ে সে পরিমাণের বাড়তি-কমতি ঘটে।

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি ভূপৃষ্ঠের গড়পড়তা তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড অদৃশ্য তাপ-রশ্মি শোষণ করতে পারে। দিনে সূর্যালোকে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়, কিন্তু পৃথিবী এই তাপ ধরে রাখতে পারে না,

বিকিরণ করে। রাত্রিতে সূর্যের তাপ আর পৃথিবী পায় না বলে দিনের বেলায় পৃথিবী যেটুকু উত্তপ্ত হয়, সে তাপ বিকিরণ করে ধীরে ধীরে আবার শীতল হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড এই বিকিরণজনিত তাপ শোষণ করতে পারে। কাজেই বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এই তাপ বেশী পরিমাণে শোষিত হবে, বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে তা আর শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারবে না—ফলে বায়ুমণ্ডলের সাধারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, ভূপৃষ্ঠও সেই তুলনায় উত্তপ্ত থাকবে—রাত্রিতেও পৃথিবী তেমন আর শীতল হয়ে পড়বে না। আর. হিনিয়াস নামক একজন বিজ্ঞানী হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, বায়ুমণ্ডলে যে শতকরা ০.০৩ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে, তা যদি সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া যায়, তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা এখনকার চেয়ে ২১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড কমে যাবে। তাপমাত্রা কমবার ফলে আবার আনুষঙ্গিক অন্য ব্যাপারও ঘটবে। বাতাসে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প এখন থাকে, তার পরিমাণও তখন কমে যাবে—কেন না, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাতাসের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল, গরম বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হয়, শীতল বাতাসে তা কমে যায়। কাজেই পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে গেলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাবে। এজন্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা আরও ২১ ডিগ্রীর মত কমে যাবে। ফলে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা দাঁড়াবে মেরু প্রদেশের মত, তুহীন শীতল এবং চির তুষারাবৃত। কিন্তু এই অবস্থা দাঁড়াবে বাতাসে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড একেবারেই না থাকে। তবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদি কোন কারণে অর্ধেক দাঁড়ায়, তাহলেও পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় ৪ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড কমে যাবে। অন্যদিকে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সাধারণের চেয়ে যদি দ্বিগুণ হয়, তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড বেড়ে যাবে আর যদি চতুগুণ হয়, তবে ৮ ডিগ্রী বৃদ্ধি পাবে।

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি শুধু যে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রার পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে তা নয়, উদ্ভিদের খোরাক এবং সেই সঙ্গে তার বৃদ্ধির হারও বর্ধিত করবে। গড্‌লয়েস্কী নামক এক বিজ্ঞানী কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে উদ্ভিদ কি হারে বর্ধিত হয়, সে সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখেন। পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, বাতাসে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ সাধারণের দ্বিগুণ হয়, তবে উদ্ভিদের আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার গতি সাধারণের চেয়ে তিন গুণ দ্রুত হয়। কাজেই বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি একদিকে যেমন উদ্ভিদের খাদ্য-সংশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে, তেমনি তাদের সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটাবে, তাদের দৈহিক বৃদ্ধিও দ্রুততর করবে। অবশ্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেশী বৃদ্ধি পেলে আবার উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। কাজেই কার্বনিফেরাস যুগে কেন যে পৃথিবী বিরাট বিরাট গাছপালার বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। সে যুগে পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির দৌরাত্ম্য ছিল অত্যধিক, ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র নয়, আর এই বাড়তি কার্বন ডাইঅক্সাইড পেয়ে গাছপালা তাদের কলেবর বৃদ্ধি করে তুলেছিল।

যাহোক, এতক্ষণ আমরা বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড কি করে আমাদের ও অন্যান্য জীবের জীবনধারণের উপকরণ যোগায় এবং প্রকৃতি কিভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কাজে লাগায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করলাম। কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া আমরাও নানা প্রয়োজনে কার্বন

ডাইঅক্সাইডকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। এখন সে সম্পর্কেই কিছু আলোচনা করা যাক।

পূর্বেই বলেছি, কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে দাহ্য নয়, আবার অন্য কোন দাহ্য বস্তুর দহনেও সাহায্য করে না। এজন্যে ছোটখাটো অগ্নি নির্বাপণের কাজে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রায়ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণ অবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে প্রায় সমায়তন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু চাপ বৃদ্ধি করলে জলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত চাপে অধিক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত করে বাতান্বিত জল, সোডা লেমনেড প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

জলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রাব্যতার প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাহাড়-পর্বতের শিলারাশি ক্ষয় করবার কাজে কার্বন ডাইঅক্সাইড যে অংশ-গ্রহণ করে, একথা পুর্বেই বলেছি। জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদি বেশী থাকে, তবে চক্, চুনাপাথর, মার্বেল প্রভৃতি কঠিন শিলার মধ্যেকার দ্রবণীয় অংশকে সহজেই দ্রবীভূত করে।

কার্বন ডাইঅক্সাইডকে −১০ ডিগ্রি ও −৮৭'৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যবর্তী তাপে চাপ প্রয়োগ করে তরল করা যেতে পারে। আবার কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করতে হলে নিম্ন তাপমাত্রায় তাকে তরল করা দরকার। কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড সাধারণতঃ ড্রাই আইস বা শুকনো বরফ নামে পরিচিত। শুকনো বরফ হিমায়ন পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের কাজে বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণ বরফের পরিবর্তে এই শুকনো বরফ ব্যবহারের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ যে পরিমাণ তাপ কোন এক নির্দিষ্ট পরিমাণ শুকনো বরফকে গলাতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণ শুকনো বরফকে গলাতে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ বরফ যত সহজে গলে যায়, শুকনো বরফ তত সহজে গলে না বা সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় না। দ্বিতীয়তঃ শুকনো বরফে অধিক পরিমাণ নিম্ন তাপমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব। তৃতীয়তঃ শুকনো বরফ সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়, বরফের মত ব্যবহারের পাত্রগুলি কিংবা আশে-পাশের জায়গাসমূহ জলসিক্ত করে তোলে না। এই জন্যেই একে বলা হয় শুকনো বরফ। বরফের সঙ্গে লবণ ব্যবহারের যেমন প্রয়োজন, শুকনো বরফে তার কোন প্রয়োজন নেই, যার ফলে সংরক্ষিত দ্রব্যের আধারগুলির কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় না।

তাছাড়া আরো অনেক কাজে শুকনো বরফ ব্যবহৃত হয়। লেবরেটরিতে হিমায়নের কাজে—যন্ত্রপাতির অংশ, বিশেষ করে উড়ো-জাহাজের রিভেট লাগাবার কাজে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। রিভেটগুলিকে শুকনো বরফে ঠাণ্ডা করলে সেগুলি কিছুটা সঙ্কুচিত হয়, ফলে সেগুলিকে সহজেই ছিদ্রপথে লাগানো যায়। কিন্তু পরে সাধারণ তাপমাত্রায় যখন পূর্বাকৃতি ফিরে পায়, তখন সংলগ্ন স্থানে তারা সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকে।

মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রেও কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহারের বিধান রয়েছে। হাসপাতালে, ব্লাড ব্যাঙ্কে সিরাম ও রক্ত হিমায়নের কাজে এবং সাধারণ হিমায়ন যন্ত্রে শুকনো বরফের ব্যবহার দেখা যায়। জীবনরক্ষী ছোট ছোট ডিঙ্গি বা বোট প্রয়োজনের মুহূর্তে কার্বন ডাইঅক্সাইডে ভরে জলে ভেসে থাকবার বন্দোবস্ত করতে শুকনো বরফ বেশ উপযোগী। তাছাড়া কৃত্রিম বৃষ্টি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও শুকনো বরফের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

কাজেই দেখা যায়, বাতাসে পরিমিত কার্বন ডাইঅক্সাইড যেমন আমাদের খাদ্য, তথা জীবন-রক্ষণের সহায়তা করে, তেমনি এর প্রাচুর্য আমাদের জীবন-সংহারও করতে পারে।

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## সবুজ পাতা ও খনিজ তেল থেকে প্রোটিন

বৃটেনে সাম্প্রতিক দুটি আবিষ্কারে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

প্রথম আবিষ্কারটি একটি যন্ত্র, যা সাধারণ সবুজ পাতা থেকে উচ্চমানের প্রোটিন তৈরি করতে পারে। এই যন্ত্র লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়েছে।

পৃথিবীর যে বিরাট জনসংখ্যা ধারাবাহিক অপুষ্টিতে ভুগে থাকে, এই আবিষ্কারে তার স্বল্প-ব্যয়ে সমাধান হতে পারে।

ইন্টারন্যাশান্যাল কংগ্রেস অব প্ল্যাণ্ট প্যাথোলজিতে প্রদর্শিত এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন বৃটিশ এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের রোদামস্টেড এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন। এই যন্ত্র পাতার তন্তু থেকে প্রথমে প্রোটিন-মিশ্রিত রস আলাদা করে ফেলে এবং তারপর তাথেকে ঘনীভূত ও পরিশোধিত করবার প্রক্রিয়ায় প্রোটিন বের করে নেয়।

প্রথমে ঘন সবুজ আকারের একটি বস্তু পাওয়া যায়। শুষ্ক অবস্থায় এতে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ প্রোটিন ও ২০ শতাংশ ফ্যাট থাকে। সামান্য পরিমাণে অম্লযুক্ত হলে তা পনিরের গুণ পায়।

টিনে ভরে বা বরফের মধ্যে রাখলে এই প্রোটিন দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

বৃটিশ পেট্রোলিয়াম (B. P.) ঘোষণা করেছেন যে, স্কটল্যাণ্ডের গ্র্যাঞ্জমাউথে কোম্পানির যে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি রয়েছে, সেখানে একটি তেল থেকে খাদ্য উৎপাদন প্ল্যাণ্ট স্থাপন করা হবে।

এই প্ল্যাণ্টের জন্যে ব্যয় হবে ৯০০,০০০ পাউণ্ড এবং এখানে কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে সাধারণ মোম তেল। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকেই এই পরিকল্পনা রূপ নেবে এবং বছরে ৪,০০০ টন প্রোটিন উৎপাদন করবে।

খনিজ তেল থেকে প্রোটিন খাদ্য উৎপাদনে পুরাপুরি ব্যবসায়িক পদ্ধতি প্রয়োগ প্রথম করলো বৃটিশ পেট্রোলিয়ম। গত নভেম্বরে ঘোষিত প্রথম প্ল্যাণ্টটি স্থাপিত হয়েছে ফ্রান্সে।

প্রথম প্রথম গ্র্যাঞ্জমাউথে উৎপন্ন প্রোটিন পশু-খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে ব্যবহৃত হবে, তবে মানুষের খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহারের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

## মাথাধরা রোগের নতুন চিকিৎসা

ইংলিশ মিডল্যাণ্ডসের কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মাথাধরা রোগের চিকিৎসাকে এক নতুন স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

স্টোক-অন-টেন্ট-এ অবস্থিত নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার রয়াল ইনফারমারির সহযোগিতায় কীল-এ উদ্ভাবিত নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি এক মাথাধরা (Migraine) রোগীর উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি রোগীদের উপকারে লাগবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করে বৃটেনের মিগ্রেন (Migraine) ট্রাষ্ট এই প্রকল্পে তাঁদের আস্থা প্রকাশ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডেভিড রেগান এই নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর পদ্ধতিতে মস্তিষ্কের ডান ও বাম অংশের সাড়ার পার্থক্য ধরা যায়। এটি একটি মূল্যবান উদ্ভাবন, কারণ Migraine রোগে শুধু মাথার এক দিক ধরে।

# বোম্বাইয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৬তম অধিবেশন

## মূল ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

### ডক্টর এ. সি. যোশী

মূল সভাপতি

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এই বছরের মূল সভাপতি ডাঃ অমরচাঁদ যোশী ১৯০৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোরের ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান এবং সরকারী কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৯৩০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স-এর সমগ্র স্নাতকোত্তর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় ম্যাকলাগান স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ডাঃ যোশী বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি পাঞ্জাব এডুকেশন্যাল সার্ভিসে সরকারী কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে এবং লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-তত্ত্বের গবেষণাগারের ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে তিনি হোসিয়ারপুরে সরকারী কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে তিনি জলন্ধরস্থিত শিক্ষকদের জন্যে সরকারী প্রশিক্ষণ কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশনে এবং পাঞ্জাব সরকারের সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই পদে তিনি বহাল ছিলেন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারেরী ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৬৫ সালের জুন পর্যন্ত চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উপাচার্য ছিলেন। বর্তমানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপদানে তাঁর দান অসামান্য।

১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে তিনি নয়াদিল্লীতে প্ল্যানিং কমিশনে শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালে তিনি ন্যাশান্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো। ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতীয় উদ্ভিদতাত্ত্বিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদ বিভাগের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সস-এর রৌপ্য জয়ন্তী অনুষ্ঠানে জীববিদ্যা বিভাগের সভাপতিত্ব করেন।

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ডাঃ যোশী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার রিসার্চ, ন্যাশান্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং, ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব সায়েন্স এডুকেশন; ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং প্রভৃতি সংস্থার তিনি সদস্য। বঙ্গীয় উদ্ভিদতাত্ত্বিক সমিতি এবং অল ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব টিচার এডুকেটরস-এর তিনি

অনারেরা সদস্য। ডাঃ যোশী অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বোর্ড অব দি ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশান অব ইউনিভার্সিটিজ, ইন্টারন্যাশন্যাল প্যানেল অব অ্যাডভাইসরস, সেন্টার ফর কালচার্যাল অ্যাণ্ড টেকনিক্যাল ইন্টারচেঞ্জ বিটুইন ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট ( হনলুলু ), কন্টিন্যুয়েশান কমিটি ফর দি ক্রিয়েশান অব অ্যান ইন্টারন্যাশান্যাল কমিটি ফর এডুকেশন্যাল এক্সচেঞ্জ এবং কাউন্সিল অব দি অ্যাসোসিয়েশন অব কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। ১৯৬৫ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনের তিনটি বিভাগের মধ্যে তিনি একটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সম্প্রতি সিডনীতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ অব অ্যাসোসিয়েশনের কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

সপুষ্পক উদ্ভিদের ভ্রূণতত্ত্ব এবং শারীরসংস্থান, ফুলের অঙ্গসংস্থান, সাইটোলজী ও প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত তাঁর প্রায় একশতটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বহু নিবন্ধ রচনা করেছেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকার তিনি সম্পাদক।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনে তিনি অগ্রণী ছিলেন এবং তদবধি তিনি এই সংস্থার সভাপতি আছেন। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞান শিক্ষার অনেক উন্নতি ও সংস্কার প্রবর্তনে এই সংস্থাই সুপারিশ করেছেন। অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনের সায়েন্স কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডাঃ যোশী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যাসমূহ বিবেচনা করবার জন্যে ১৯৫৬ সালে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত UNESCO-এর সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালের জন্যে সায়েন্স কমিটি অব দি ওয়ার্ল্ড কনফেডারেশন অব দি অর্গানাইজেশন অব দি টিচিং প্রোফেসন-এর তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন।

ডাঃ যোশীর কৃতিত্ব বহুমুখী। তাঁর ছাত্রগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্ভিদবিদ্যা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের অধ্যাপক পদে বৃত্ত আছেন।

## ডক্টর ব্রিজমোহন

### সভাপতি—গণিত বিভাগ

ডক্টর ব্রিজমোহন ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল মোরদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২৭ সালে উত্তর প্রদেশে বি. এ. ও বি. এস-সি পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করায় তিনি কল্প পদক লাভ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করায় কৃষ্ণাকুমারী স্বর্ণপদক পান। ১৯৩৩ সালে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৪ সাল থেকে ডাঃ ব্রিজমোহন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে লেক্‌চারার, পরে রিডার ছিলেন এবং এখন গণিত বিভাগের প্রধান প্রোফেসর হিসাবে নিযুক্ত আছেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬০ সাল থেকে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করছেন। ১৯৬৬-'৬৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোর্নিয়ার হাম্‌বোলৎ রাজ্য কলেজের ভিজিটিং প্রোফেসর ছিলেন।

ডাঃ ব্রিজমোহন ইংরেজী ও হিন্দীতে ৩৩ খানা পুস্তক রচনা করেছেন। গণিতের ইতিহাস ও গণিত বিষয়ক অভিধান তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম দুটি গ্রন্থ। গাণিতিক পরিভাষা, গণিতের ইতিহাস ও অ্যাডভান্সড্ ম্যাথামেটিক্স প্রভৃতি বিষয়ে ১১১ গবেষণা-পত্র, নিবন্ধ ইত্যাদি

তিনি রচনা করেছেন। তাঁর গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে থিয়োরী অব ফাংশনস্।- এপর্যন্ত তাঁর ১৫ জন ছাত্র বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছেন।

ডাঃ ব্রিজমোহন ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ ঘুরেছেন। তিনি সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগী।

## প্রোফেসর এ. আর. কামাত

সভাপতি—পরিসংখ্যান শাখা

প্রোঃ কামাত ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্র-জীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কলেজ এবং ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স ও পুণার ফার্গুসন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ফলিত গণিতে মাষ্টার ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি গাণিতিক পরিসংখ্যান বিষয়ে চর্চা সুরু করেন। তিনি এই বিষয়ে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি পান।

তিনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, ফার্গুসন কলেজ ও বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কলেজে প্রায় ৩০ বছর গণিত ও পরিসংখ্যান বিষয়ে শিক্ষাদানে রত ছিলেন। বর্তমানে তিনি পুণার গোখেল ইনষ্টিটিউট অব পলিটিক্স ও ইকনমিক্সের জয়েন্ট ডিরেক্টর ও প্রোফেসর

প্রোঃ কামাত ৪ খানা পুস্তক এবং ৬০-এরও বেশী গবেষণা-পত্র রচনা করেছেন। এই সব গবেষণা-পত্র দেশ ও বিদেশের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গাণিতিক পরিসংখ্যান ছাড়াও তিনি শিক্ষা ও গবেষণায়ও আগ্রহী। তিনি জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষন (NCERT) সংস্থার সদস্য। তিনি বহু বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘেও তিনি দু-বার কাজ করেছেন। দেশের নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কেও প্রোঃ কামাত সজাগ। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী কলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করেছিলেন।

## ডক্টর বি ভি থোসার

সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

ডক্টর থোসার বিদর্ভের (মহারাষ্ট্র) খাম-গাঁওতে ১৯১৩ সালে ৩রা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে বোম্বাইয়ের টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর পদার্থবিদ্যার প্রোফেসর এবং ফিজিক্স ফ্যাকাণ্টির ডীন। খামগাঁও ও নাগপুরে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৯ সালে এইচ. এস. সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং সংস্কৃত ও বিজ্ঞানে ডিষ্টিংশন লাভ করেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৫ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় এম. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেন। এম. এস-সি-তে তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল স্পেক্ট্রো-স্কোপী ও এক্স-রে।

ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে তিনি সার সি. ভি. রামনের অধীনে দেড় বছর রামন এফেক্ট, কেলাসের প্রতিপ্রভা সম্পর্কে গবেষণা করেন। নাগপুরের কলেজ অব সায়েন্সের পদার্থবিদ্যার লেক্‌চারার, পরে অ্যাসিষ্ট্যান্ট প্রোফেসর হিসাবে যোগদান করবার পরে তিনি পূর্বোক্ত বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যান। রুবির প্রতিপ্রভা সম্পর্কে প্রথম অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

ডাঃ থোসার ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বার্মিং-হাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গবেষণার জন্যে ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করেন। বিটা-রে স্পেক্ট্রোস্কোপী সম্পর্কিত গবেষণায় ১৯৪৯ সালে তিনি বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ডাঃ এইচ. জে. ভাবার আমন্ত্রণে তিনি টাটা

ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চে (বোম্বাই) রিডার হিসাবে যোগদান করেন এবং এখনও তিনি সেখানে প্রোফেসর এবং নিউক্লিয়ার স্পেক্ট্রোস্কোপী গ্রুপ-এর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত আছেন।

ডাঃ থোসার এই গ্রুপের কাজের পুনর্বিন্যাস করেছেন এবং এবিষয়ে ২০০টি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ডাঃ থোসার ১৯৫৮ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো নির্বাচিত হন। ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির তিনি ফেলো ছিলেন, সম্প্রতি তিনি উক্ত সংস্থার অন্যতম সহ-সভাপতি।

ডাঃ থোসার নানাদেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং ১৯৫৩ ও ১৯৬৮ সালে তিনি দু-বার কোপেনহেগেনের নীল্‌স্ বোর ইনষ্টিটিউটে 'ভিজিটিং সায়েণ্টিস্ট' ছিলেন। ক্যানাডার কিংস্টন (১৯৬০), ওয়ার-শ' (১৯৬৩), যুক্তরাষ্ট্রের নাসভিল (১৯৬৫), টোকিওতে (১৯৬৭) অনুষ্ঠিত পরমাণুর গঠন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে নাসভেলিতে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাল কনভার্সন কোএফিসিয়েণ্টস সম্পর্কিত আলোচনার পরিচালক প্যানেলের চারজন বিজ্ঞানীর মধ্যে তিনিও ছিলেন।

## প্রোফে. এস. এম. শেঠনা

### সভাপতি—রসায়ন শাখা

সুরেশ মঙ্গলদাস শেঠনা ১৯১৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারাডা নিউ হাই স্কুল, বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও পুণার এস. পি. কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রোফে. আর. সি. শাহ্-র অধীনে গবেষণা করবার জন্যে তিনি বোম্বাইয়ের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এ যোগদান করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম. এস-সি. (১৯৩৮) এবং পি-এইচ. ডি. (১৯৪০) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হোমেজি কারসেতজি ডাডি পুরস্কার (১৯৩৮) এবং আসবার্ণার পুরস্কার (১৯৪১) লাভ করেন।

প্রোফে. শেঠনা ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কলেজে কেমিষ্ট্রির ডেমনষ্ট্রেটর ছিলেন এবং ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বোম্বাইয়ের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের অ্যাসিষ্টাণ্ট লেক্‌চারার হিসাবে কাজ করেন। তিনি ১৯৫১ সালে বরোদার এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নের রীডার হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রোফেসর এবং বিভাগীয় প্রধানরূপে নিযুক্ত হন। সাধারণ শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা দলের সদস্য হিসাবে তিনি ১৯৫৬ সালে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

জৈব রসায়নের সংশ্লেষণ শাখায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। এই শাখায় তিনি বহু মৌলিক গবেষণা করেছেন।

প্রোফে. শেঠনা বৈজ্ঞানিক শিক্ষাবিস্তারেও আগ্রহী। এজন্যে তিনি হিন্দী ও গুজরাটিতে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৫৩ সালের অধিবেশনে তিনি রসায়ন বিভাগের রেকর্ডার ছিলেন।

## প্রোফে. আর. সি. মিশ্র

### সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

প্রোফে. রমেশচন্দ্র মিশ্র ১৯১৩ সালের ৮ই জানুয়ারী নৈনীতাল জেলার মুক্তেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কানপুরের ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ এবং বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে তিনি উত্তর প্রদেশ সরকারের খনিজ সমীক্ষার কাজ করেন। তিনি মার্বেল গ্লাস স্যাণ্ড, পাইরাইট, পাইরোফাইলাইট ডিপোজিট প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। রিহান্দ বাঁধে অ্যালুমিনিয়াম প্ল্যাণ্ট এবং মির্জাপুর জেলায় সিমেণ্ট কারখানা এবং অন্যান্য খনিজ শিল্প উত্তর প্রদেশে প্রবর্তনের প্রথম প্রস্তাবকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্‌চারার হিসাবে কাজ করবার পর তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চেয়ার অব জিওলোজি'তে অধিষ্ঠিত হন। প্রোফে. মিশ্র কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলের সঙ্গে সুপরিচিত। বুন্দেলখণ্ডের ভূতত্ত্ব, বিন্ধ্যায়নের গঠন এবং হিমালয় সম্পর্কেই তিনি বিশেষ গবেষণা করেছেন। এই সব বিষয়ে গবেষণা করে তাঁর অনেক ছাত্র ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন।

কর্মাধ্যক্ষ বা সদস্য হিসাবে প্রোফে. মিশ্র অনেক ভূতাত্ত্বিক ও খনিজতত্ত্ব সম্পর্কিত সমিতির সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আর্থ সায়েন্সেস প্যানেল, হিমালয়ান জিওলজি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এবং এর এক্সিকিউটিভ অ্যাণ্ড রিসার্চ প্ল্যানিং কমিটির সদস্য।

## প্রোফে. এইচ কে. বড়ুয়া

### সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

প্রোফে. হিতেন্দ্রকুমার বড়ুয়া ১৯১৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী আসামের ডিব্রুগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে ডিষ্টিংশনসহ ডিব্রুগড় গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে বি. এস-সি পরীক্ষায় অনার্সসহ প্রথম স্থান অধিকার করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩৮ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানী স্কুলে যোগদান করেন। তিনি প্রোফে. এফ. টি. ব্রুক্‌স্‌ এফ-আর-এস ও ডাঃ আর. জি. টমকিন্‌স্‌-এর অধীনে নেবু, আপেল প্রভৃতি ফলের রোগ সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রোফে. এনগ্লেডাউ এফ-আর-এস এবং পরলোকগত ডাঃ জে. উইশার্ট-এর অধীনে অল্প সময়ের জন্যে কৃষি বিষয়ে গবেষণা করেন। কেম্ব্রিজ ফিলোজফিক্যাল সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যাপ্লায়েড বায়োলজিষ্ট এবং বৃটিশ মাইকোলজিক্যাল সোসাইটির তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন এবং সেখানে মাইক্রোবায়োলজি শাখা সংগঠন করে সংশ্লিষ্ট বহু নূতন বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তারপর তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক এবং উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। এখনও তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

তিনি কেন্দ্রীয় জীববিদ্যা উপদেষ্টা পর্ষৎ ও ইউ. জি. সি. ভিজিটিং কমিটির সদস্য। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু বিশেষজ্ঞ সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স-এর ডীন ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং সায়েন্স জার্নাল সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রকাশন বিভাগের উপদেষ্টা পর্ষৎ-এর চেয়ারম্যান।

ভারতে ও বিদেশে তাঁর ১০০-এর বেশী মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'লেব-

রেটরী ম্যানুয়াল অব বটানী সায়েন্স অ্যাণ্ড সায়েন্টিষ্ট' গ্রন্থের তিনি রচয়িতা এবং তাঁর আর একটি গ্রন্থ 'অ্যানালিসিস অব মাইক্রোবায়ো-প্যাথোজেনেসিটি' যন্ত্রস্থ।

কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে তিনি ১৯৫৬-৫৭ সালে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে ইউরোপ পরিদর্শন করেন। ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রেও গিয়েছিলেন।

## ডক্টর বিমলেশ্বর দে

সভাপতি—মনোবিদ্যা ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখা

শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে ডাঃ বিমলেশ্বর দের খ্যাতি সুবিদিত। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও বি-এল এবং লণ্ডন থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৪৩ সালে তিনি অস্থায়ী লেক্‌চারার হিসাবে পাটনা কলেজে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে পাটনা কলেজে এম. এ. পর্যন্ত শিক্ষা দেবার জন্যে মনোবিদ্যা বিভাগ স্থাপিত হয় এবং ডাঃ দে ১৯৪৭ সালে পাটনা কলেজে স্থায়ী হন। ১৯৫৫ সালে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মজঃফরপুরের এল. এস. কলেজে নবগঠিত বিশ্ব-বিদ্যালয় মনোবিদ্যা শাখার প্রধান হিসাবে তিনি যোগ দেন। ছয় বছর পর বিহার রাজ্য সরকার তাঁকে পাটনাস্থিত এডুকেশনাল ও ভোকেশন্যাল গাইড্যান্স ব্যুরোর ডিরেক্টর নিযুক্ত করেন। গত বছর তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ-এর ডিরেক্টর হন। এছাড়াও তিনি ষ্টেট গাইডান্স বুরোর ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন।

গবেষণায় ডাঃ দে বরাবরই উৎসাহী। লণ্ডনে থাকাকালীন ওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েশন টেষ্ট সম্পর্কে তাঁর গবেষণা প্রশংসা লাভ করে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ এইচ. জে. আইসেনক্ ডাঃ দের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বহু রিসার্চ প্রোজেক্টে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশ ও বিদেশে তাঁর বহু গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অধীনে গবেষণা করে অনেকেই পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি NCERT-এর অধীনে বৃত্তিগত অনুরাগের জাতীয় মানদণ্ড গঠনের জন্যে কো-অপারেটিভ টেষ্ট ডেভে-লপমেণ্ট প্রোজেক্টে যে কাজ চলছে, তার পাটনা কেন্দ্রের অনারেরী ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক পূর্ব অধিবেশনে ডাঃ দে তিন বছরের জন্যে মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার রেকর্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি অল ইণ্ডিয়া এডুকেশনাল ও ভোকেশন্যাল গাইড্যান্স অ্যাসো-সিয়েশন এবং বিহার সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি।

## প্রোফে. এইচ. সি. গুহ

সভাপতি—ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

প্রোফে. গুহ ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ( ইউ. কে. ) থেকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ গ্রাজুয়েট হন। গ্লাসগোতে দেড় বছর হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করবার পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্‌নোলজিতে ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অ্যাসিষ্টাণ্ট প্রোফেসর হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রোফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৪৪ সালে ইলেক-ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি যোগদান করেন। ১৯৬০ সালের ১৭ই ফেব্রু-য়ারী থেকে ১৯৬৪ সালের ৫ই জুন পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনীয়ারিং-এর তিনি ডীন ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১লা অগাষ্ট তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন।

প্রোফেঃ গুহ ইনষ্টিটিউশান অব ইঞ্জিনীয়ারের

(ইণ্ডিয়া) সদস্য। ১৯৬০-'৬১ সালে তিনি ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স-এর (বাংলা কেন্দ্র) চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি কাউন্সিল অব দি ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স-এর সদস্য এবং ইনষ্টিটিউশন অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স-এর (লণ্ডন) বৈদেশিক শাখার সভাপতি। তিনি ইনষ্টিটিউশন অব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স (লণ্ডন) এবং ইলুমিনেশন ইঞ্জিনীয়ারিং সোসাইটির সদস্য, আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স-এর সিনিয়র মেম্বার।

এছাড়াও তিনি রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য, উড়িষ্যার রৌরকেলার রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, আসামের শিলচর রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গভর্ণিং বোর্ডের সদস্য এবং কলকাতার আচার্য পি. সি. রায় পলিটেকনিক-এর সহ-সভাপতি এবং কলকাতার স্কুল অব প্রিন্টিং টেক্‌নোলজির গভর্ণিং বডির সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং সেন্ট্রাল ক্যালকাটা পলিটেকনিক-এর সভাপতি।

১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রোফেঃ গুহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর সদস্য ছিলেন। তিনি ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোরের অনারেরি কর্নেল কম্যাণ্ড্যান্ট।

## ডক্টর পি. ব্রহ্ম্য শাস্ত্রী

### সভাপতি—শারীরবিদ্যা শাখা

ডাঃ পোড়িলা ব্রহ্ম্য শাস্ত্রী ১৯১৩ সালের ২৪শে মে অন্ধ্র প্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার কাকিনাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩২ সালে বিশাখাপট্টমের অন্ধ্র মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৩৭ সালে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৮ সালে স্থানীয় কিং জর্জ হাসপাতালে হাউস সার্জেন হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে মেডিক্যাল কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের ডেমনষ্ট্রেটর হিসাবে যোগদান করেন। ২৯ বছরেরও বেশী তিনি অন্ধ্র মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে জড়িত আছেন। তন্মধ্যে ১৯৩৯-'৪৪ পর্যন্ত ডেমনষ্ট্রেটর, ১৯৪৫-'৫১ পর্যন্ত শিক্ষক এবং ১৯৫১ সালে তিনি শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও প্রোফেসর হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ইনষ্টিটিউট অব বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর অফিসার-ইন-চার্জ (১৯৬১ সাল থেকে), পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন-এর ভাইস প্রিন্সিপাল (১৯৬৪ সাল থেকে), প্রিন্সিপাল ও চেয়ারম্যান (১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে) হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার পরীক্ষক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল তাঁকে এম. ডি. পরীক্ষায় শারীরবিদ্যায় ইন্সপেক্টর নিয়োগ করেন।

১৯৪০ সালে ডাঃ সুব্বা রেড্ডির অধীনে তিনি ভিটামিন-সি-এর পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ক্যানাডায় যান (১৯৫৩-৫৭)। সেখানে তিনি ডাঃ এফ. সি. ম্যাকিনটোস-এর অধীনে কাজ করেন। ব্রেন সারফেস থেকে ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল রেকর্ডিং সম্পর্কে তিনি ডাঃ বি. ডি. বার্নসের কাছ থেকে ট্রেনিং লাভ করেন এবং ডাঃ বি. গ্রাফষ্টিনের সঙ্গে গবেষণা করেন। ১৯৫৬ সালে মন্ট্রিলের ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ক্যানাডীয় ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর বিভাগে গবেষণার ধারা বজায় রাখবার জন্যে এবং তাঁর নবীন সহকর্মীদের গবেষণার ক্ষেত্রে ট্রেনিং দেবার জন্যে কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তাঁর নির্দেশনায় কাজ করে অনেকে পি-এইচ. ডি, এম. ডি. প্রভৃতি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

তাঁর কয়েকটি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে আই. সি. এম. আর.-এর ( ১৯৬১-৬৭ ) শারীর-বিদ্যার বিশেষজ্ঞমণ্ডলী বা উপদেষ্টামণ্ডলীর তিনি চেয়ারম্যান বা সদস্য এবং ইণ্ডিয়ান ব্রেন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ( ১৯৬৫-৬৭ ) ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি নয়া দিল্লীর অ্যাকাডেমি অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্রেন রিসার্চ অর্গানাইজেশন (IBRO) সেমিনারে ( কর্মশালা ) এবং ১৯৬৫ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শারীরবিদ্যা কংগ্রেসে তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি কর্তৃক তিনি তিন বছরের ( ১৯৬৪-৬৭ ) জন্যে নয়া দিল্লীর ICMR-এর গভর্ণিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি সম্প্রতি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করছেন এবং পাঁচ বছরের জন্যে তাঁর এমেরিটাস মেডিক্যাল সায়েন্টিস্ট হিসাবে বর্তমান বিভাগে কাজ করবার কথা। এই পদে ICMR তাঁকে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন। ডাঃ শাস্ত্রী সঙ্গীতের প্রতি, বিশেষতঃ কর্ণাটক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অনুরাগী।

## প্রোফে. ডি. পি. বসু

### সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

প্রোফে. ডি. পি. বসু বর্তমানে কলকাতার সার এন. আর. সরকার মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান এবং মেডিসিনের প্রোফেসর ডিরেক্টর। স্কটিশচার্চ স্কুল এবং কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি ১৯৫২ সালে এম. আর. সি. পি. এবং ১৯৫৬ সালে এফ. আর. সি. পি. ডিগ্রি লাভ করেন। রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান-এর ( এডিনবরা ) তিনি সর্বকনিষ্ঠ এশীয় সদস্য ছিলেন।

করোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিজ সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি ১৯৫১ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কার্ডিওলোজি কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন এবং অক্সফোর্ড, প্যারিস, ইজরেইল এবং অন্যান্য দেশে কার্ডিও-ভাসকুলার রোগ সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার জন্যে আমন্ত্রিত হন।

কার্ডিও-ভাসকুলার রোগ সম্পর্কে তিনি অনেক মৌলিক নিবন্ধ লিখেছেন। ভারত ও বিদেশের বহু হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেছেন।

## প্রোফে. ইউ. এন. চাটার্জী

### সভাপতি—কৃষি শাখা

প্রোফে. চাটার্জী এলাহাবাদের ইউইং ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের ফলে তাঁকে কয়েক বছরের জন্যে গবেষণা বৃত্তি দেওয়া হয়। এই সময়ে তিনি উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্বের নানা বিষয়ে গবেষণা করেন।

আগ্রা ও মীরাট কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করবার পর নয়া দিল্লীস্থ ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদে যোগদান করেন। ইণ্ডিয়ান ফার্মিং, ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব এগ্রিকালচার‍্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ভেটারিনারি সায়েন্স প্রভৃতি এবং কৃষি-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বুলেটিন, মনোগ্রাফ ও পুস্তকাদি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রোফে. চাটার্জী যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার প্রোফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি নবগঠিত স্নাতকোত্তর উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শিক্ষাদান ও গবেষণা কর্মসূচীর উন্নতি

সাধন করেন এবং উদ্ভিদতাত্ত্বিক ও উদ্ভিদ জৈব রাসায়নিক গবেষণার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণার জন্যে লেবরেটরী স্থাপন করেন। সেখানে বীজ সম্পর্কিত গবেষণায় তিনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। এই সম্পর্কে গবেষণা করে অনেক ছাত্র ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং সীড ফিজিওলজি ও অঙ্কুরোদ্গম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গবেষণা-পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। দেশ ও বিদেশের বহু সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রোফে. চাটার্জীর প্রায় ১০০টি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি অ্যাড-ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স, রয়েল সোসাইটি অব আর্টস (লণ্ডন) এবং ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার তিনি ফেলো। এছাড়াও তিনি দেশ ও বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য। তিনি ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর ৩৫তম অধিবেশনের জীববিদ্যা শাখার সভাপতি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদবিদ্যা শাখার রেকর্ডার ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে ভিজিটিং প্রোফেসার হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

প্রোফে. চাটার্জী কৃতি শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর ছাত্রদের উন্নতির চেষ্টা করেন। প্রোফে. চাটার্জী যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের প্রথম ডীন, অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা ছিলেন।

### প্রোফে. জি. কে. মান্না

#### সভাপতি—প্রাণী ও কীটতত্ত্ব শাখা

প্রোফে. জি. কে. মান্না ১৯২৬ সালের ১০ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মুলটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ছাত্র-জীবন বরাবরই গৌরবময়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রোফে. এস. পি. রায়চৌধুরীর অধীনে সাইটোলজি অব হেটারোপ্‌টেরা সম্বন্ধে থিসিস লিখে ১৯৫২ সালে ডি. ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। হিউম্যান ক্যান্সার সাইটোলজি সম্পর্কে কাজ করে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ঐ কাজ সম্পন্ন করে মাউণ্ট স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রোফে. মান্না ১৯৪৮ সালে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাইটোজেনেটিক্স লেবরেটরীতে তাঁর গবেষণা-জীবন সুরু করেন। তিনি চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের অনারেরী সাইটোলজিষ্ট। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোরূপে তিনি হোক্কাইডো বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভিজিটিং সায়েণ্টিষ্ট, ক্যানাডার কৃষি-বিভাগের ফরেষ্ট ইনসেক্ট লেবরেটরীতে ক্যানাডার ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের পোষ্ট ডক্টরেট ফেলো এবং টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. অ্যাণ্ডারসন হাসপাতালে ভিজিটিং রিসার্চ সায়েণ্টিষ্ট হিসাবে ছিলেন।

দেশ ও বিদেশে তাঁর ১০০টি গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশ-ন্যাল ইনষ্টিটিউট অব জেনেটিক্স, মি বিশ্ববিদ্যালয়, নারা মেডিক্যাল কলেজ (জাপান), যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো, উইসকন্‌সিন ও টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, ইটালীর মিলান বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যানাডা এবং আরও নানা বৈদেশিক সংস্থায় তিনি তাঁর গবেষণা কাজের বিষয় বক্তৃতা দিয়েছেন।

সাইটোজেনেটিক্সের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্যেই প্রোফে. মান্না আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর অধীনে গবেষণা করে অনেক ছাত্র পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছেন।

১৯৫৬ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশন্যাল জেনেটিক্স সিম্পোজিয়ামের তিনি বিভাগীয় সভাপতি ছিলেন। এই বছরেই ক্যানাডায় অনুষ্ঠিত দশম আন্তর্জাতিক পতঙ্গতত্ত্ব সম্মেলনে তিনি বিশেষ বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে ক্যানাডায় অনুষ্ঠিত দশম আন্তর্জাতিক জেনেটিক্স কংগ্রেসে এবং ১৯৫৯ সালে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিক্স অব ক্যান্সার সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত জেনেটিক্সের ১২শ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সাইটোজেনেটিক্স শাখার চেয়ারম্যান হিসাবে এবং হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হিউম্যান ক্রোমোজোম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্যে অমন্ত্রিত হন।

প্রোফে. মান্না ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে লেক্‌চারার ছিলেন, তারপর তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যার রীডার নিযুক্ত হন। তিনি বর্তমানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রোফেসর এবং ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন।

## ডক্টর ইন্দেরা পল সিং

### সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

১৯২৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ ইন্দেরা পল সিং অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃতত্ত্বে এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে তিনি পশ্চিম জার্মেনীর ফ্রাঙ্কফুর্টে নৃতত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। ১৯৫৯ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই প্রথম 'ইনহেরিট্যান্স অব ফিঙ্গারবল প্যাটার্ন' শীর্ষক থিসিস পেশ করে নৃতত্ত্বে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫৩ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৬১ সাল থেকে রীডার হন। ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অস্থায়ী প্রধান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। শিক্ষাদান ও গবেষণা-কার্য ছাড়াও তিনি দিল্লী রাজ্যের 'এক্সক্রিমিনাল ট্রাইব্‌স্' ও পরিকল্পনা কমিশনের লাডাক গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি নৃতত্ত্বে ইউ. জি. সি. রিভিউ কমিটির সেক্রেটারী।

উত্তর-পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল—সিমলা পাহাড়, কুলু, মানালি, ছাম্বা, ধরমশালা, ডালহৌসী, জম্মু ও কাশ্মীর, লাডাক এবং পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী—এই সব জায়গায় ডাঃ সিং বিস্তৃত অনুসন্ধান কাজ চালিয়েছেন। এই অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু ছিল জাতিতত্ত্ব ও সংস্কৃতি এবং মানুষের বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্পর্কিত। তিনি অ্যান্‌থ্রোপোমেট্রি, ডারমাটোগ্রাইফিক্স, মানবের বৃদ্ধি ও উন্নতি এবং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বিশেষ গুণসমূহ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কে গবেষণা করেন। দেশে-বিদেশে তাঁর মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিদ্যার্থী ও মাথুরের সহযোগিতায় 'মানব শাস্ত্রী কি রূপ-রেখা' এবং ভাসিনের সঙ্গে 'অ্যানথ্রোপোমেট্রি' পুস্তক রচনা করেছেন।

কারেন্ট অ্যান্‌থ্রোপোলজি স্থাপনাবধি ডাঃ সিং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার রেকর্ডার ছিলেন।

# কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৯

২২শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা
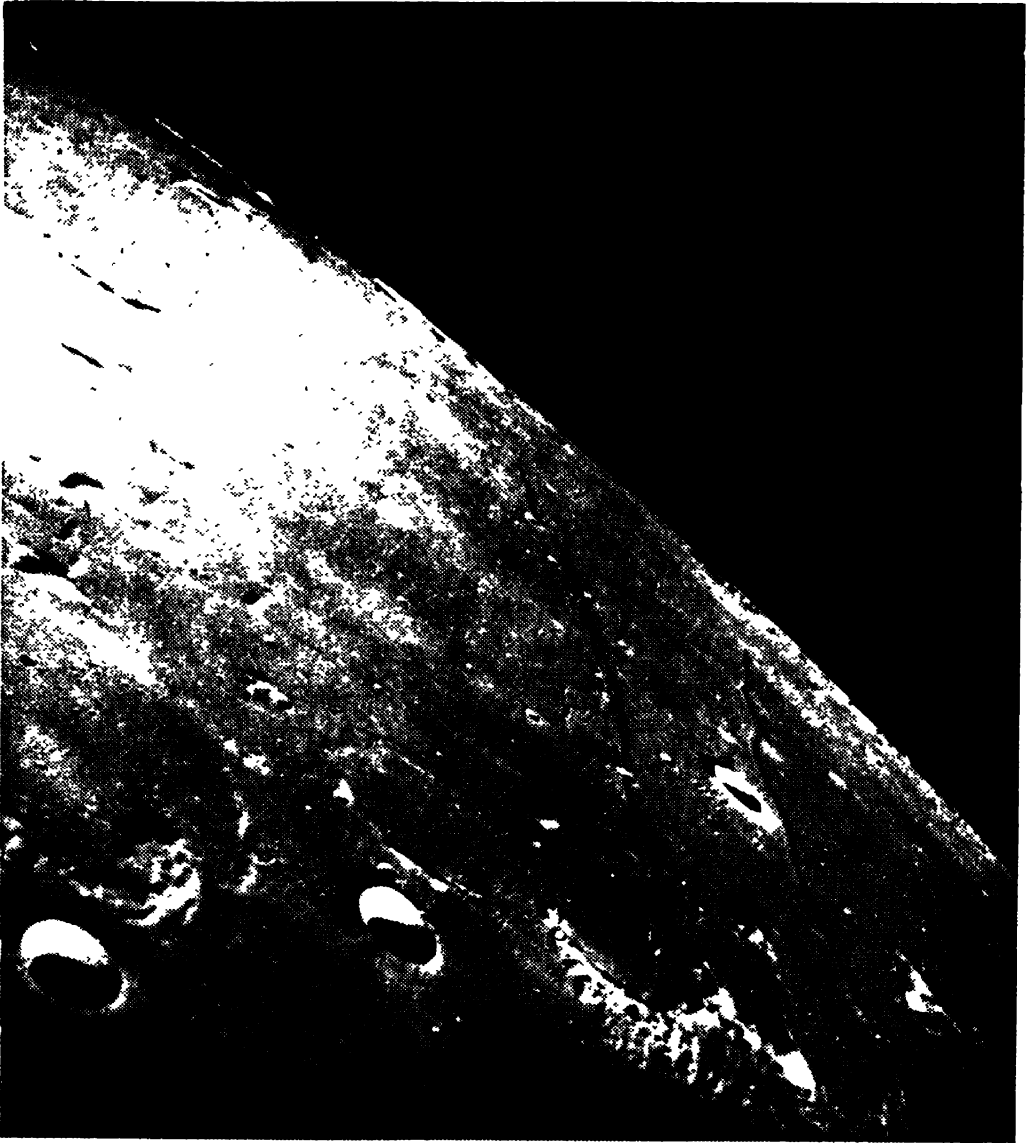
**সী অব ট্র্যাঙ্কুইলিটি** :—অ্যাপোলো-৮ মহাকাশযান থেকে গৃহীত চন্দ্রের সী অব ট্র্যাঙ্কুইলিটি বা নিথর সমুদ্রের এই আলোকচিত্রে রয়েছে কাউচি স্কার্প নামক পরিখা আর পশ্চাদপটে নালা প্রভৃতি। এগুলির মাঝে রয়েছে কাউচি ক্রেটার নামক বিরাট গহ্বর। এই চিত্রটি নিথর সমুদ্রের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের।

# ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

শব্দের সঙ্গে তোমরা সবাই পরিচিত, কিন্তু শব্দ কেমন করে সৃষ্টি হয় জান? কোন বস্তুকে আঘাত করলে বস্তুর স্থিতিস্থাপকতার জন্যে তাতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। সেই কম্পন বাতাসের মাধ্যমে কানে প্রবেশ করে যে অনুভূতি জাগায়, আমরা তাকে বলি শব্দ। এই শব্দকে ভালভাবে বুঝতে হলে কতকগুলি প্রাথমিক জিনিষ জানা প্রয়োজন, যেমন—স্পন্দন (Vibration), কম্পাঙ্ক (Frequency), তীক্ষ্ণতা (Pitch), স্বরগ্রামের উচ্চতা (Loudness) এবং প্রাবল্য (Intensity) ইত্যাদি। এগুলি শব্দের উৎপত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেন না, বস্তুর কম্পন কানে যে অনুভূতি জাগায়, তাকে বলা হয় শব্দ, একথা আগেই বলেছি। এই কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে কতবার হয়, তার সংখ্যার পরিমাপ হলো কম্পাঙ্ক। আর এই কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল শব্দের যে অনুভূতি, তা হলো তীক্ষ্ণতা বা Pitch। কাজেই কম্পাঙ্ক যদি বেশী হয়, তবে শব্দ খুব তীক্ষ্ণ হয়। আবার অন্যদিকে কম্পাঙ্ক যদি অল্প হয়, তবে শব্দ গম্ভীর হয়। কারণ শব্দের তীক্ষ্ণতা তখন কম। এগুলি ছাড়া শব্দের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য আছে, তা হলো স্বরগ্রামের উচ্চতা এবং প্রাবল্য। এই দুটি জিনিষই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। জোর তার প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে। শব্দের প্রাবল্য যত বেশী হবে, তত জোর শব্দ হবে। এটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে প্রথমে জানতে হবে, শব্দ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, শব্দ পরিচালিত হবার একটি মাধ্যম হলো বাতাস। বিশ্বের যা কিছু আওয়াজ তোমার কানে এসে লাগছে, তা এই বাতাসের মধ্য দিয়ে। বাতাস ছাড়া শব্দের প্রসারের জন্যে আরও অনেক মাধ্যম আছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমই শব্দ বহনের উপযোগী। তবে তার মধ্যে কঠিন মাধ্যমই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। এরপর হলো তরল এবং তারপর গ্যাস। এদের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে ষ্টীলের শব্দবহনের ক্ষমতা বাতাস অপেক্ষা ১৫ গুণ বেশী; অর্থাৎ 0°C সে. তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের গতি যদি প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯০ ফুট হয়, তবে জলের মধ্যে শব্দের গতি হবে ৪৫০০ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে এবং ষ্টীলের মধ্যে সেই গতি হবে প্রতি সেকেণ্ডে ১৫৪০০ ফুট।

বাতাসের মধ্যে শব্দ কেমন করে যায়, তা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করে। ধর, একটি সেতারের তারে তুমি মৃদু আঘাত করলে। এই আঘাতের ফলে শুধু সেই তারটি কাঁপলো না, সেই সঙ্গে তার কাছের বাতাসে তরঙ্গ তুললো। এখন কথা হচ্ছে এই যে, বাতাসের তরঙ্গ শব্দ-তরঙ্গের চাপে কোন জায়গায় খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেল আবার কোন

জায়গায় বেশ প্রসারিত হলো। বাতাসের এই মৃদু সঙ্কোচন এবং প্রসারণ-ক্রিয়ার সাহায্যে শব্দটি কানের পর্দায় এসে আঘাত করলো এবং তখনই আমরা শুনতে পেলাম সেতারের আওয়াজ। যদি এই আঘাত খুব জোরে হতো, তবে ঐ সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়াটি খুব শক্তিশালী হতো, আর তার আওয়াজও আমরা বেশ জোরেই শুনতে পেতাম। অবশ্য এটা ঠিক, আওয়াজ কম বা বেশী হওয়া পুরাপুরি উপরিউক্ত কারণের উপর নির্ভর করে না। বেশ কিছুটা নির্ভর করে মাধ্যমের উপর। যদি এমন কোন মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, যা শব্দের পক্ষে বাতাস অপেক্ষাও সুপরিবাহী, তাহলে আওয়াজের মাত্রা আরও বেশী হবে। শব্দের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার গুণগত পার্থক্য বা যাকে বলে Quality বা Tone। এই Tone-এর জন্যে দুটি শব্দের মধ্যে আমরা পার্থক্য ধরতে পারি। তাই তোমার গলার শব্দ আর আমার গলার শব্দ এক নয়, এটা স্পষ্ট বুঝতে পারি Overtone-এর সাহায্যে। প্রকৃতপক্ষে একটি তারের যন্ত্রে আঘাত করলে একটি মাত্র কম্পনযুক্ত শব্দ শোনা যায় না, অনেকগুলি কম্পন অনুভূত হয়। এদের মধ্যে যে কম্পনটি সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়, তাকে বলে প্রাথমিক কম্পন ( Fundamental frequency )। আর একই সময়ে অনুভূত বাকী কম্পনগুলিকে বলা হয় Overtone। প্রসঙ্গতঃ আওয়াজের কম-বেশী হওয়া কেবলমাত্র শব্দ-তরঙ্গের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে না, কম্পিত বস্তুর প্রসারের উপরও বেশ কিছুটা নির্ভর করে। ধরা যাক, একটি বেহালার তারে মৃদু আঘাত করা হলো—কিন্তু আওয়াজ বেশ জোর শোনা গেল। কেন এমন হলো? তারের আঘাতে বাতাসের কিছুটা অংশ কম্পিত হলো। কিন্তু তার আওয়াজ তো খুব অল্প। তবে জোর আওয়াজ শোনা গেল কেন? কেন না, বেহালার তারটি কাঁপার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে আটকানো চওড়া কাঠের বোর্ডটিও কাঁপতে লাগলো সমানভাবে। ফলে আরও বেশী পরিমাণ বাতাসে আন্দোলন সৃষ্টি হলো। আমাদের কানেও তার আওয়াজ বেশ জোর শোনা গেল। এখন বেহালার তারটির যে কম্পন বোর্ডের মধ্যে সঞ্চারিত হলো, তাকে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বললেন আরোপিত কম্পন বা Forced vibration এবং তারের নিজস্ব কম্পনটির নাম দিলেন স্বাভাবিক কম্পন বা Natural frequency। এখন এই স্বাভাবিক কম্পনের সঙ্গে শব্দের সহানুভূতি সূচক কম্পনের (Sympathetic vibration) নিবিড় যোগসূত্র আছে। কেন না, কোন উৎস থেকে আসা শব্দ-তরঙ্গ যখন অন্য কোন বস্তুকে এমনিভাবে কম্পিত করে, যার ফলে কম্পনের হার উভয় ক্ষেত্রেই সমান থাকে, তখন দ্বিতীয় বস্তুটির শব্দকে সহানুভূতিসূচক শব্দ বলে এবং উভয় বস্তুর এই কম্পনের সাম্যাবস্থাকে অনুনাদ (Resonance) বলা হয়। আর একটি কথা বলে শব্দের বৈশিষ্ট্যের কথা শেষ করবো—তাহলো অধিকম্প বা Beat। তোমরা নিশ্চয়ই সাইরেনের আওয়াজ শুনেছ। কোন সময় আওয়াজ খুব তীব্র হয়, আবার কোন সময় নরম হয়। এই যে কম্পাঙ্কের

দ্রুত পরিবর্তন অর্থাৎ বেশী এবং কম হওয়া—এরই নাম অধিকম্প। এর ফলে বায়ুর প্রসারণ এবং সঙ্কোচন একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। সেই জন্যে একটি অপরটিকে প্রভাবমুক্ত করে।

আগেই শব্দের গুণাগুণের কয়েকটি কথা বলেছি। শব্দের আর একটি গুণের কথা আলোচনা করবো। এই গুণটি Doppler's effect নামে পরিচিত। শব্দের তীক্ষ্ণতা কেবলমাত্র কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে না, বস্তুর গতি এবং শ্রোতার অবস্থানের উপরও নির্ভর করে। ধরা যাক, তুমি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছ—এই সময় একটি রেলগাড়ী সেই প্ল্যাটফর্মে বাঁশী বাজাতে বাজাতে প্রবেশ করছে। তোমার মনে হবে, তার বাঁশীর আওয়াজের তীক্ষ্ণতা ক্রমশঃ বাড়ছে আর গাড়ীটা তোমাকে অতিক্রম করে যতই এগিয়ে যাবে, তীক্ষ্ণতা ক্রমশঃ ততই কমতে থাকবে।

এবার দেখা যাক, এই শব্দ-তরঙ্গ যখন কোন রকমে বাধা পায়, তখন কি অবস্থা হয়? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শব্দ-তরঙ্গ বাধা পাওয়ার ফলে শক্তির কিছুটা অংশ বাধাপ্রাপ্ত বস্তুটিকে মাধ্যম করে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাকী অংশটুকু প্রতিফলিত হয়—ঠিক যেমন আয়নার উপর আলো পড়লে হয়। তেমনি বড় খালি ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে শব্দ করলে বা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করলে কিছুক্ষণ পরে সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি শুনতে পাও—মনে হয় যেন কেউ তোমার স্বর নকল করে ব্যঙ্গ করছে। এই যে ধ্বনির পুনরাবৃত্তি, একে বলে প্রতিধ্বনি। প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করবার জন্যে গাছের সারি, বড় বাড়ীর দেয়াল, পাহাড়ের গা প্রতিফলক হিসাবে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো খোলা জায়গার প্রতিধ্বনি এবং সর্বনিকৃষ্ট হলো কোন ঘর বা হলের মধ্যেকার প্রতিধ্বনি। যাই হোক, প্রতিধ্বনি বোঝবার জন্যে বস্তু এবং প্রতিফলকের দূরত্ব হওয়া দরকার কম করে ৫৬ ফুট—সময় হিসাবে $\frac{১}{১০}$ সেঃ-এর কিছু বেশী। কেন না, প্রতিফলকের দূরত্ব যত বেশী হবে, প্রতিধ্বনি তত দেরীতে শোনা যাবে। কখনও কখনও ধ্বনির বার বার প্রতিফলনের জন্যে একবার শব্দ করে তার অনেকগুলি প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফ্রান্সের ভার্দুন শহরের কাছে ১৬৪ ফুট দূরত্বে দুটি সমান্তরাল দেয়াল আছে, যার মাঝখানে দাঁড়িয়ে শব্দ করলে অন্ততঃ ১২ বার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মেঘের গুরগুর আওয়াজ বিভিন্ন স্তরের মেঘ থেকে বার বার প্রতিফলনের জন্যে শোনা যায়।

আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সৌজন্যে।

শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল

# বন্যা

সম্প্রতি বৃষ্টি-বন্যা-ধ্বস ইত্যাদি সব মিলিয়ে উত্তর বঙ্গে যা ঘটে গেল, তার নজীর সাম্প্রতিক কালে কেন, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গভীর রাতে তিস্তার বাঁধ ভেঙ্গে দু-কূল প্লাবিত করে এক বিরাট জলের স্তম্ভ প্রচণ্ডবেগে সত্তর হাজার অধিবাসীঅধ্যুষিত জলপাইগুড়ি সহরে ঢুকে পড়লো। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে বারো ফুট জলের তলায় ডুবে গেল জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, দোমহনী, মেখলিগঞ্জ, গ্রামগঞ্জ—মাঠ-ঘাট সব কিছু স্তব্ধ অচল হয়ে গেল এক নিমেষে। সে প্রচণ্ড বিভীষিকা আর সর্বনাশের কথা আজ আর তোমাদের কারো অজানা নয়।

উত্তর বঙ্গের সাম্প্রতিকতম ভয়ঙ্কর বন্যার যে বিবরণ পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায়, ১লা অক্টোবর '৬৮ সন্ধ্যা থেকেই হিমালয় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবিরাম প্রবল বর্ষণ সুরু হয়। হিমালয়ের ঢাল বেয়ে প্রবল জলের তোড় তিস্তার বুকে নেমে আসে। ৩রা অক্টোবর রাত্রে তিস্তার জল প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায় ও তিস্তা-বাজারের কাছে জলস্ফীতি এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশা রূপ ধারণ করে। তিস্তা-বাজারের কাছে সরকারী পরিমাপ করবার বোর্ডে জল বিপদ-সীমার সর্বোচ্চ রেখা ছাড়িয়ে যায় ৪ঠা অক্টোবর সকালে। তার পরের ইতিহাস এক ভয়াবহ উন্মত্ত প্লাবনের কাহিনী, যার সঙ্গে হয়তো কেবলমাত্র বাইবেলে বর্ণিত প্লাবনের তুলনা চলে। তিস্তা নদীটির নামকরণ হয়েছে সংস্কৃত 'তৃষ্ণা' কথাটি থেকে—উৎস তিব্বতের চিতাম্ হ্রদ। তারপর তিস্তা নদী সেবকগোলা গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে জলপাইগুড়িকে পিছনে ফেলে পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলায় ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। এই তিস্তা নদীর তৃষ্ণা আজ সমস্ত উত্তর বঙ্গের জীবনে ডেকে এনেছে এক মর্মান্তিক অভিশাপ।

সাধারণভাবে বন্যার কারণ হিসেবে বলা হয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত প্রবল বর্ষণের ফলে নদীর খাতে জল সরবরাহের পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে, নদীগর্ভ আর নিজের খাতে সমস্ত জল ধরে রাখতে পারে না। তখন বন্যার প্লাবনে নদীর অতিরিক্ত জলরাশি দু-কূল ছাপিয়ে কূলবর্তী শহর, জনপদ সব কিছু প্রচণ্ড রোষে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি ছাড়া আরও অনেক কারণেই বন্যা হতে পারে। গরমকালে যখন পাহাড়গুলিতে বরফ গলতে সুরু করে, তখন সেই বরফগলা জল পাহাড়ী নদীগুলিকে পরিপূর্ণ করে সমতল ভূমিতে বন্যার সৃষ্টি

করতে পারে। এছাড়া অনেক সময় নদীর বুকে দেওয়া বাঁধ প্রাকৃতিক কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে পিছনের জলাধারের সমস্ত জলরাশি মুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে। প্রতি বছর নদীবাহিত পালিমাটি দিয়ে নদীখাতগুলি ভরাট হয়ে যাওয়া বন্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই কারণেই বছরের পর বছর নদীগুলির জলধারণের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে শিলাচ্যুতির ফলে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই ভেঙ্গে নদীতে পড়ে আর জলের তোড়ে পাথরগুলি ভেঙ্গে গুঁড়া হয়ে পলিমাটির আকারে নদীর জলের সঙ্গে মিশে যায়। চড়া পড়বার দরুণ নদীগুলি জল বহনের ক্ষমতা অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে, ফলে অল্প বৃষ্টিতেই ভরাট নদীগুলি ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়।

বন্যার করাল গ্রাস থেকে শহর, গ্রাম, সমৃদ্ধ জনপদ, চাষের জমিকে বাঁচাবার জন্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সাধারণতঃ বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্যে এমন একটি ব্যবস্থাই গ্রহণীয়, যাতে একদিকে যেমন বন্যানিয়ন্ত্রণ অন্যদিকে তেমনি সেচ প্রকল্পের কার্যক্রমকে রূপায়িত করা সম্ভব। যেমন—দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনা বা বিহারের কোশী বাঁধের পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে সেচ পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কাবেরী নদীর বুকে মাদ্রাজের মেটুর বাঁধ বা মহীশূরের কৃষ্ণার্জুন সাগর বাঁধের পরিকল্পনায় সেচ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সমস্যার কথাও চিন্তা করা হয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। বিভিন্ন নদ-নদীর গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা স্থান, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

আশু প্রয়োজন মেটাবার জন্যে অনেক সময় নদীর বুকে মাঝারী উঁচু মোটা দেয়াল (Dike) তুলে সমতল ভূমির নদীগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এই দেয়ালগুলি স্থানীয় মাটি, বালি ও পাথর দিয়ে প্রায় ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু করে এমনভাবে তৈরি হয়, যাতে নদীগর্ভের অতিরিক্ত জল দেয়ালের উপর দিয়ে উপ্‌চে বয়ে যেতে পারে। এতে নদীর জলের উচ্চতা কিছুটা বেড়ে গেলেও জলবাহিত পলিমাটি আড়াআড়িভাবে বানানো দেয়ালগুলি পেরিয়ে যেতে পারে না। এই পদ্ধতিতে নদীর ঢালের দিকে পলিমাটি জমবার সম্ভাবনা কম। আর একটা কথা—নদীর বুকে দেয়ালগুলি এমন জায়গায় বানাতে হবে, যাতে জলস্রোতের চাপ সরাসরি দেয়ালের গায়ে না পড়ে। এর ফলে নদীর পাড়ের উপর কম চাপ পড়ায় নদীর পাড় সংরক্ষিত থাকে। তবে এই উপায়ে উত্তর বঙ্গের নদীগুলিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।

এই সব পাহাড়ী খরস্রোতা নদীতে যথাযথভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই

কঠিন। এসব ক্ষেত্রে নদীর বুকে সুবিধাজনক স্থানে একটি বড় বাঁধ (Dam) তৈরি করে অতিরিক্ত জল ধরে রাখবার জন্যে কৃত্রিম জলাধার (Reservoir) তৈরি করা হয়। তারপর নদীটির উপরের দিকে ও সমস্ত উপনদীগুলিতে ছোট ছোট বাঁধ দেওয়া হয়। নদী বা উপনদী বাহিত পলিমাটি জমে জমে বড় বাঁধটির প্রধান জলাধারটি যাতে একেবারে অকেজো হয়ে না যায়, তারই মোকাবিলার জন্যে ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে পলিমাটির সঞ্চলন অনেক পরিমাণে কমিয়ে ফেলা যায়। ফলে বাঁধের জলাধারটি অনেক দিন কার্যকর থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কেবলমাত্র নদীর বুকে বাঁধ দিয়েই সর্বনাশা বন্যার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। নদী-পারের মাটি দ্রুত ক্ষয়িত হয়ে যাতে নদীর বুকে চড়ার সৃষ্টি করতে না পারে, তারই সুরাহা করবার উপর নির্ভর করছে সমগ্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। মৃত্তিকা-সংরক্ষণের ব্যাপারে বন সংরক্ষণের ভূমিকা অসামান্য। যে সব জায়গায় যথেচ্ছভাবে বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে, সে সব জায়গায় ভূমি বা মৃত্তিকা সংরক্ষণ একটি বিরাট সমস্যার আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে পাহাড়ী অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক কারণে ধস ভেঙ্গে পড়বার উপর মানুষের বিশেষ কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বন্যা সমস্যার পুরাপুরি মোকাবিলা কোন দিন সম্ভব হবে কিনা, ভাবীকালের বৈজ্ঞানিকেরাই তা সম্যকভাবে বলতে পারবেন।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

# অ্যামিবা

অ্যামিবা এক শ্রেণীর এককোষী প্রাণী। ইহা দেখিতে ঠিক একটি বিন্দুর মত। যে সকল পুকুর বা জলাভূমিতে জলজ উদ্ভিদ জন্মে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে অ্যামিবা পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ইহাকে একটি স্বচ্ছ, অনির্দিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট জেলির মত দেখায়। ইহারা দেহের আকৃতি প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন করিতে থাকে। অ্যামিবা দেহ হইতে আঙ্গুলের মত এক একটি অংশকে একবার বাহির করিয়া আবার টানিয়া লইতে থাকে। এই আঙ্গুলের মত প্রসারিত অংশগুলিকে ক্ষণপদ বা সিউ-ডোপোড বলে। ইহার সাহায্যেই অ্যামিবা চলাফেরা করিতে পারে।

অ্যামিবার দেহ-কোষ একটি কোষ-আবরণী বা প্লাজ্‌মালিমার দ্বারা আবৃত। কোষ-আবরণী সংলগ্ন এক্টোপ্লাজম অধিক স্বচ্ছ, কিন্তু এণ্ডোপ্লাজম দানাবিশিষ্ট ও অনেক কম স্বচ্ছ। এণ্ডোপ্লাজমে নিউক্লিয়াস ও কয়েকটি ভ্যাকুওল আছে।

অ্যামিবা সাধারণতঃ শৈবালজাতীয় উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ইহার খাদ্যগ্রহণ প্রণালীটা খুবই আশ্চর্য রকমের। অ্যামিবার চোখ বা মুখ কিছুই নাই। কিন্তু পছন্দমত কোন খাদ্যবস্তু বা জীবাণু ইহাদের নিকট আসিলে ইহারা দেহ হইতে দুইটি ক্ষণপদ বাহির করিয়া সাঁড়াশির আকারে শিকারের উভয় পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া দেয়। তারপর অ্যামিবা ঐ খাদ্যবস্তুসহ একটি ভ্যাকুওল প্রস্তুত করে এবং পরে ঐ ভ্যাকুওলের মধ্যে অ্যামিবার শরীর হইতে এক প্রকার রস বাহির হইয়া ঐ খাদ্যকে জীর্ণ করে। ঐ জীর্ণ বস্তু এণ্ডোপ্লাজমের সহিত মিশিয়া যায় এবং অজীর্ণ পদার্থ দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। অ্যামিবা উহার কোষের পাত্‌লা পর্দার ভিতর দিয়াই বাতাস হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।

অ্যামিবার বংশবৃদ্ধি দুইটি উপায়ে হইয়া থাকে; যথা—(ক) দ্বি-বিভাজন বা বাইনারি ফিশন; (খ) বহু বিভাজন বা মালটিপ্‌ল ফিশন।

(ক) দ্বি-বিভাজন বা বাইনারি ফিশনঃ সাধারণতঃ উপযুক্ত পরিবেশে দ্বি-বিভাজন প্রক্রিয়ায় জননক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সময়ে অ্যামিবার দেহের ক্ষণপদগুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং অ্যামিবাটি গোল আকার ধারণ করে। প্রাণকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসটি ক্রমে বড় হইয়া একটি ডাম্বেলের মত আকার ধারণ করিতে থাকে এবং পরে উহা মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় দুইটি ভাগে ভাগ হইয়া যায়। এই সময়ে সাইটো-প্লাজমও দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। সাইটোপ্লাজমের উভয় ভাগে দ্বিধাবিভক্ত নিউক্লিয়াসের এক-একটি ভাগ থাকে। এইরূপে দুইটি অপত্য অ্যামিবার সৃষ্টি হয়।

(খ) বহু-বিভাজন বা মালটিপ্‌ল ফিশনঃ বহু-বিভাজন প্রক্রিয়া সাধারণতঃ প্রতিকূল পরিবেশে সম্পন্ন হয়। এই সময়েও অ্যামিবার সমস্ত ক্ষণপদ সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং অ্যামিবাটি গোল আকার ধারণ করে। তখন তিনটি শক্ত আবরণীর দ্বারা অ্যামিবার দেহকোষটি আবৃত হয়। এই আবরণীগুলি অ্যামিবাকে বিপজ্জনক অবস্থা হইতে রক্ষা করে। এই সময়ে ভিতরের নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং সাইটোপ্লাজমও বহু ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি সাইটোপ্লাজম একটি করিয়া নিউক্লিয়াস লইয়া এক-একটি সিউডোপোডিও স্পোর তৈরি করে। আবার উপযুক্ত পরিবেশে আবরণীগুলি ফাটিয়া যায় এবং সিউডোপোডিও স্পোরগুলি বাহির হইয়া আসে। তখন প্রতিটি সিউডোপোডিও স্পোর হইতে এক-একটি অ্যামিবা জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ জননক্রিয়ায় একটি অ্যামিবা হইতে অনেকগুলি অ্যামিবার জন্ম হয়।

শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী

# প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। মানুষ কেন তোৎলা হয়?

আবদুস আলি খাঁ, মুর্শিদাবাদ
কবিতা বসু, কলিকাতা-১২

উঃ ১। কথা বলবার সময় কখন কখন কোন লোককে একই অক্ষরকে বার বার উচ্চারণ করতে দেখা যায়। একই অক্ষরের বার বার উচ্চারণকে তোৎলামি বলা হয়। তোৎলামি হচ্ছে এক রকমের রোগ। তোৎলামির কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে কথা সৃষ্টির বিষয় কিছুটা জানা দরকার। কথা বলবার সময় যদি বাকযন্ত্রের শৈথিল্য ঘটে, তবেই তোৎলামির সৃষ্টি হয়। আমাদের শ্বাসনালীর মুখে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের মধ্যে স্বরনালী বা ভোক্যাল কর্ড থাকে। শ্বাসনালীর সাহায্যে আমরা যখন প্রশ্বাসের কাজ চালাই, তখন এই প্রশ্বাস-বায়ু স্বরনালীর উপর ধাক্কা দিয়া স্বরনালীর কম্পন সৃষ্টি করে এবং এর ফলেই স্বরের সৃষ্টি হয়। ঠোঁট, জিভ, দাঁত ও মুখের বিভিন্ন মাংসপেশীর ক্রিয়ায় এই উৎপন্ন স্বর স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। যখন এদের ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকে, তখনই তোৎলামি সুরু হয়। মানসিক উত্তেজনা অনেক সময় এই অসামঞ্জস্যের কারণ হয়। বয়সের সন্ধিক্ষণে, যেমন—শিশু যখন কৈশোর অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাদের মানসিক উত্তেজনা ও আত্মসচেতনতার ভাব বেড়ে যায়। এর ফলে মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের এই আত্মসচেতনার ভাবটি বেশী বলে ছেলেদের ক্ষেত্রে তোৎলামি বেশী দেখা যায়।

অনেক সময় তোৎলামি বংশপরম্পরায় দেখে একে বংশগত রোগ বলে মনে করা হয়, যদিও এর পিছনে কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। শারীরিক দুর্বলতা অনেক সময় তোৎলামির সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, স্বরবর্ণের তুলনায় ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণে তোৎলামি বেশী প্রকাশ পায়।

ছেলেবেলা থেকেই যাদের মধ্যে তোৎলামির ভাব থাকে, তাদের মনে সর্বদাই একটা সঙ্কোচ থাকে। এই ভাব বরাবর স্থায়ী হলে স্নায়বিক বিকার আসে, ফলে এদের তোৎলামিও স্থায়ী হয়ে যায়।

তোৎলা লোকেরা যখন একা কথা বলে কিংবা গান গায়, তখন তারা বেশ স্পষ্টভাবেই কথা উচ্চারণ করতে পারে। কাজেই আত্মসচেতনতা কম হলে তোৎলামিও কম দেখা যায়। এই কারণে তোৎলা লোককে একা একা কথা বলবার অভ্যাস

করিয়ে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রেখেও আস্তে আস্তে পরিষ্কার উচ্চারণ করা শিখিয়ে তোৎলামির চিকিৎসা করা হয়।

কোন কোন মতে, মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অংশে সুসংবদ্ধ কথা বলবার কেন্দ্র অবস্থিত। এই অংশকে বলা হয় সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার। এই বিশেষ অংশের পরিপুষ্টির অভাব হলেও তোৎলামি দেখা দিতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন—শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোলযোগ থাকলে অনেক সময় তোৎলামি দেখা যায়।

তোৎলামির বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিশেষ কিছু নেই। এর চিকিৎসা করা হয় প্রধানতঃ রোগীকে পর্যবেক্ষণ করে তার শারীরিক অথবা মানসিক স্থিরতা ফিরিয়ে আনবার মাধ্যমে।

**শ্যামসুন্দর দে**

# বিবিধ

**শুক্র গ্রহের দিকে সোভিয়েট মহাকাশ ষ্টেশন**

সোভিয়েট ইউনিয়ন ৫ই জানুয়ারী (১৯৬৯) শুক্র গ্রহের দিকে একটি আন্তর্গ্রহ মহাকাশ ষ্টেশন উৎক্ষেপণ করেছে। ষ্টেশনটির নাম ভেনাস-৫। এতে কোন মানুষ নেই। ভেনাস-৫-এর ওজন ১,১৩০ কিলোগ্র্যাম।

সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা টাস এই সংবাদ দিয়ে বলেছেন, সোভিয়েট মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য, ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল যাবার পর মে মাসের মাঝামাঝি এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ধীরে ধীরে শুক্র গ্রহে অবতরণ করবে।

টাস বলেছেন, ভেনাস-৪ যে গবেষণার কাজ সুরু করেছিল, ভেনাস-৫ সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে ভেনাস-৪ খুব ধীর গতিতে শুক্রে অবতরণ করেছিল এবং ৯০ মিনিট ধরে প্যারাসুটে শুক্রে অবতরণ করবার সময় গ্রহটির বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে পৃথিবীতে তথ্য পাঠিয়েছিল।

ভেনাস-৪ প্রেরিত তথ্যে প্রকাশ, মেঘাবৃত এই গ্রহে কোন প্রাণীর (পৃথিবীর মত) বেঁচে থাকা অসম্ভব।

ভেনাস-৩ গত ১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ শুক্র গ্রহে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে যায়, কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি করে। কারণ পৃথিবীতে তৈরি কোন বস্তু এই প্রথম অন্য গ্রহ পৌঁছুতে পেরেছিল। ভেনাস-১ ও ২ শুক্র গ্রহের ১৫ হাজার মাইল দূর দিয়ে চলে যায়। ভেনাস-৩ পরে তাপদগ্ধ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় বলে মনে হয়। এই তাপের জন্যেই সেখানে প্রাণধারণ অসম্ভব বলে বলা হয়েছে। তবে খুব প্রাথমিক পর্যায়ের কোন জীবনের অস্তিত্ব থাকলেও থাকতে পারে।

চন্দ্র পরিক্রমণ করে তিন জন মার্কিন মহাকাশচারী অক্ষত দেহে পৃথিবীতে ফিরে আসবার ঠিক নয় দিন পর এই সোভিয়েট প্রচেষ্টার নিশ্চয়ই বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

## ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ

পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের আগামী তিন মাসের মধ্যে তারাপুরে ভারতের প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

গুজরাট বিদ্যুৎ পর্ষৎ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, তারাপুর কেন্দ্রে মেরামতের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে জ্বালানির সাহায্যে পারমাণবিক রিয়্যাক্টরগুলি চালু করবার কথা আছে। এপ্রিল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে কেন্দ্রের কাজকর্ম চালু হলে ঐ দুইটি রাজ্যে কিছু বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

## পরলোকে ডক্টর জে. সি. সেনগুপ্ত

বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও বটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন প্রধান বটানিস্ট ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত ২১শে জানুয়ারী বালীগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

এই দিন ডক্টর সেনগুপ্ত একটি পরীক্ষা নেবার জন্যে বালীগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে এসেছিলেন। গাড়ী থেকে নেমে লিফ্‌ট্‌ দিয়ে উপরে উঠবেন, সঙ্গে সঙ্গে লিফ্‌টের দরজার কাছে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ। চিকিৎসক আসেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

জার্মেনীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট। ডক্টর সেনগুপ্ত একদা উদ্ভিদবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন, পরে তিনি অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে বটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে যোগ দেন। ১৯৬১ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক নিযুক্ত হন। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন।

মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

# বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম
অনুযায়ী বিবৃতি :—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশনের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪/২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

তারিখ—১-৩-৬৯

## এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা


১। প্রবীর মুখোপাধ্যায়
১৬, কুণ্ডু লেন,
ফ্লাট নং-৪, কলিকাতা-২৫

২। সতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী
ফুড টেক্‌নোলজি অ্যাণ্ড বায়োকেমিক্যাল
ইঞ্জিনীয়ারিং। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

৩। দ্বিজেশচন্দ্র রায়
১৪।২, গলফ ক্লাব রোড,
টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩

৪। শ্রীনিশীথকুমার দত্ত
বিবেকানন্দ কলেজ,
পোঃ ও জেলা—বর্ধমান

৫। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১১৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

৬। শ্রীবিশু দাস
পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

৭। অঞ্জলী রায়
অবধায়ক—সোমেন্দ্রলাল রায়
মিশন কম্পাউণ্ড
পোঃ বোলপুর, বীরভূম

৮ শ্রীরঘুনাথ দাস
গ্রাঃ—আউরবালী,
পোঃ—মসাট, জেলা—হুগলী

৯। আব্দুল হক খন্দকার
পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার,
মীরপুর রোড, ধানমণ্ডী, ঢাকা-২
পূর্ব পাকিস্থান

১০। অশোককুমার নিয়োগী
২, লরেন্স স্ট্রীট, পোঃ উত্তরপাড়া,
হুগলী

১১। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বি-৩, সি. আই. টি. বিল্ডিংস
৩০, মদন চাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৭

১২। শ্রীবিশ্বনাথ বড়াল
(ধারাপাড়া)
পোঃ চন্দননগর, হুগলী

১২। শ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯


---


সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

পরিষদ-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন ও একবিংশতি-প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন ভাষণ দিচ্ছেন; বাঁয়ে পরিষদ-সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও দক্ষিণে অনুষ্ঠান-সভাপতি অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়।

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | মে, ১৯৬৯ | পঞ্চম সংখ্যা


## নিবেদন

২১শে মার্চ (১৯৬৯) নিঃসন্দেহে বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন উত্তর কলিকাতার রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটে নবনির্মিত স্বকীয় ভবনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের একবিংশতি প্রতিষ্ঠা-দিবসও ঐ সঙ্গে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষদ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। বাংলা দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ঐ দিন অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তাঁহার উৎসাহদীপ্ত বাণী সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল।

পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসব উপলক্ষ্যে ২৯শে মার্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ দিন অষ্টম বার্ষিক রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতাটিও প্রদত্ত হয়। ৩০শে মার্চ বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার গোড়াপত্তন বিষয়ক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ দিন মডেল প্রতিযোগিতার জন্য পারিতোষিক ও মানপত্র প্রদান করা হয়।

বাংলা ভাষায় মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের ইতিহাসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চার যে লুপ্তপ্রায় ধারাটি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, সহৃদয় দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিবিধ আনুকূল্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তাহাই আজ বেগবতী স্রোতস্বিনীর রূপ ধারণ করিয়াছে। বিজ্ঞান পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসবের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আমরা সেই স্রোতস্বিনীরই কলকল্লোল শুনিতেছি।

কিঞ্চিদধিক দুই দশক পূর্বের কথা, আপার সারকুলার রোডে অবস্থিত ( বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উত্তর পার্শ্বস্থ গবেষণাগারের দ্বিতলের একটি কক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয়ের শুভ সূচনা হইয়াছিল। সেদিন অনেকেই ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন—বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা কতদূর বাস্তব-সম্মত, নিয়ত প্রসারণশীল বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বাংলা ভাষার মাধ্যমে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব কিনা—প্রভৃতি নানা কূটতর্কে আবহাওয়া তখন ছিল বিশেষ ভারাক্রান্ত। পরাধীনতার একটি বিষময় ফল—হীনমন্যতা। আমরা বহুকাল ইংরেজের পদানত থাকিয়া ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছি। তাই দীর্ঘ অপরিচয়ে আপন মাতৃভাষা বাংলার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম যে, বিজ্ঞান-শিক্ষা ইংরেজীর মাধ্যমে যেমন হইতে পারে, তেমনটি বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি—আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের অমর লেখনীস্পর্শে বিজ্ঞান-প্রবন্ধও যে অমূল্য সাহিত্য সম্পদে পরিণত হইয়াছে, এই কথা বোধ হয় আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের উদাত্ত আহ্বানে আমাদের হীনমন্যতার মোহনিদ্রা কাটিলেও জড়তা, অবসাদ ও সংশয় সহসা কাটে নাই।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধ, তথা বিজ্ঞানের নানাবিধ তথ্য ও তত্ত্ব প্রচারের জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অভীষ্ট সাধনে প্রথম পদক্ষেপ। কেবল মৌলিক গবেষণার বিষয় নহে, বিজ্ঞানের নানা শাখায় দেশ-বিদেশে যে অগ্রগতি ঘটিতেছে, যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির যে সকল প্রয়োগ হইতেছে—ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের বাংলা প্রবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিজ্ঞানমুখী করিবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তাহার যথাসাধ্য করিয়াছে ও করিতেছে। পরিষদের কর্মধারা যে সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তাহারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি। পরিষদের গৃহপ্রবেশ উৎসব জনস্বীকৃতিরই শুভ সঙ্কেত বহন করিতেছে। এই উৎসবের স্মারক হিসাবে ১৩৬৯ সালের মে সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' গৃহপ্রবেশ সংখ্যারূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মহামহীরুহে পরিণতি লাভ করুক, ইহাই আমাদের সকলের আন্তরিক কামনা।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

# বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও একবিংশতি প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

বাংলা দেশের জনসাধারণের মনে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলা এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে একুশ বছর আগে ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে কলকাতা মহানগরীতে যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তা সার্থকতার পথে পদক্ষেপ করলো গত ২৭শে মার্চ শুভ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সে দিন পরিষদের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং সেই সঙ্গে একবিংশতি প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই দিন অপরাহ্ণে বহু বিজ্ঞানানুরাগীর উপস্থিতিতে শুভ শঙ্খধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন পরিষদের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করবার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে না পারায় শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন।

শ্রীতরুণবিকাশ দত্ত ও কুমারী স্মৃতি ভাদুড়ীর সম্মিলিত উদ্বোধন সঙ্গীতের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ডক্টর ত্রিগুণা সেন একটি বৈদ্যুতিক বোতামের সাহায্যে পরিষদ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

অতঃপর পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর জয়ন্ত বসু সমবেত সকলকে স্বাগত জানান ও গত বছরের কার্যবিবরণী পাঠ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে ডক্টর ত্রিগুণা সেন বলেন, ২১ বছর যাবৎ অধ্যাপক বসু মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশবাসীকে বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলবার জন্যে যে চেষ্টা করে আসছেন, তা আজ সার্থকতার পথে উপনীত হয়েছে। দেশের এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করি না। অধ্যাপক বসুর মত আমরাও বিশ্বাস করি যে, দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্যে দেশবাসীর মনে বিজ্ঞান-চেতনা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন এবং তা সম্ভব হতে পারে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি এটা উপলব্ধি করে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত এই কাজ বিশেষ এগোয় নি। এবিষয়ে রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আশু উদ্যোগী হতে আমরা অনুরোধ করছি। ডক্টর সেন আরও বলেন যে, বিজ্ঞানের পুস্তক রচনার ব্যাপারে পরিষদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে জন্যে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তাঁর অনুরোধ, বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব সরকার যেন বিজ্ঞান পরিষদকে অর্পণ করেন।

পরিষদের কর্মসচিবকে লেখা পশ্চিবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের পত্রখানি কর্মসচিব সভায় পাঠ করেন। এই পত্রে শ্রীরায় লিখেছেন যে, তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবহিত আছেন এবং এই পরিষদের সাফল্য কামনা করেন। ভবিষ্যতে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অনুষ্ঠানে যোগদান করবার ইচ্ছা রাখেন।

বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করে অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় বলেন, বিজ্ঞান পরিষদ জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে যে সব প্রয়াস করে চলেছেন, তা সকলের অভিনন্দনযোগ্য। মানুষের কল্যাণ সাধনই বিজ্ঞান-চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ধ্বংসাত্মক কাজে বিজ্ঞানের যে ব্যবহার তা অপপ্রয়োগ ছাড়া কিছুই নয়। দেশের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণ যে বিজ্ঞান-চর্চার দ্বারা সাধিত হয় না, তার বিশেষ সার্থকতা নেই। এই বিষয়ে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মীদের দায়িত্ব অনেকখানি। তাঁদের এমনভাবে কাজ করা উচিত, যাতে তাঁদের কাজের সুফলের ভাগ দেশের সাধারণ মানুষও পেতে পারে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জেগে না উঠলে দেশের প্রগতি ও সমৃদ্ধি হতে পারে না।

পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভাষণে বলেন, দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়ে বিজ্ঞান পরিষদ ২১ বছরে তার নিজস্ব ভবন নির্মাণ করতে পেরেছে। সরকারও আমাদের সাহায্য করেছেন। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে এগোতে পারি না। আমার দৃঢ় ধারণা, বাঙালী যদি চায়, বিজ্ঞান পরিষদের মধ্য দিয়ে তারা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের কথা পৌঁছে দিতে পারবে। তিনি দেশের তরুণদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তারা বিজ্ঞান পরিষদকে তাদের আপনার ভেবে এগিয়ে আসুক, পরিষদের কাজে অংশ গ্রহণ করুক, এদেশকে তারাই গড়ে তুলুক।

দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিষদের এক-বিংশতি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীও উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত।

এই উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি বৈজ্ঞানিক মডেলের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৯শে মার্চ অপরাহ্নে পরিষদ ভবনে মডেল প্রদর্শনী এবং পরিষদ আয়োজিত অষ্টম বার্ষিক রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক সুশীলরঞ্জন মৈত্র। 'মানুষ ও তার কর্মশক্তি' সম্পর্কে তিনি মনোজ্ঞ-ভাবে শারীরতাত্ত্বিক আলোচনা করেন। বক্তৃতা সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

৩০শে মার্চ অনুষ্ঠানের শেষের দিকে বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার গোড়াপত্তন প্রসঙ্গে একটি আকর্ষণীয় আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। এই পর্যায়ে 'আশুতোষ ও বিশ্ববিদ্যালয়' প্রসঙ্গে অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, 'মহেন্দ্রলাল সরকার ও বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত' প্রসঙ্গে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, 'আচার্য জগদীশচন্দ্র' সম্পর্কে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' সম্পর্কে অধ্যাপক নির্মলেন্দু রায় আলোচনা করেন। এই দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। তিনি মডেল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

# বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও একবিংশতি প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি মহাশয়, সমবেত সভ্যবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং একবিংশতি প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আজকের এই সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের দেশ-গঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আপনাদের জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার বিস্তার যে একান্ত আবশ্যক এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে তা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব, এই উপলব্ধি থেকেই বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় এবং অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় থেকে পরিষদ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের আদর্শ পালনের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে আসছে। আজ পরিষদের নিজস্ব গৃহের যে দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হলো, এর মধ্য দিয়ে সুদীর্ঘ একুশ বছর পরে পরিষদ যেন পূর্ণতা লাভ করলো। আমরা আশা করি, আপনাদের, তথা সমগ্র দেশবাসীর ও সরকারের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতায় পরিষদের এই নবজীবন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিষদ জনগণের সেবায় ক্রমশঃই অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারবে।

আজ এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ ও অনুপ্রেরণা লাভ করছি। অধ্যাপক রায় একদিকে যেমন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী, অন্যদিকে তেমনি লোকরঞ্জক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর নাম যথেষ্ট সুবিদিত। পরিষদের বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি বহু দিন থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর প্রবন্ধাদি পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে; পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী' নামক পুস্তকে তিনি রসায়নের একটি আধুনিক বিষয় অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন। অধ্যাপক রায়ের দৃষ্টান্ত আমাদের একটি অমূল্য পাথেয় বললে নিঃসন্দেহে কোন অত্যুক্তি হয় না।

এই সম্মেলনে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন মহাশয়কে প্রধান অতিথিরূপে লাভ করে আমরা অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি। এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ডক্টর সেনের নাম সুপরিচিত। জনকল্যাণমূলক শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও সহানুভূতির উদাহরণ হিসাবে একথা উল্লেখ করা যায় যে, পরিষদের প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই তিনি আমাদের একজন বিশিষ্ট সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী। নিয়ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, এজন্যে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁর উপদেশ ও আশীর্বাদ আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে, এটা আমরা একান্তভাবে কামনা করি। আমরা আশা করি, তিনি আজ যে পরিষদ-ভবনের

দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন, তা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি দ্বারোদ্‌ঘাটন হিসাবে ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

## কার্যবিবরণী

বিজ্ঞান-শিক্ষা বিস্তারে ও বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে পরিষদের যে আদর্শ রয়েছে, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিকপত্র প্রকাশ, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জনপ্রিয় পুস্তক প্রণয়ন, বিজ্ঞান পুস্তকের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালনা, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা-সভা, প্রদর্শনী প্রভৃতি বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদের কাজ চলছে। শিক্ষায়তনগুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজেও পরিষদ উদ্যোগী হয়েছে।

আলোচ্য বছরে বিভিন্ন কাজে কতখানি সাফল্য লাভ করেছি ও কিরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি, সে বিষয়ে পরিষদের বার্ষিক কার্যবিবরণী সংক্ষেপে আমি বিবৃত করছি।

## ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকা

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ সাল থেকেই পরিষদের পরিচালনায় ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ নামক বিজ্ঞানের মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও আলোচনা, বিজ্ঞান-সংবাদ, প্রশ্নোত্তর, করে দেখ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদি পত্রিকাটিতে নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। আশানুরূপ না হলেও পত্রিকাটির গ্রাহক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে; এজন্যে এপ্রিল ’৬৯ মাস থেকে এর প্রকাশ-সংখ্যা ৩০০ কপি বৃদ্ধি করা হয়েছে—তখন সর্বসমেত প্রকাশ-সংখ্যা হবে ২৪০০ কপি। নিছক বিজ্ঞানের একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে এই প্রকাশ-সংখ্যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়।

গত তিন বছর যাবৎ ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় শারদীয় সংখ্যা বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ও আকর্ষণীয় চিত্র দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়ে নব কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। এই শারদীয় সংখ্যা বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনগণের বিশেষ সমাদর লাভ করেছে এবং এই সংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতা লক্ষ্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ প্রতি বছর এর ১৪০০ কপি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে বিতরণের ব্যবস্থা করছেন। এই ব্যবস্থার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের নিকট পরিষদ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ; কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, পত্রিকাখানার প্রচার ও প্রসারেও এরূপ সরকারী আনুকূল্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতেও আমরা এরূপ আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হব না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে পত্রিকা প্রকাশের খাতে ১৯৪৮ সাল থেকে প্রতি বছর ৩,৬০০ টাকার অর্থসাহায্য পরিষদ পেয়ে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক থেকে যে অর্থ-সাহায্য মাঝে কয়েক বছর পাওয়া গিয়েছিল, আলোচ্য বছরে তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে ডক্টর ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের পরামর্শ ও প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও শিল্প পর্ষতের (CSIR) নিকট থেকে এই বছর ২,৫০০ টাকার অনুদান পাওয়া গিয়েছে। ডক্টর সেনকে এজন্যে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আশা রাখি যে, ভবিষ্যতেও আমরা সাহায্য লাভ করব। আনন্দের কথা, এই বছর শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থা (NCERT) পরিষদকে পত্রিকা খাতে ২,০০০ টাকার অনুদান দিয়েছেন এবং ‘স্কুল

সায়েন্স' নামক তাঁদের পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' থেকে একটি করে প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করবারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এইরূপ সহযোগিতার জন্য ঐ সংস্থা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

উল্লিখিত সাহায্য সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে আরও উন্নত করবার পথে আর্থিক অনটনই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, একখানা মাসিক পত্রিকা, বিশেষতঃ বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক-পত্র প্রকাশ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল; বর্তমানে প্রকাশনের বিভিন্ন স্তরে মূল্যবৃদ্ধির ফলে পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্যে আপনাদের সকলের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, অনুদান প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে আপনারা আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন; আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা তাহলে পত্রিকাটিকে অধিকতর শিক্ষাপ্রদ, আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করে তুলতে পারব।

## বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ

জনপ্রিয় পুস্তক :—বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি স্বল্প মূল্যে পাঠকগণকে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে অতি স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এটা সম্ভব হয় প্রধানতঃ সরকারী অর্থসাহায্যের ফলে। পরিষদ এযাবৎ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২১ খানা পুস্তক প্রকাশ করেছে। বর্তমানে 'ভারতের অধিবাসীর পরিচয়' নামক একটি নৃতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রকাশের কাজ চলেছে; পুস্তকটির ১১ ফর্মা ইতিমধ্যে মুদ্রিত হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক :—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের নির্ধারিত নতুন পাঠ্যসূচী অনুসারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে 'বিজ্ঞান-বিকাশ' নামে সাধারণ বিজ্ঞানের একটি পাঠ্যপুস্তক বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক এ বছর রচিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষার মান উন্নত করবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুস্তকটির প্রকাশনা করেছেন কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ম্যাকমিলান কোম্পানী। আনন্দের বিষয়, পুস্তকটির প্রায় ১০,০০০ কপি ইতিমধ্যে বিক্রয় হয়ে গিয়েছে এবং এখন এর দ্বিতীয় মুদ্রণের কাজ চলেছে। যদি আপনারা এই পুস্তকের ত্রুটিবিচ্যুতি ও সাধারণভাবে এর মানোন্নয়নের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে আমরা অনুগৃহীত হব। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যাপারে পরিষদ এর আগেও কয়েক বার ব্রতী হয়েছে।

বিজ্ঞানকোষ :—বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিবিধ তথ্যের আভিধানিক ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ও পরিভাষাসম্বলিত 'এন্‌সাইক্লো-পিডিয়া' ধরনের একখানা কোষগ্রন্থ প্রকাশ করবার একটি পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করেছে। এই কোষগ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনা সম্পর্কীয় বিস্তৃত পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন ও সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ও সাহায্যের জন্যে সরকারী স্তরে প্রেরিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে। পরিষদের গত বছরের কার্য-বিবরণীতেই এসব কথা বলা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এই কোষগ্রন্থ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে এখনো পর্যন্ত কোন সহযোগিতা-মূলক মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই নি; অথচ আঞ্চলিক ভাষায় সর্বস্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে এরূপ একটি কোষগ্রন্থের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা যে অপরিসীম, একথা সকলেই স্বীকার করেন। যাই হোক,

আমরা আশা করি যে, বিজ্ঞানকোষ সম্পর্কে পরিষদের পরিকল্পনাটি অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করবে।

## গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে। তবে স্থানাভাবের জন্যে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার বা উপযুক্ত পাঠাগার স্থাপন করা এতদিন সম্ভব হয় নি। পরিষদের নিজস্ব ভবনে একটি সুসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ও আধুনিক ধরনের একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা ক্রমে সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করি। এই ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতাও আমরা একান্তভাবে কামনা করি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্যে কলিকাতা পৌর সংস্থার শিক্ষাবিভাগের নিকট থেকে আমরা বার্ষিক ১,৫০০ টাকা হিসাবে অর্থসাহায্য পেয়ে থাকি; কিন্তু বহু আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও পৌর সংস্থার নিকট থেকে গত চার বছরের সাহায্য এযাবৎ পাওয়া যায় নি।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, পাঠ্য-পুস্তকের অভাবে অনেক দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে একটি পাঠ্যপুস্তকের বিভাগও খোলা হবে, এরূপ পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রাথমিক ব্যবস্থাদি আগামী বছর সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

## বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনা এবং মডেল প্রতিযোগিতা

পরিষদের আয়োজিত বার্ষিক 'রাজে[illegible]শ্বর বসু স্মৃতি' বক্তৃতার অষ্টম বক্তৃতাটি এখানে অনুষ্ঠিত হবে ২৯শে মার্চ, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টায় শারীরবৃত্ত বিষয়ক এই বক্তৃতাটি দেবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুশীলরঞ্জন মৈত্র।

বাংলাদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার গোড়া-পত্তন, এই বিষয়ে এখানে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে আগামী ৩০শে মার্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টায়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও সার আশুতোষের অবদান সম্পর্কে এই সভায় আলোচনা করা হবে।

হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবার জন্যে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৯শে মার্চ শনিবার, অপরাহ্ণ ৪টায় প্রতিযোগীরা তাদের মডেল বিচারক-মণ্ডলী ও অন্যান্য অতিথিদের দেখাবে এবং ৩০শে মার্চ রবিবার, সন্ধ্যায় এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

উপরিউক্ত বক্তৃতা ও আলোচনা-সভায় উপস্থিত থাকবার জন্যে এবং মডেল প্রতিযোগিতার মডেলগুলি দেখবার জন্যে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

## পরিষদ-ভবন নির্মাণ

গত কয়েক বছর যাবৎ পরিষদের নিজস্ব গৃহ-নির্মাণের আয়োজন চলছিল। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই গৃহ-নির্মাণের কাজ সুরু হয় এবং প্রায় এক বছর পরে গৃহটির ভূ-গর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসন্তোষকুমার মজুমদারের তত্ত্বাবধানে মেসার্স প্র্যাসকন কর্তৃক এই নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে। পরিষদের পরিকল্পিত গৃহের অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী গৃহের ভূ-গর্ভতল ছাড়া উপরে ত্রিতল হবে; কিন্তু আপাততঃ

সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অনুসারে প্রথম দুটি তল নির্মিত হয়েছে।

গৃহ-নির্মাণ তহবিলে এপর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১,৯০,০০০ টাকা। পাইলিং, ভূ-গর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণকার্য, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে প্রায় ১,৬০,০০০ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এই বাবদে এখনো আমাদের দেয় রয়েছে প্রায় ৩০,০০০ টাকা, অর্থাৎ গৃহ-নির্মাণ তহবিলে অতঃপর আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। পরিষদ-ভবনের দ্বিতল ও ত্রিতল সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে প্রয়োজন হবে আরও প্রায় ১, টাকা। এই অর্থ যাতে অবিলম্বে সংগৃহীত হয়, তার জন্যে পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে মুক্ত-হস্তে দান করতে আপনাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে এযাবৎ যাঁরা পরিষদের গৃহ-নির্মাণের জন্যে দান করেছেন, তাঁদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। পরিষদের গৃহ-নির্মাণ তহবিলে সংগৃহীত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে এককালীন ৫০,০০০ টাকা, কুমার প্রমথনাথ রায় চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নিকট থেকে ১০,০০০ টাকা, পরলোকগত অধ্যাপক নীরেন রায় মহাশয়ের 'উইলের' সর্ত অনুসারে তাঁর দান ৪২,০০০ টাকা এবং জনসাধারণের নিকট থেকে প্রায় ২৮,০০০ টাকা। কুমার প্রমথনাথ রায় ও অধ্যাপক নীরেন রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তাঁদের চিত্র পরিষদ ভবনে রক্ষিত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### উপসংহার

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার উপর নির্ভর করে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্প-সমৃদ্ধিই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নিয়ামক। সে জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই বিজ্ঞান পরিষদ তার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি পরিচালিত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে পরিষদের মত জনশিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আর সেই সঙ্গে আমরা নিশ্চিতভাবে এই বিশ্বাস রাখি যে, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টা আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

# বিজ্ঞান ও সমাজ

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন গড়ে ওঠে দুটি প্রবল স্বাভাবিক প্রেরণাকে আশ্রয় করে। এরা হলো বাঁচবার ও জানবার প্রেরণা বা প্রবৃত্তি। প্রথমটি হচ্ছে সকল জীবের পক্ষে সাধারণ দেহধর্ম। দ্বিতীয়টি মানুষের বিশেষত্ব, কারণ তা মনের ধর্ম। মানুষের জীবনে এই দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা অসম্পর্কিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সভ্যতার আদিযুগে বাঁচবার প্রয়োজন মিটাতেই মানুষ জানবার প্রচেষ্টায় মন দিয়েছে। পাথরের সঙ্গে পাথর ঠুকে ও কাঠের সঙ্গে কাঠের সংঘর্ষে মানুষ যেদিন আগুন জ্বাললো, সে দিনই সে প্রথম করলো একটি গুরুতর বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার। ব্যবহারিক বা শিল্প-বিজ্ঞানের ভিৎ নির্মিত হলো প্রস্তর যুগের মানুষের এই আকস্মিক পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের ফলে। এভাবে জড় পদার্থ থেকে বিমুক্ত তাপ-শক্তিকে প্রয়োগ করে মানুষ নির্মাণ করেছে তার জীবনযাত্রার নিত্যব্যবহারের সামগ্রী: পোড়া মাটির বাসনপত্র, ঘটিবাটি এবং খনিজ পদার্থ থেকে তামা, লোহা প্রভৃতি বিবিধ ধাতু। এরূপে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার চললো ক্রমশঃ বেড়ে। কিন্তু মানুষের মন এতে তৃপ্তি-লাভ করতে পারে নি। তার জিজ্ঞাসু মন চেয়েছে বিশ্বজগতের রহস্য সন্ধান করতে—বৈজ্ঞানিক তথ্যের অন্তরালে নিহিত বাস্তব বা শাশ্বত সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে। এথেকেই গড়ে উঠেছে তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক দর্শন। এসবের ফলে, মানুষের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনে উত্তরোত্তর যে পরিবর্তন ঘটেছে, তারই বিবরণীকে বলা যায় মানব-সভ্যতার ইতিহাস।

গোড়ায় আকস্মিকভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (১) অগ্নি-প্রজ্বালন, (২) মৃৎশিল্প ও ধাতু শিল্পের প্রবর্তন।

অগ্নি-প্রজ্বালন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারে আদিম মানুষের জীবনযাত্রায় দেখা দিল এক গুরুতর পরিবর্তন। হিংস্র জন্তুর ভয়ে ভীত বর্বর মানুষ রাত কাটাতো গাছের ডালে এবং বন-জঙ্গলের ফল-মূল ছিল তার আহার। আগুনের আলোকে তার সাহস ও মনের বল গেল বেড়ে। গাছের ডাল ছেড়ে সে মাটিতে এলো নেমে এবং গিরি-কন্দরে, অরণ্যে, গুহায় নিলো বাসা। বন্যপশুর আক্রমণ ও প্রকৃতির প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার উপায় মিললো এতে। মানুষের শক্তিসাধনার প্রথম সোপান হলো সৃষ্ট এবং মানব-সভ্যতার প্রথম অঙ্কুর দিল দেখা। শিকারলব্ধ কাঁচা মাংসের পরিবর্তে পোড়া বা সিদ্ধ মাংস হলো তার আহার্য। মানুষ এবং পশুর খাদ্যে দেখা দিল প্রকারভেদ। রন্ধন ব্যবস্থার প্রচলনে খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয়ের হলো সুবিধা। জমিতে বীজবপন করে সে উৎপন্ন করলো বিবিধ খাদ্যশস্য এবং সুরু হলো কৃষির কাজ এবং পশুপালন। এর জন্যে প্রয়োজন হলো পরস্পরের সহযোগিতা। মানুষ হলো সংঘ বা গোষ্ঠিবদ্ধ। এথেকেই গড়ে উঠলো মানুষের সমাজ-জীবনের ভিত্তি।

পরবর্তী কালে আগুন থেকে তাপশক্তির প্রয়োগে যখন মৃৎশিল্প ও ধাতুশিল্পের প্রবর্তনে মানুষ নির্মাণ করলো বাড়ীঘর, বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি ও আত্মরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র, তখন তার জীবনযাত্রায় ঘটলো আর এক অপরূপ বিবর্তন।

মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প এবং কৃষিকাজের প্রসারে মানুষের সমাজ-জীবন যখন কতকটা নিরাপদ ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলো এবং তার বাঁচবার প্রয়োজনীয় মালমশলা ও খাদ্যসামগ্রীর সঞ্চয় হলো সহজ, তখন মানুষের আর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—জানবার প্রবৃত্তি—উঠলো জেগে। দৃশ্যমান বিরাট বিশ্বের বা প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে মানুষের মন উঠলো উদ্গ্রীব হয়ে। দর্শন এবং ধর্মের ভিত্তির সূচনা দিল দেখা। এক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেয়ে মানুষের অবলম্বন হলো প্রধানতঃ বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার এবং প্রজ্ঞাবাদ বা আপ্তবাক্য। ক্রমশঃ গড়ে উঠলো মানুষের রাষ্ট্রজীবন। বিবিধ রাষ্ট্রের হলো প্রতিষ্ঠা—জাতিকে, ধর্মকে, সম্প্রদায়কে বা বিশিষ্ট গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞান-চর্চা হয়ে উঠলো ধর্মের অঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই প্রাচীন যুগের ব্যাবিলোন, মিশর, ভারতবর্ষ, চীন ও গ্রীস দেশে এবং পরবর্তী কালে আরবে। কালক্রমে যখন নানাবিধ সঙ্কীর্ণ আচার-অনুষ্ঠান, বিচারমূঢ়তা, অন্ধতা ও গোঁড়ামিতে ধর্মের গ্লানি ও বিকৃতি দেখা দিল এবং ধর্মের নামে অধর্মের প্রশ্রয় উঠলো বেড়ে, বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিজ্ঞানের মুক্তধারা গেল একপ্রকার রুদ্ধ হয়ে। বিচারহীন বিশ্বাস ও উদ্ভট সংস্কারের বশবর্তী হয়ে বিজ্ঞান-কর্মীরা দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের শক্তির অপব্যয় করেছেন শুধু মরীচিকার সন্ধানে—পরশপাথরের (Philosopher's stone) খোঁজ করে এবং সঞ্জীবনী সুধার (Vital elixir of life) সৃষ্টির প্রচেষ্টায়, অর্থাৎ হীনধাতু তামা, লোহা বা পারদকে সোনায় পরিণত করবার এবং চিরযৌবন লাভের জন্যে জরাব্যাধিনাশক ঔষধ প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের পরীক্ষায়। এভাবে অনিশ্চিত ও অসম্ভবের সন্ধানে বহু শতাব্দীব্যাপী এক অন্ধকারের যুগ কেটে গেল পৃথিবীতে। এই সময়ে ধর্ম নিয়ে এবং রাষ্ট্রগত অধিকার নিয়ে মানুষে মানুষে ঘটেছে বহু দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং রক্তারক্তি।

পরবর্তী কালে মধ্যযুগের প্রারম্ভে লুপ্তপ্রায় গ্রীক সভ্যতার জ্ঞানের মাল-মশলা নিয়ে এলো মুসলমানধর্মী আরবজাতি তাদের ধর্ম এবং রাজ্য বিস্তারের লিপ্সার সঙ্গে ইউরোপের মহাদেশে। মহামতি রোজার বেকন (Roger Bacon) প্রমুখ মনীষীদের বাণীর প্রভাবে ঠিক এই সময়ে ইউরোপে নবজাগরণের (Renaissance) সূচনা দেখা যায়। এর ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বুদ্ধি-বিচার-নির্ভর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভ্যুদয় ঘটে এবং ধর্মের অনুশাসনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রত্যক্ষ প্রমাণলব্ধ বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বের বিরোধ দিল দেখা। এই কারণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি গোড়ায় কিছুকালব্যাপী কতকটা প্রতিহত হয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের বাণী প্রচারের জন্যে তদানীন্তন ধর্মনায়কদের হাতে বিজ্ঞান রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ মহামতি গ্যালিলিওর (Galileo) নিদারুণ লাঞ্ছনা ও নির্যাতন এই বিরোধের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে একটি নিয়মের রাজ্য এবং এর যাবতীয় ঘটনাবলী কার্যকারণ সূত্রে (হেতুবাদ—Causality) গাঁথা—এই ধ্রুব বিশ্বাসই হলো বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই বিশ্বব্যাপী নিয়মের ইচ্ছামত ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে, এরূপ কোন শক্তির (ঈশ্বর বা ভগবান) অস্তিত্বে বিজ্ঞান বিশ্বাস করতে পারে না। তাই বলা যায় যে, বিজ্ঞানের বিশ্বাস যদিও ধর্মের বিশ্বাসের মত অন্ধ, তবু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের বিশ্বাস ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ তথ্যের সাহায্যে প্রমাণসাপেক্ষ। তাই ধর্মের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্থগিত হয় নি। পরন্তু, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচারনির্ভর বৈজ্ঞানিক সত্যান্বেষণ পদ্ধতির অনুশীলনের ফলে মানুষের মন অপেক্ষাকৃত মোহমুক্ত ও তার

বুদ্ধি সতর্ক হবার সুযোগ পেয়েছে। ফলে, মানুষের সমাজ থেকে বহু অকল্যাণ, নির্মম আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথা, কুসংস্কার, ভেদবুদ্ধি, অবিচার, অবমাননার অপনয়নে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী, বা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি যে প্রেরণা দিয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। অন্য দিকে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগে অফুরন্ত শক্তি ও অর্থের আহরণে মানুষের সমাজ গড়ে উঠেছে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বহু গুরুতর সমস্যা ও আশঙ্কা দিয়েছে দেখা। এসম্বন্ধে এখন একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বিজ্ঞানের এক-একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে মানুষের সমাজে একটি গভীর পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছে। গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটনের আবিষ্কারের ফলে মানুষের সমাজে ধর্মের শাসন শিথিল হয়ে উঠলো এবং বিজ্ঞানে জড়বাদ ও যান্ত্রিক বিশ্বের ধারণা গড়ে উঠলো। এর ফলে, চেতনা বা ঈশ্বরবাদী ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব জাগলো প্রবলভাবে। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রে এর প্রভাব দিল দেখা। ইউ-রোপের ভূখণ্ডে পোপের প্রতিপত্তি গেল খর্ব হয়ে। মধ্যযুগে—বিশেষতঃ তার শেষভাগে, দুটি গুরুতর বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারে সমাজ এবং রাষ্ট্রের হলো বহু রূপান্তর। এগুলি হলো বারুদ এবং মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার। বারুদের আবিষ্কারে রাষ্ট্রের শাসন এবং বিস্তারের হলো সুবিধা—বহু রাষ্ট্র এবং সাম্রাজ্যের হলো প্রতিষ্ঠা। এর প্রভাবে শক্তি হলো কেন্দ্রীভূত। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারে জ্ঞান বিস্তারের এবং বিভিন্ন দেশ-বাসীর মধ্যে তাদের আদান-প্রদানে সুবিধা গেল বেড়ে। ফলে মানব-সভ্যতার উন্নতির পথ গেল উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়ে। এর পর সুরু হলো অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের। এই যুগের ব্যাপ্তিকালের সীমা নির্দেশ করা যায় প্রায় ১৫০ বছর—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা অবধি। এই অপেক্ষাকৃত অল্পকালে বিজ্ঞানের নানা শাখায় যে সব অভাবনীয় বিস্ময়কর তথ্যের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা এবং বৈজ্ঞানিক শিল্পের উদ্ভাবন হয়েছে, তার তুলনায় পূর্ববর্তী পাঁচ হাজার বছরব্যাপী মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সঞ্চিত বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক শিল্পের জ্ঞান নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়: ষ্টীম ইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার এবং প্রয়োগ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার-বার্তা, তেজস্ক্রিয়তা, চলচ্চিত্র, সিনেমা, রেডিও, মোটরকার, এরোপ্লেন, সাবমেরিন, কৃত্রিম তন্তু, প্লাষ্টিক, অসাধারণ শক্তিশালী বিবিধ ঔষধ, রোগনির্ণয়ের বহুবিধ অব্যর্থ যন্ত্রপাতি, প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরক ও মারণ-অস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক শিল্পে বহুবিধ প্রগতির অপূর্ব নিদর্শন। এর ফলে মানবের ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে ঘটেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা যুগান্তর। বৈজ্ঞানিক পন্থায় জ্ঞানের অনুশীলনে মানুষের হাতে এসেছে অপরিমেয় শক্তি, যার প্রয়োগে সে বাড়িয়ে তুলছে তার জীবনযাত্রার মালমশলা, সুখসমৃদ্ধি, আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্য অফুরন্ত পরিমাণে ও অব্যাহতভাবে। মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ঘরে-বাইরে আজ বিজ্ঞানের অপরিহার্য প্রভাব পরিস্ফুট।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ হয়েছে বিজ্ঞানের আর একটি দ্রুত প্রগতির যুগ। একে বলা যায় পরমাণুকেন্দ্রিক শক্তি-বিজ্ঞান ও মহাকাশ পরিক্রমা বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগ মানুষের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। রেডার, অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা, মহাকাশ অভিযান এবং পৃথিবী ও চন্দ্র প্রদক্ষিণ, সুদূর দেশ থেকে দেশান্তরে

বোমাবর্ষী রকেট পরিচালন, টেলিভিসন, লেসার রশ্মি, বুদ্ধি ও বোধি যন্ত্র (Cybernetics) ইত্যাদি এই যুগের কয়েকটি অভাবনীয় বিস্ময়কর আবিষ্কার ও প্রয়োগ কৌশল। বিজ্ঞানের কীর্তিকলাপ এই যুগে যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে, তা আগের যুগের লোকের নিকট মনে হতো পৌরাণিক বা স্বপ্নরাজ্যের কাহিনী। মানুষের সমাজে ও রাষ্ট্রে এর ফলে দেখা দিয়েছে এক বিপ্লবের সূচনা ও বহু দুরূহ সমস্যা এবং সঙ্কট।

বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযোগে মানুষ আজ সক্ষম হয়েছে অপরিসীম শক্তি আহরণে। শক্তির স্বাভাবিক বা ভৌতিক ধর্ম হচ্ছে ভাঙ্গা বা গড়া। কিন্তু এর একটি নিগূঢ় বা আত্মমুখী ধর্মও আছে, যাতে মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে প্রভুত্বের লিপ্সা। এই কারণে আজ জগৎ জুড়ে দেখা দিয়েছে মানুষের জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, স্বার্থে স্বার্থে অহরহ এক নির্মম সংঘাত। ক্ষমতার অহঙ্কার এবং লোভ মানুষকে করে বিচার-মূঢ়, বুদ্ধিভ্রষ্ট এবং ক্রূর। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে বিপুল আয়োজনে ব্যাপকভাবে যে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়ে গেছে, এ হলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মোট নিহতের সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৫০ কোটি এবং পরবর্তী কোরিয়া যুদ্ধে ৯০ লক্ষ; এদের মধ্যে কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত যোদ্ধা এবং বাকী নিরীহ নরনারী ও শিশু—উপর থেকে বোমা বর্ষণে ও যাত্রীপূর্ণ জাহাজ ডুবিতে (সাবমেরিনের আক্রমণে) নিহত। বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যায় শতকরা ৯৫ জন ছিল যুদ্ধের সৈনিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের সংখ্যা শতকরা ৫২ এবং কোরিয়া যুদ্ধে নিহত সৈনিকের সংখ্যা শতকরা ১৬ জন মাত্র। এতে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকৌশল ও মারণাস্ত্র এবং বিস্ফোরক পদার্থের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধরত সৈনিকের চেয়ে নিরীহ নাগরিকের মৃত্যুসংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সুতরাং বলতে হয়, বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষ যতই শক্তিমান হয়ে উঠছে, ততই সে শক্তির প্রয়োগ হচ্ছে সৃষ্টির চেয়ে ক্রমশঃ অধিকতর ধ্বংসের কাজে—সকল নীতির ও ধর্মের বাঁধন লঙ্ঘন করে। বর্তমানে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, সুদূরগামী রকেট ইত্যাদি ভয়াবহ বিস্ফোরকবর্ষী প্রলয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের নির্মাণ ও আহরণে পৃথিবীর প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে উগ্র প্রতিযোগিতা চলছে, এর পরিণাম কল্পনা করে আজ বিশ্ববাসী আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। একটি ক্ষুদ্র শক্তির অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণের ফলে জাপানের হিরোসিমা শহরে যে ধ্বংসলীলার অভিনয় হয়ে গেছে, তার বিবরণ ভোলবার নয়। বিজ্ঞানীদের হিসাবে একটি হাইড্রোজেন বোমা ঐরূপ একটি অ্যাটম বোমার চেয়ে হাজার গুণ অধিক শক্তিশালী। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, চীন ও ফরাসী রাষ্ট্রে এপর্যন্ত যে পরিমাণ অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা জমে উঠেছে, তার মাত্র কয়েকটির সমকালীন বিস্ফোরণে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সমগ্র মানবজাতি এবং তার সভ্যতার বিলোপ ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তে—এমন কি, অন্যান্য জীবজন্তু এবং উদ্ভিদেরও সকল চিহ্ন যাবে বিলীন হয়ে। এই কি হবে অবশেষে মানুষের বিজ্ঞান-সাধনার শেষ পরিণাম! বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ও জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিকে মোহ ও সংস্কার মুক্ত করবে এবং বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগে মানুষের সমাজ সুখ, সম্পদ ও প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, এই তো ছিল মানুষের আশা। কিন্তু এথেকে যে এরূপ দারুণ সমস্যার উদ্ভব এবং মানুষের সমাজে ও সভ্যতায় এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, এসম্বন্ধে

বিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্র ও সমাজ-নেতারা সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন না। এর কোন সমাধানে বা প্রতিকার নির্ণয়ে এপর্যন্ত তাঁরা শুধু নিজের অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন। ক্ষমতার মোহে মানুষের স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, হিংসা, বিদ্বেষ এবং পরস্পরের আতঙ্ক যে এর একমাত্র কারণ, একথা আগেই বলা হয়েছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে পরম-স্বার্থকে বর্জন করে মানুষ আজ আত্মঘাতী হতে উদ্যত। পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এভাবে মারণাস্ত্র, মহাকাশ অভিযান ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় যে বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় হচ্ছে, তার দশভাগের একভাগও যদি অনুন্নত দেশগুলির জন্যে ব্যয়িত হতো, তাহলে মানুষের অনেক দুঃখদৈন্য যেত মুছে। পরিশেষে মানুষের সমাজের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান কি নির্দেশ দিতে পারে এবং বিজ্ঞানীদের কি কর্তব্য, সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করে প্রবন্ধের উপসংহার করবো।

একথা মানতে হয় যে, বিজ্ঞানের জড়বাদ ও যান্ত্রিক বিশ্বের ধারণা মানুষের মন ও বুদ্ধিকে মোহ ও সংস্কারমুক্ত করতে পারে নি। তার কারণ, প্রয়োগ-বিজ্ঞান (Technology) মানুষের হাতে এনে দিয়েছে দেবতার শক্তি। অহঙ্কারে দৃপ্ত ও মোহাচ্ছন্ন মানুষ সে শক্তিকে দানবের মত ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও পরের উপর প্রভুত্বের লিপ্সা সংবরণ করতে পারে নি। জড়বস্তুর বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের জড়বাদ মানুষের মনে যে ধারণা বা বিশ্বাস বদ্ধমূল করেছে, সে হলো জড়-পদার্থই একমাত্র বাস্তব বা সৎ; কারণ, দেশ-কালের কাঠামোতে কেবল এদেরই অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। জড়জগতে যে সব পরিবর্তন ঘটে, তাতে একটি কার্য-কারণ সূত্রের শৃঙ্খলা থাকে অব্যাহত (হেতুবাদ)। বিজ্ঞানের নৈশ্চিত্য-বাদের (Determinism) ভিত্তি হলো এখানে। সুতরাং যা কিছু জড়ধর্মী বা বস্তুসংজ্ঞক নয়, তাদের কোন বাস্তবতা বা অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ তারা অসৎ। ফলে আত্মরক্ষা ও রাষ্ট্ররক্ষার প্রস্তুতির জন্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিবিধ মারণাস্ত্রে মানুষ যতটা বিশ্বাস করে ও নির্ভর করে, তার তুলনায় বিচারবুদ্ধি, অহিংসনীতি, কল্যাণকর বা শান্তিপূর্ণ বিধিব্যবস্থায় তার শতাংশের একাংশও করে কিনা সন্দেহ। আজ অনেকে মনে করেন অ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা একটি জাজ্বল্য-মান বাস্তব সত্তা বা সৎ বস্তু এবং তার তুলনায় প্রীতি, প্রেম, করুণা, মৈত্রী, ক্ষমা, ত্যাগ, এবং আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে নিছক কাল্পনিক ও অসৎ, সুতরাং অর্থহীন। অতএব মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্রে এদের কোন প্রয়োজন হয় না। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের (Technology) অনুশীলনে মানুষ তার জীবনযাত্রার সকল প্রয়োজন মিটাতে এবং তার ভোগ সম্ভোগের সকল উপকরণ সংগ্রহে, অপিচ তার সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সমস্যা সমাধানে সক্ষম—একথাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার প্রতি-যোগিতার বিভীষিকায় তার এই বিশ্বাস উঠেছে শিথিল হয়ে। মানুষের চিন্তাধারা অন্তর্মুখী হতে সুরু করেছে—জড়বস্তুই একমাত্র সৎ নয় এবং জড়বাদ ও নৈশ্চিত্যবাদই বিশ্ববিধানে একমাত্র সত্য নয়, এরূপ উপলব্ধিরও লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কারণ, প্রয়োগ-বিজ্ঞানের অভাবনীয় বিস্ময়কর কৃতিত্বেও মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্রে অব্যাহত শান্তি ও কল্যাণের কোন আশার আলো দেখা দেয় নি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের জড়বাদ, হেতুবাদ ও যান্ত্রিক বিধির পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। অণু-পরমাণুর ধর্মের পরীক্ষার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সম্ভাবনা (Probability) বা আকস্মিকতার (Chance) অভিজ্ঞতা থেকে গড়ের (Statistics) ধারণার হয়েছে প্রবর্তন।

বিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে উঠেছে। মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে তার বহির্জগতের সম্বন্ধ হচ্ছে তাই ঘনিষ্ঠ। এক্ষেত্রে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য বা দৃষ্টবস্তুর সঙ্গে একটি প্রতিক্রিয়ার (Interaction) সৃষ্টি অনিবার্য। সুতরাং আমরা বিশ্বজগতের যে স্বরূপ ধারণা করি, তা হলো আমাদের অভিজ্ঞতার পরিণাম, বিশ্বের প্রকৃত বা স্বকীয় স্বরূপ নয়। পরমাণু জগতের পরীক্ষায় এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এভাবে জড় জগতেও প্রত্যেক অণু-পরমাণুর সঙ্গে অন্য বা অন্যবিধ অণু-পরমাণুর অহরহ প্রতিক্রিয়ার ফলে কোন একক অণু-পরমাণুর স্বকীয় ধর্ম বা স্বরূপ নির্দিষ্ট থাকতে পারে না। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বহির্জগতে আমরা যে নিয়মের বিধান (Determinism) প্রত্যক্ষ করি, তার মূলে রয়েছে আকস্মিকতা (Chaos or Indeterminism)। বিদ্যুৎকণিকা বা ইলেকট্রনের গতিবেগ ও অবস্থান নির্ণয়ের পরীক্ষাতেও বিজ্ঞানীরা এই অনৈশ্চিত্যের (Indeterminism) অর্থাৎ আকস্মিকতার (Chance) পরিচয় পেয়েছেন। অধিকন্তু দেখা গেছে যে, অবস্থাবিশেষে ইলেকট্রন কখনো কণিকার ধর্ম এবং কখনো বা শক্তিতরঙ্গের ধর্ম প্রকাশ করে। এর ফলে জড় ও শক্তির স্বাতন্ত্র্য বা ভেদাভেদ গেছে ঘুচে। আপাত বিপরীত ধর্মী শক্তি ও জড়কণিকা আসলে একই সত্তার এ-পিঠ ও-পিঠ মাত্র। বিজ্ঞানী নীল বোর (Niels Bohr) দেখিয়েছেন যে, শক্তিকণিকা-বাদের প্রক্রিয়ায় (Quantum Mechanics) ইলেকট্রনের এই দুটি আপাত বিপরীত রূপ আসলে পরস্পর পরিপূরক (complementary)—প্রতি-বাদক (contradictory) নয়। প্রকৃতির রাজ্য আধুনিক বিজ্ঞানীরা আপাতবিরোধী নৈশ্চিত্য (Determinism) এবং অনৈশ্চিত্য বা আক-স্মিকতা (Indeterminism) রূপ যে দুটি বিধানের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, তারাও আসলে যে পরস্পরের পরিপূরক এবং প্রতিবাদক নয়, একথা বলা যায়। এই বিরোধের মূল হচ্ছে, আমাদের অন্তর্দৃষ্টির বা মনের উপলব্ধির সীমা। কারণ দ্রষ্টার সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে দৃষ্টের প্রকৃত স্বরূপ যায় বিকৃত হয়ে—একথা আগেই বলা হয়েছে। মানুষের জীবনে স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) এবং অদৃষ্ট, প্রারব্ধ বা ভাগ্য (Destiny, Fate, Determinism)—এই দুয়ের বিরোধকেও আমরা পরস্পরের পূরক হিসাবে গণ্য করতে পারি। এই প্রসঙ্গে জীব-বিজ্ঞান থেকে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। অভিব্যক্তি বাদ (Evolution theory) অনুসারে জীবকোষের RNA বা DNA-এর অণুর অভ্যন্তরে যে সব আকস্মিক পরিব্যক্তি (Mutation) ঘটে, তাদের মধ্যে মাত্র যে কোন একটিই অভিব্যক্তির পক্ষে কার্যকরী হয়। বাকী সব অকেজো হয়ে পড়ে। জীবের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় এই আকস্মিকতার প্রভাব দেখা যায়; কিন্তু আসলে এর অন্তরালে আছে কোন নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য (Purpose)। অন্য কথায় বলা যায়, কার্য-কারণের (Causality) নির্দিষ্ট ধারা এবং দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায়ের (Pur-pose) আকস্মিকতা (Chance) কিংবা আরো সংক্ষেপে, সৃষ্টি (Cosmos) এবং অনাসৃষ্টি (Chaos) হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক। [ ঐক্যের বা একের সঙ্গে বৈচিত্র্যের বা বহুর যে আপাত বিরোধ, তাও আসলে পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। ]

এভাবে বিচার করলে বলা যায়, বিশ্বপ্রকৃতিতে জড় ও শক্তিই একমাত্র বাস্তব সত্তা বা সত্য (Reality) নয়; শুভবুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অভিপ্রায় এবং আদর্শও অবাস্তব বা অসৎ (Unreal) নয়। অথবা বলা যায় সৃষ্টি রাজ্যে শুধু তামসিক (material) এবং রাজসিক (energetic) সত্তাই একমাত্র বাস্তব নয়, এদের পরিপূরক সাত্ত্বিক (spiritual) সত্তাও আছে প্রকটিত বা

প্রচ্ছন্ন হয়ে। বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন এবং ধর্মের বিরোধের যে সমস্যা, তার সমাধান মিলে এখানে।

বিজ্ঞানহীন ধর্মের এবং ধর্মহীন বিজ্ঞানের অনুশীলনে পৃথিবীতে আজ যে সব গুরুতর সমস্যার ও মানব-সভ্যতার যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানের প্রতিকার মিলতে পারে মানুষ যদি বিজ্ঞানের কর্মবুদ্ধিকে ধর্মের শুভবুদ্ধি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও শোধিত করে প্রয়োগ করে বিশ্বমানবের কল্যাণের কাজে। বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-কর্মীদের আজ এই হলো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের উক্তি মনে পড়ে—

"Science without religion is lame and religion without science is blind."

'ধর্মবিহীন বিজ্ঞান হচ্ছে খোঁড়া এবং বিজ্ঞানবিহীন ধর্ম হচ্ছে কানা'। এই অবস্থায় একমাত্র দিশারী হচ্ছে—প্রাচীন ভারতের উপনিষদের বাণী :

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগেই হচ্ছে ভোগের সার্থকতা। বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগে মানুষ যে বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় ও ভোগ সম্ভোগের উপকরণ নির্মাণ করছে, সর্বভূতের হিতার্থে ত্যাগেই হতে পারে তার একমাত্র সার্থকতা।

# মহেন্দ্রলাল সরকার ও বাংলা দেশে বিজ্ঞান-গবেষণার সূত্রপাত

সমরেন্দ্রনাথ সেন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নতুন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই আলোচনা-চক্রে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, তথা সারা ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রয়াসকে। বিজ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির পথ কিভাবে সুগম করা যেতে পারে, সে বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত ধারণাকে রূপায়িত করবার সংকল্প মহেন্দ্রলাল গ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে ঠিক এক-শ' বছর আগে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Calcutta Journal of Medicine-এ মহেন্দ্রলাল এই বিষয়ে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি প্রথমে জোরের সঙ্গে বলেন—বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের স্বকীয়তার কথা। ভারতীয় চিন্তাধারা ধর্ম-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপ্লুত, সে চিন্তাধারায় বিজ্ঞানের বিশেষ কোন স্থান নেই কিংবা বিজ্ঞান-চর্চায় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার ব্যাপারে ভারতীয়েরা চিরকালই উদাসীন ও অক্ষম কিংবা বিজ্ঞান ইউরোপীয় মানসের একমাত্র বৈশিষ্ট্য—এই ধরণের অপপ্রচারের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন সাধারণভাবে ইউরোপীয়দের ও বহু বিশিষ্ট ভারতীয়দের এক প্রকার বদ্ধমূল ধারণার যে, এদেশের মাটি বিজ্ঞান-চর্চার অনুকূল নয়।

তিনি দেখলেন, এদেশের মাটি বিজ্ঞান-চর্চার পক্ষে খুবই অনুকূল. তবে অনুকূল নয় পরিবেশ; অর্থাৎ বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন-নীতি এদেশে যে পরিবেশের সৃষ্টি করে, অনুকূল নয় সেই পরিবেশ। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন

এমন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করবার, যেখানে এদেশের সন্তানেরাই গবেষণায় ব্রতী হবেন, গবেষণার ধারা নির্দেশ করবেন ; অর্থাৎ এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা তৈরি, পুষ্ট ও পরিচালিত হবে ভারতীয়দের উদ্যোগে কেবলমাত্র ভারতীয়দের জন্যে। এই উদ্দেশ্যে অবিচলিত থাকবার পথে মহেন্দ্রলালকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, অর্থাভাবকে মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু এই আদর্শ থেকে তিনি কোন দিনই বিচ্যুত হন নি। তাঁর কল্পনা-প্রসূত এবং তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থাপিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের ইতিহাস এই আদর্শের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এই যে একান্তভাবে ভারতীয়দের দ্বারা ও ভারতীয়দের জন্যে একটি বিজ্ঞানাগার তৈরি করবার সংকল্প, আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে তা অতি স্বাভাবিক মনে হলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে তা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। ইউরোপের সঙ্গে এদেশের যোগাযোগ ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলে, বলতে গেলে অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগ কি তারও আগে থেকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও তার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা এদেশে আসতে আরম্ভ করেছিল। এই বৈশিষ্ট্যের বার্তা বহন করে এনেছিলেন জেসুইট ধর্মযাজকেরা, কিছু কিছু চিকিৎসক ও প্রাণিবিদ, জরিপের কাজে নিযুক্ত ইউরোপীয় গণিত ও জ্যোতিষে পারদর্শী পরিমাপক বা সার্ভেয়ারদের দল আর সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারেরা।

একটা বিরাট দেশকে শাসন করতে হলে দরকার—সেই দেশ সম্বন্ধে, তার মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান। এটা একটা অতি পুরনো স্বীকৃত রীতি। অ্যারিস্টটলের পরামর্শ মত আলেকজাণ্ডার তাঁর বিশ্ব-অভিযানে বিজ্ঞানীদের একটা বড় দল সব সময় সঙ্গে রাখতেন। রোমকেরা সে দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হয় নি। আর বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীদের তো কথাই নেই! তাই আমরা দেখি, মালাবারের ওলন্দাজ গভর্নর ভ্যান রীড ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের উদ্ভিদ-সম্পদ পরীক্ষা করে বিরাট বই লিখলেন। লিনিয়াসের শিষ্য জেরার্ড কোয়েনিগ, উইলিয়াম রক্সবার্গ, প্যাট্রিক রাসেল, অ্যাণ্ডার্সন, বুকানন-হ্যামিলটন এবং আরও অনেকে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের উদ্ভিদ ও প্রাণিরাজ্যের উপর অপূর্ব গ্রন্থরাজি সংকলন করলেন। কোম্পানীর সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেল ভারতবর্ষের মানচিত্র নতুন করে আঁকলেন। টমাস ডীন পিয়ার্স, রুবেন বারো, মাইকেল টপিং, হেনরি কোলব্রুক জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নিখুঁতভাবে বের করলেন। ত্রিভুজ ও ত্রিকোণমিতির পদ্ধতিতে জরিপের পথ নির্দেশ করলেন উইলিয়াম ল্যাম্বটন। ভূবিদ্যা ও ভূনিম্নস্তরের ঐশ্বর্যের হদিশ দিলেন বেঞ্জামিন হাইন, ওয়েস্টলি ভোয়াসে, টমাস ওল্ডহ্যাম। এই সব ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্যে এবং সেই সব আবিষ্কার ও আলোচনা পত্রিকার আকারে লিপিবদ্ধ করবার জন্যে স্থাপিত হলো এশিয়াটিক সোসাইটি। নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ জোরদার করবার জন্যে স্থাপিত হলো ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল, জিওলজিক্যাল ইত্যাদি সমীক্ষাগার।

প্রায় এক শতাব্দীর উপর ভারতীয়েরা চোখের সামনে এসব হতে দেখলো, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক তৎপরতায় বিস্মিত হলো, কিন্তু সেই বিজ্ঞানের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারলো না। প্রথমতঃ সুযোগের অভাব। দ্বিতীয়তঃ সমীক্ষার কাজে গোপনীয়তার অজুহাতে এদেশীয়দের প্রবেশ-নিষেধের কড়া ব্যবস্থা। সমীক্ষার ইতিহাসে

দেখা যায়, প্রথম যুগে দূরবর্তী অঞ্চলে সার্ভেয়ারেরা অনন্যোপায় হয়ে ভারতীয়দের নিয়োগ করলে উপরওয়ালার কাছ থেকে রীতিমত ধমক খেয়েছেন। একবার এক মিলিটারী অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল সার্ভেয়ার-জেনারেলকে লিখে জানালেন, সমীক্ষার কাজে এদেশীয়দের নিয়োগ করা বা কাজ শেখানো সরকার বরদাস্ত করবেন না। তবু এরই ফাঁকে ফাঁকে অধস্তন অবস্থায় থেকেও দু-চার জন ভারতীয় আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ভ্যান রীডের Hortus Malabaricus-এর ছবিগুলি এঁকেছিলেন এক মালাবারী ব্রাহ্মণ। মাদ্রাজ মানমন্দিরে মাইকেল টপিং-এর জ্যোতিষীয় গবেষণায় সাহায্য করতেন এক তামিল ব্রাহ্মণ। আরও পরে হিন্দু কলেজের ছাত্র রাধানাথ শিকদার জর্জ এভারেষ্টের সঙ্গে কাজ করে হিমালয়ের সর্বোত্তুঙ্গ শৃঙ্গটির উচ্চতা মেপেছিলেন। কিন্তু এসব হলো নিয়মের ব্যতিক্রম।

ইংরেজ এদেশে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা যে একেবারেই করে নি, সে কথা অবশ্য বলবো না। ১৭৯৩ সালের পার্লামেন্টে উইলবারফোর্সের উদ্যোগে আনীত ভারতীয়দের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এদেশে ইংরেজ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন জনমতের চাপে এবং তাতে বিজ্ঞান পড়াবারও ব্যবস্থা ছিল, একথা সত্য। কলকাতার মাদ্রাসায় ও সংস্কৃত কলেজে বিজ্ঞান পড়াবার চেষ্টা হয়েছিল। পাশ্চাত্য মতে ডাক্তারী পড়াবার জন্যে নেটিভ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশন, সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসায় ডাক্তারী ক্লাশ ইত্যাদি খোলা হয়েছিল, যা থেকে পরে উদ্ভব হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের। হিন্দু কলেজের কথা তুলছি না, কারণ সেটার কৃতিত্ব পুরাপুরি বাঙালীদের। এই সব প্রতিষ্ঠানে বেশ কয়েকজন কৃতী ও দরদী ইউরোপীয় শিক্ষককেও আমরা অধ্যাপনার কাজে ব্রতী থাকতে দেখেছি; যেমন—ব্রেটন, টাইটলার, ওসোগনেসি, ওয়ালিচ, গুডইভ এবং আরও অনেকে। তবু এই সব শিক্ষায়তন থেকে সত্যিকারের বিজ্ঞানী তৈরি হলো না কেন? এদেশের জনমানসে বিজ্ঞান তার ন্যায্য স্থান অধিকার করতে অসমর্থ হলো কেন?

ঠিক এই জিজ্ঞাসাই ছিল মহেন্দ্রলাল সরকারের। গভর্ণমেন্টের শিক্ষায়তনের মধ্যে তিনি এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর খুঁজে পান নি। যে শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কিছু সংখ্যক সাব-অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জেন বা সাব-অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্ভেয়ার তৈরি করা অর্থাৎ নীচুতলার কিছু জোগাড়ে তৈরি করা। সে ব্যবস্থা যত মজবুদই হোক, তার ভিতর থেকে বিজ্ঞানীর উদ্ভব সম্ভব নয়। আরো একটি জিনিষ তিনি পরিষ্কারভাবে প্রণিধান করেছিলেন—কেবল স্কুল-কলেজের শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কেউ কোন দিন বিজ্ঞানী হতে পারে না। গবেষণার মধ্য দিয়েই গবেষক বা বিজ্ঞানী জন্মায়। তার জন্যে দরকার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, লেবরেটরী ইত্যাদি। তাঁর নিজের কথায়, অবশ্য বাংলা অনুবাদ—

"বর্তমানে আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষ্টির একটা দুঃখজনক অভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই অভাব স্কুলের শিক্ষার দ্বারা দূর হবার নয়, যত ভালভাবেই গভর্ণমেন্ট সেখানে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করুন না কেন।...বিজ্ঞানী হতে হলে একটা বিষয় নিয়ে লেগে থাকতে হবে। সে বিষয়ে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। এর ফলে সে যে জ্ঞানের অধিকারী হবে, তাতে বুঝতে পারবে, সেই জ্ঞানের অসংগতি বা ত্রুটি কোথায়? তখনই সে বুঝবে, কেমন করে নতুন

গবেষণার দ্বারা সে নিজেকে ও তার বিজ্ঞানকে আরও উন্নীত করতে পারবে।"

তারপর তিনি বললেন—

"এরূপ বিজ্ঞানীর অভাবে প্রয়োজন দেখা দিলেই সরকার ইংল্যাণ্ড থেকে লোক নিয়ে আসেন। এমন কি, শিক্ষায়তনে অধ্যাপনার জন্তেও লোক আসেন ইংল্যাণ্ড থেকে।...আমার প্রস্তাবিত গবেষণাগার সফল হলে এদেশেও সে রকম লোক তৈরি না হবার কোন কারণ আমি দেখি না।...অবশ্য ইল্যাণ্ডে ডেভিড ব্রুস্টার বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন এবং কাউণ্ট রুমফোর্ড রয়্যাল ইনষ্টিটিউশনের মত যে ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন, আমি সে রকম একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে পারবো, আপাততঃ এমন ভরসা করি না, তবে আমার চেষ্টা সফল হলে কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠানও ওদের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়ে উঠবে, এই আশা আমার আছে।"

মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁর প্রস্তাব ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যখন এগিয়ে এলেন, বাংলা দেশে তখন রেনেশাঁসের যুগ সুরু হয়ে গেছে। চিন্তায় ও কর্মে বাঙালী তখন নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। তাই মহেন্দ্রলালের সংকল্পের খবর পেয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন বাংলার প্রগতিবাদী শিরোমণিগণ, যাঁরা শিক্ষায়, সাহিত্যে, ধর্মে সমাজ-ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রচিন্তায় এই জাতির পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, দিগম্বর মিত্র, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, নীলমণি মিত্র, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার লাফোঁ, পাতিয়ালা, কুচবিহার ও ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজারা, কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী এবং আরো অনেকে।

মহেন্দ্রলালের সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিকল্পনার সমকালে ইণ্ডিয়া লীগ একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাবে সরকারের বিশেষ সমর্থন ছিল। তার প্রধান কারণ, কারিগরী শিক্ষা পেলে দেশের যুবকদের সহজে কাজের সংস্থান হতে পারে। তখন দেশে বেকার সমস্যা প্রবল। অনেকেই চাইলেন, এই প্রস্তাবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি বড় রকমের কারিগরী শিক্ষায়তনই গড়ে তোলা হোক। কিন্তু মহেন্দ্রলাল তাতে রাজি হন নি। তিনি বললেন, "আমরা চাই বিজ্ঞানের পূজারী সৃষ্টি করতে। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য হবে—যে গৌরব থেকে ভারতবর্ষ ভ্রষ্ট হয়েছে, বিজ্ঞানের সেই গৌরবের আসনে তাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করা। বিপুল সম্ভাবনাময় যে মন ভগবান আমাদের দিয়েছেন, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে আমি চাই তার বিচিত্র ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ। আপনারা শুধু আমাকে অর্থ দিন, প্রচুর অর্থ।"

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সালে। মহেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করেন ১৯০৪ সালে। এই দীর্ঘ ২৮ বছর তিনি তাঁর স্বপ্নকে রূপায়িত করবার জন্তে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি যা অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন বাড়ী তৈরি করতে, লেবরেটরীর যন্ত্রপাতি আর বইপত্র কিনতেই তা ফুরিয়ে যায়। মেধাবী ছাত্রদের জন্তে কয়েকটি স্কলারশীপেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় ও তারপর বহু বছর পর্যন্ত মাইনে দিয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করা অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গতিতে কুলোয় নি। এই দীর্ঘ ২৮ বছর তিনি নিজে বিনা পারিশ্রমিকে পদার্থবিদ্যা ছাত্রদের পড়িয়েছেন, এক্সপেরিমেণ্ট দেখিয়েছেন আর প্রায়ই ইউরোপের সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক কীর্তিকলাপের উপর সাধারণ সভায় মনোজ্ঞ

বক্তৃতা দিয়েছেন, যাতে তাঁর দেশবাসীরা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ এক অদ্ভুত নিঃস্বার্থ মিশনারী প্রচেষ্টা। তাঁর আহ্বানে ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা নীরবে দেশ গড়ার এই মহান কাজে এগিয়ে এসেছিলেন এবং নিজেদের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে অধ্যাপনা করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ফাদার লাফোঁ, এ. ডি. পেনারাণ্ডা, তারাপ্রসন্ন রায়, রামচন্দ্র দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, চুণিলাল বসু, নীলরতন সরকার, গিরিশচন্দ্র বসু, বনোয়ারিলাল চৌধুরী প্রমুখ নামকরা বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ্‌গণ।

প্যারিস থেকে ফাদার লাফোঁ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কিনে এনেছেন, লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিক্রেতা মেসার্স ইলিয়ট ব্রাদার্স নানা রকমের দামী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছেন, যন্ত্র কেনা হয়েছে ১৮৮৪ সালের কলকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী থেকে। এসব যন্ত্রপাতি কেনবার জন্যে যাঁরা বড় রকমের অর্থ সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—তিনি দেন ২৫,০০০ টাকা। লেবরেটরী গৃহ-নির্মাণে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা দিয়েছিলেন ৪০,০০০ টাকা। এমনিভাবে সম্পূর্ণ বেসরকারী চেষ্টায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের মর্মকেন্দ্র এই কলকাতা মহানগরীতে নেটিভরা গড়ে তুললেন এক চমৎকার আধুনিক বিজ্ঞানাগার। কলকাতার আর কোন শিক্ষায়তনেই এর তুলনা ছিল না। এমন কি, বহু প্রচারিত ও বহু অর্থপুষ্ট প্রেসিডেন্সী কলেজও ছিল মহেন্দ্র সরকারের লেবরেটরীর কাছে নিষ্প্রদীপ।

মহেন্দ্রলাল অবশ্য তাঁর স্বপ্নের পূর্ণ পরিণতি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর আকাঙ্ক্ষাও বহুলাংশে অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বেতনভোগী অধ্যাপক নিয়োগ করতে। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল এই লেবরেটরী থেকে মৌলিক গবেষণার ফল বের হোক, দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ পত্র-পত্রিকায় তা ছাপা হোক। কিন্তু শিক্ষায়তনের গণ্ডী ছাড়িয়ে উপরে উঠতে তিনি অ্যাসোসিয়েশনকে দেখে যেতে পারেন নি। এজন্যে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

আমরা এখন জানি, মহেন্দ্রলালের সে স্বপ্ন অপূর্ণ থাকে নি। তিনি যে উর্বর ক্ষেত্র রচনা করে গিয়েছিলেন, তাতেই অঙ্কুরিত ও মুকুলিত হতে পেরেছিল রামনের প্রতিভা। ১৯০৭ সালে রামন অ্যাসোসিয়েশনে গবেষণা সুরু করেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানী-সমাজে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর গবেষণার ফল ছাপা হতে আর প্রশংসা পেতে থাকে। ১৯১৭ সাল থেকে পরপর কয়েক-বছর অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে Science convention নামে এক আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই Convention-এর প্রথম অধিবেশনে অধ্যাপক রামন 'বাংলা দেশে পদার্থ-বিদ্যার অগ্রগতি' এই নামে যে প্রবন্ধ পড়েন, তাতে তিনি এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত ও উন্নতিতে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের মৌলিক ভূমিকা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেন। তিনি বললেন ( বাংলা অনুবাদ ):

"গত দশ বছরের দিকে ফিরে তাকালে আমাদের প্রত্যেকেরই চোখে পড়বে, পদার্থবিদ্যার উচ্চস্তরের অধ্যয়নে ও গবেষণায় সত্যিকারের অগ্রগতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে একটি খাটি ফিজিক্স স্কুলের গর্ব করতে পারে, যে রকমটি ভারতের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যাবে না। এমন কি, ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন যে সব ফিজিক্স স্কুল আছে, তাদের তুলনায় আমাদেরটি মোটেই খারাপ নয়।... কলকাতায় আমার নিজের গবে-

ষণার সূত্রপাত ১৯০৭ সালে। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ডাঃ অমৃতলাল সরকার লেবরেটরীর সব রকম সুযোগ আমাকে দেন এবং আমার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরেও লেবরেটরীর দরজা খোলা রাখেন, যাতে ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে সারাদিনের কাজের পর আমি গবেষণা করতে পারি। ক্রমে ক্রমে আরো অনেকে আমার সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। এসব চেষ্টায় আমাদের সাফল্যের একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে, গত দশ বছরে অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত ১৪টি বিশেষ ধরণের বুলেটিন, ৩ ভলুম প্রোসিডিংস আর তার বার্ষিক রিপোর্টে। এই সব প্রকাশন বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি বিদগ্ধ সোসাইটি ও প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে স্থাপন করেছেন তাদের মূল্যবান প্রকাশন বিনিময়ের সম্পর্ক। আমাদের প্রকাশনগুলি বিদেশের পত্র-পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছে, বিদেশী বিজ্ঞানীদের প্রবন্ধে ও বইয়ে স্থান পেয়েছে।...শুধু তাই নয়, গত তিন বছরে কলকাতার এই ফিজিক্স স্কুল থেকে Philosophical Magazine, Nature ও Physical Review-এর মত নামজাদা ও বহুল প্রচারিত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ২৫টি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত বা প্রকাশনের জন্যে গৃহীত হয়েছে।"

এর পর বক্তব্য আমার খুব সংক্ষিপ্ত। মহেন্দ্রলাল সরকারের লেবরেটরীতে কাজ করেই প্রোফেঃ রামন ১৯২৪ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন এবং ১৯৩০ সালে ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পান। অ্যাসোসিয়েশনের লেবরেটরীতে কাজ করে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কে. এস. কৃষ্ণান, সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এস. ভগবন্তম, সি. মহাদেবন, কে. আর. রামনাথন, এল. এ. রামাদাস, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। এঁরা সবাই পরবর্তী কালে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের নেতৃত্ব করেছেন এবং জীবিতদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও করছেন।

সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এক-শ' বছর আগে যিনি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের বিজ্ঞানে উন্নতি সম্বন্ধে এভাবে ভেবেছিলেন ও নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গিয়েছেন, সেই মহেন্দ্রলাল সরকারকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। আরও দুঃখের কথা, যে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথিকৃৎ, জাতীয় গবেষণাগারের মর্যাদা ও স্বীকৃতি এখনও তার ভাগ্যে জুটলো না।

# আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা

শ্রীনির্মলেন্দুনাথ রায়

ভারতকে সভ্যজগতের উচ্চস্তরে তুলে ধরবার জন্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যাঁরা নানাভাবে কাজ করেছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ভারত তখন ছিল ইংরেজের অধীন। এই দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূলে ছিল ইংরেজের স্বার্থ। ভারতবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য—এমন কি, পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড থেকে আনা হতো। ঔষধপত্র এবং নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ বিদেশ থেকে আমদানী করা হতো। এইভাবে ভারতের বহু অর্থ বিদেশে চলে যেতো। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চেয়েছিলেন দেশের এই ক্ষতি নিবারণ করতে। বাল্যকালেই তিনি বুঝেছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ। সেই কারণে নিজের জন্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন বিজ্ঞান-সাধনার পথ।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে তিনি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই সময় এই কলেজে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না থাকায় ফিজিক্স এবং কেমিষ্ট্রী পড়তে তিনি যেতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার ছিলেন রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। তাঁর অধ্যাপনায় আচার্যদেব রসায়নশাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করে তিনি অধ্যাপক ক্রাম ব্রাউনের লেবরেটরীতে রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন এবং রাসায়নিক গবেষণা আরম্ভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে 'পালিত অধ্যাপকরূপে' তিনি রাসায়নিক গবেষণার কাজ থেকে কোন দিনই বিরত হন নি। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের যাতে প্রয়োগ হতে পারে সেই জন্যে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে স্নাতকোত্তর বিভাগে ফলিত রসায়নের পাঠ এবং গবেষণার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দেন। জৈব এবং অজৈব রসায়নে বহু গবেষণা তিনি নিজে করেছেন এবং তাঁর অগণিত ছাত্রদের করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এই সব গবেষণালব্ধ তথ্য তিনি দেশ ও বিদেশের নানা পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই সর্বপ্রথম সারা জগৎকে দেখালেন যে, ভারতবাসী মৌলিক গবেষণা কার্যের অনুপযুক্ত নয়।

রাসায়নিক গবেষণাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা এবং এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবার জন্যে তিনি নিয়মিতভাবে কঠিন পরিশ্রম করতেন। স্বাস্থ্য তাঁর কোন দিনই ভাল ছিল না। কিন্তু আজীবন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কঠিন পরিশ্রম করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পরিমিত আহার এবং নিয়মনিষ্ঠার জন্যে। প্রতিদিন প্রতিটি কাজ ঘড়ির কাটার সঙ্গে সঙ্গে করতেন, কোন ব্যতিক্রম হতো না। লেবরেটরীতে বসে থাকতেন—সম্মুখে থাকতো তাঁর ঘড়ি। সময়ের অপব্যবহার তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাস, দাবা, পাশা খেলে যারা সময় নষ্ট করে, তাদের সম্বন্ধে তিনি খুব কঠোর মন্তব্য করতেন। ফুটবল

যারা খেলে তাদের পছন্দ করতেন, কিন্তু খেলা দেখবার জন্যে সময় নষ্ট করা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বলতেন—বাইশ জন খেলে আর বাইশ হাজার লোক বসে বসে দেখে সময় নষ্ট করে। তাঁর এক প্রিয় ছাত্র ভবানীপুর থেকে সায়েন্স কলেজে যাতায়াত করতো। তাকে নিজের কাছে এনে রাখলেন। বুঝিয়ে দিলেন, যাতায়াতে প্রত্যহ ২ ঘণ্টা ট্রামে সময় কাটানো মানে বছরের বারো মাসের এক মাস ট্রামের ভিতরে কাটিয়ে দেওয়া। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার মূল মন্ত্র ছিল কঠিন পরিশ্রম এবং সময়ের সদ্ব্যবহার।

আচার্যদেব তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, তাদের নিজ সন্তান মনে করতেন। সে যুগের ছাত্রেরাও তাঁর কাছে খাবার এবং তাঁর কথা শোনবার সুযোগ পেলে নিজেদের চরিতার্থ মনে করতো। প্রায় অর্ধ শতাব্দী তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও চরিত্রের দ্বারা তাঁর ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন। আচার্যদেবের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠলো বাংলা দেশে, তথা সমগ্র ভারতে একটি রাসায়নিক গোষ্ঠী। রসিকলাল দত্ত হলেন রসায়নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি. এস-সি এবং তারপর বিমানবিহারী দে, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সরকার, প্রিয়দারঞ্জন রায়, রাসায়নিক গবেষণায় এবং তাঁর অপর দু'জন ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাদ সাহা পদার্থবিদ্যায় এবং গণিত শাস্ত্রে গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। এই সব প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকগণ নিজ নিজ ছাত্রের দ্বারা তাঁদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন এবং এইভাবে এক বিরাট ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টিই তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল

গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার তাঁর জীবনের সাধনা হলেও তিনি বুঝেছিলেন, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে নিজের উপার্জিত অর্থের দ্বারা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস নাম দিয়ে একটি রাসায়নিক শিল্পের ছোট কারখানা স্থাপন করেন। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ১৯০২ সালে ঐ নামে একটি লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং তাঁর চেষ্টায় ও পরামর্শে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। শুধু বেঙ্গল কেমিক্যাল নয়—তৎকালে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলা দেশে একটিও ছিল না, যার সঙ্গে আচার্যদেব জড়িত না ছিলেন। শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রের বহু ব্যক্তি বিজ্ঞান কলেজে আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। আসতেন শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়, আসতেন ক্যালকাটা পটারিজের তদানীন্তন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, আসতেন যশোরের একটি স্বদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং এইরূপ আরও অনেকে।

ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন ব্যবসার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করতে—চাকুরী করা পছন্দ করতেন না। অর্থের অভাব ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধক—এটা তিনি কোন দিন বিশ্বাস করতেন না। বলতেন—কঠিন পরিশ্রম ও নিষ্ঠাই ব্যবসায়ের মূল মন্ত্র। প্রায়ই তিনি বলতেন—জানিস আলামোহন দাশ প্রথম জীবনে কি কষ্ট করেছিল? বলতেন সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথা, বলতেন ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা। ছোট ব্যবসায়কেও উপেক্ষা করতেন না। এক ভদ্রলোক লজেঞ্জের ব্যবসা আরম্ভ করেন। আচার্যদেবের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পাবার জন্যে এক বোতল লজেঞ্জ তাঁকে পরীক্ষা করতে

দিয়েছিলেন। তিনি নিজে খেয়ে এবং ছাত্রদের খাইয়ে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। আর একবার অপর এক ব্যক্তি নিজ কারখানায় প্রস্তুত দেশলাই তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে পরীক্ষা করে 'ড্যাম্পপ্রুফ' এই প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। এরকম ঘটনা প্রায়ই হতো।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দুখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের কীর্তি হলো 'History of Hindu Chemistry' (হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস)। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, প্রাচীনকালে ভারতে হিন্দুরা রাসায়নিক জ্ঞানে কত উন্নত ছিল। চরক, সুশ্রুত নাগার্জুন প্রভৃতির দ্বারা লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করে তিনি দেখিয়েছেন, বিবিধ ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং অজৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রস্তুত-প্রণালী তৎকালে ভারতবাসীর জানা ছিল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এই সব পদার্থের অনেকগুলির ঔষধরূপে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। মকরধ্বজ এগুলির অন্যতম। আচার্যদেবের প্রেরণায় বেঙ্গল কেমিক্যাল মকরধ্বজ প্রস্তুত আরম্ভ করে।

তাঁর শেষ জীবনের কীর্তি 'Life and Experiences of a Bengali Chemist'। এই বইটিতে তাঁর নিজের জীবনকাহিনীর সঙ্গে জড়িত বাংলা দেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা আছে, আর আছে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের কথা।

আচার্যদেবের ব্যক্তিগত জীবন ছিল প্রাচীনকালের আর্য ঋষিদের ন্যায়। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ খুবই সাধারণ ছিল—বিলাসিতার কোন স্থানই সেখানে ছিল না। তাঁর এই প্রকার বেশ-ভূষার জন্যে অপরিচিত দর্শনার্থীরা প্রথম দর্শনে অনেক সময় তাঁকে চিনতে পারতেন না। এই সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত শীর্ণদেহ ছোটখাটো মানুষটি ছিলেন অফুরন্ত কর্মের উৎস—যা থেকে প্রেরণা লাভ করলেন তাঁর ছাত্রমণ্ডলী। আজ তিনি নেই, কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর অতুলকীর্তি, যার একটি অংশের প্রকাশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পাওয়া যায়। রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্র এখন বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়েছে। যাঁরা গবেষণা কার্যে রত, তাঁদের সংখ্যাও দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। এসব দেখে প্রাচীন কালে ভারতের ঋষিদের উক্তিটি বার বার মনে পড়ে—সৃষ্টির মূল কথা "তিনি ছিলেন প্রথমে এক, কিন্তু পরে বহুরূপে প্রকাশিত হলেন"।

---

[ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে ৩০শে মার্চ '৬৯ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ ]

# আশুতোষ ও বিশ্ববিদ্যালয়

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

বিশেষ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। পরিষদের ইতিহাসে একুশ বছর পরে এক নতুন যুগের সূচনা হলো। এই উপলক্ষ্যে আজকের এই আলোচনা-সভা আয়োজিত হয়েছে। যে সকল মনীষীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা দেশে অতীতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল, আজকের এই পুণ্যদিনে আমরা তাঁদের পরম ভক্তিভরে স্মরণ করে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। 'বাংলার বাঘ' খ্যাতিসম্পন্ন আশুতোষ ছিলেন এই সকল পথিকৃৎদের অন্যতম। আশুতোষের ঘটনাবহুল জীবনের ধারাবাহিক দিনপঞ্জী আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। বাংলা, তথা ভারতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা তাঁর দূরদর্শিতা, তাঁর বিপ্লবী সংস্কার, তাঁর স্বাজাত্যবোধ এবং তাঁর অপূর্ব কর্মযোগের সাধনার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো।

বাংলা, তথা ভারতের রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের প্রবর্তক ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই থেকে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন মনীষী দেশ ও দশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়াসে তাঁদের উন্নত ধ্যান-জ্ঞান ও চিন্তার মহৎ আদর্শ আমাদের জন্যে রেখে গেছেন। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা ছিলেন আশুতোষের পূর্বসূরী। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা-জীবনের প্রতিটি স্তরে তাঁর মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন এবং যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু সোসাইটি এবং সভার তিনি সদস্য, ফেলো ও সভাপতি হবার গৌরব লাভ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এল. এবং সম্মানসূচক ডি. এস-সি, ঢাকার সারস্বত সঙ্ঘের সমাজ সরস্বতী ও শাস্ত্রবাচস্পতি, বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী ইত্যাদি এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নাইট উপাধি প্রভৃতিতে ভূষিত ছিলেন বাণীর বরপুত্র আশুতোষ।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে আমরা পরিচয় পাই বিজ্ঞানী আশুতোষের। গণিতের বিশেষ এক শাখায় তাঁর গবেষণা বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল এবং তখনকার দিনে গণিতজ্ঞদের ধারণা ছিল যে, আশুতোষ যদি আজীবন গণিতের সেবাই করতেন, তাহলে বিশ্বের সেরা গণিতজ্ঞদের আসরেই তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। গণেশ-প্রসাদ বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতের ভাস্করাচার্যের পরে আমাদের দেশে আশুতোষের ন্যায় গাণিতিক প্রতিভা আর জন্মগ্রহণ করে নি। আশুতোষের নিয়তি কিন্তু তাঁকে চালিত করলো অন্যপথে। তিনি বেছে নিলেন এক মহান ব্রত—শিক্ষা-সংস্কারের মাধ্যমে দেশসেবা। তখনকার দিনে সেরা ছাত্রদের পক্ষে সরকারী উচ্চপদ প্রাপ্তি খুবই সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু পরাধীনতার গ্লানির কাছে আত্ম-সমর্পণ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল এবং তাই তিনি স্বাধীনভাবে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, এই কাজে তিনি শিক্ষানবিশী করেছিলেন তদানীন্তন খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষের অধীনে।

আশুতোষের ধ্যান-জ্ঞান ও চিন্তা ছিল

শিক্ষা-সংস্কার প্রসঙ্গে। তাই কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। প্রথমে Bengal Legislative Council এবং পরে Viceroy's Council-এর সদস্যপদও লাভ করেন। এরই ফলে তিনি তদানীন্তন সরকারী রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং পরে বিভিন্ন প্রদেশে আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। তখনকার দিনে এই সব বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রীদানের যন্ত্রস্বরূপ মাত্র—শিক্ষাদান মূলতঃ কয়েকটি কলেজে সীমাবদ্ধ ছিল। লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি নিজ দেশে শিক্ষা-সংস্কারে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯০৪ সালে 'ভাইসরয়স্ কাউন্সিলে' ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপিত হলো। বলা বাহুল্য, কাউন্সিলের সদস্য অধিকাংশ ইংরেজ, ভারতীয় প্রতিনিধি দু-জন—পুণার মহামতি গোখেল, বাংলার তেজস্বী আশুতোষ। বিলটির প্রধান বিষয়বস্তু প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। সংক্ষেপে—প্রথমতঃ কলেজগুলির সংস্কার সাধন, দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুনর্গঠন এবং তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যতালিকা ও পরিচালনা-পদ্ধতি নির্ধারণ। দেশের অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনসাধারণের মানসে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র অঙ্কুরিত হয়েছে—স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব ব্যাপকভাবে দেশ-বাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। শিক্ষিত মহলে তীব্র সমালোচনা চললো। এঁদের মধ্যে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ মনীষি-বৃন্দ। গোখেল এবং আশুতোষও বিলটির তীব্র বিরোধিতা করলেন। কারণ বিলটির বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল বিদেশী শাসকের বিমাতৃসুলভ মনোভাব। বিলটিকে গ্রহণ করার অর্থ হবে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুরাদস্তুর রাষ্ট্রীয় বিভাগে পরিণত করে সর্বপ্রকারে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া। দেশের সমালোচনার ঝড়, গোখেল এবং আশুতোষের বিরোধিতা সত্ত্বেও যথারীতি বিলটি পাশ হলো। পেডলার তখন সরকারী শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, রয়েল সোসাইটির সদস্য—বিদ্যানুরাগী বলে খ্যাত। তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে নিয়োগ করা হলো। তাঁর লক্ষ্য ছিল, নতুন আইনের কাঠামোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি একাজে বিশেষ সাফল্যলাভ করেন নি। তার বিশেষ কারণ বলা যেতে পারে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতি। ১৯০৫ সালে বাংলা দেশ বিভক্ত হলো। দেশ-ব্যাপী বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শিক্ষা-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলো। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষীদের নেতৃত্বে জন্ম নিল National Council of Education। বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আশুতোষ কিন্তু অন্য কথা ভাবছিলেন—হয়তো কর্তৃত্ব পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন অনেকাংশে করা সম্ভব হতো।

তাঁর অন্তর্নিহিত বাসনা রূপায়ণের সুযোগ মিললো। ১৯০৬ সালে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং লর্ড মিন্টোর আমন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন। কথিত আছে—বিচারপতির পদ গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাজে আন্তরিকভাবে কাজ করবার সুযোগ পাবেন—এইরূপ স্বীকারোক্তি করেই তিনি সরকারী পদ গ্রহণে স্বীয় মাতৃদেবীর সম্মতি লাভ করে-ছিলেন। ১৯০৬-'১৪ সাল, সুদীর্ঘ আট বছর ইতিপূর্বে একটানা অন্য কোন উপাচার্যই এই পদ লাভ করেন নি। উপরন্তু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িত ছিলেন। সরকারী বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের অন্যতম দেশীয় প্রতিনিধি সদস্য ও সিণ্ডিকেট সদস্য, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল কলা ও বিজ্ঞান—উভয় বিভাগের প্রেসিডেন্ট, ১৯২২-'২৩ সালে পুনরায় উপাচার্য—আশুতোষ লর্ড লিটনের ভাষায়—"For many years Sir Asutosh was in fact the University and the University Sir Asutosh".

প্রায় সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর কাল তিনি দেশের প্রতিটি স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনে ব্রতী ছিলেন। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রসার ও মান উন্নয়নে তাঁর বৈপ্লবিক সংস্কার সাধনে অচিরে কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয় পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিত্তালয়গুলির অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হলো। এই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি নিজেকে নিঃশেষে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরই এক সমাবর্তন-ভাষণের উদ্ধৃতি থেকে তা অনুধাবন করা যাবে।

"For years now, every hour, every minute I could spare from other unavoidable duties—foremost among them the duties of my judicial office has been devoted by me to University work. Plans and schemes to heighten the efficiency of the University have been the subject of my day dreams, they have haunted me in the hours of nightly rest. To University concern I have sacrificed all chances of study and research, possibly to some extent, the interests of my family and friends and certainly I regret to say, a good part of my health and vitality."

শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর প্রথম সুমহান অবদান হলো মাতৃভাষার মর্যাদা দান। তাঁরই প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্কুল থেকে কলেজে ডিগ্রী ক্লাশ পর্যন্ত মাতৃভাষা বাংলা অবশ্য পাঠ্যরূপে তালিকাভুক্ত হলো। এমন কি, ১৯১১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও পাঠ্য বিষয় হিসাবে চালু হলো। বিশ্ববিত্তালয়ে মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও তিনিই সর্বপ্রথম প্রচলন করলেন। আশুতোষ স্মরণে নেতাজী সুভাষের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—"আজ যে বাংলা ভাষার কথা বলতে পারছি, সে জন্যে আশুতোষের কাছে আমাদের চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।···বিশ্ববিত্তালয়ের ব্যবস্থাপনার ভার আজ পুরাপুরি বাঙ্গালীদের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। বর্তমান সময়ের প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝা বা আন্দোলন দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেলেও তা বিশ্ববিত্তালয়ের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। কারণ সার আশুতোষের উপর জনগণের আস্থা ছিল।···যুবকদের তাই আজ আবেদন জানাই, তারা যেন তিরোভূত এই বিশ্রুত ব্যক্তির শিক্ষার আদর্শকে অনুসরণের স্পর্ধা রাখেন।" শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার প্রাধান্যকে অন্যান্য মনীষীদের মত তিনিও স্বীকার করে গেছেন, তবে সেই ব্যবস্থা তখনই প্রচলনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। একথা অনস্বীকার্য যে, যে ভাষায় আমরা কথা বলি, চিন্তা করি, সেই মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতিরেকে আমাদের শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত হয় না, শিক্ষা আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে না। অন্যান্য প্রদেশে স্ব স্ব ভাষার উৎকর্ষ লাভের সমস্যাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বহু সভায় জাতীয় সংহতি বিধানের প্রধানতম অঙ্গ হিসাবে সেই ব্যবস্থা কার্যকরী করবার বহু প্রস্তাব পেশ করে গেছেন।

প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এবং আইনজীবী

আশুতোষের পরবর্তী অবদান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও আইন শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব একটি ছাপাখানাও তাঁরই উদ্যোগে স্থাপিত হলো। জানা যায়, আবাসিক কলেজের পরিকল্পনা এবং ছাত্রদের সুবিধার্থে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। National Education Council-এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। এর অন্যতম সদস্য সুবিখ্যাত আইনজীবী সার তারকনাথ পালিত এবং সমকালীন অন্যান্য মনীষীদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার প্রসারকল্পে সার পালিতের নিজস্ব বাড়ীতে (বর্তমান বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে) গড়ে উঠেছিল Bengal Technical Council। কর্মজীবনের শেষে দানবীর সার তারকনাথ পালিত স্বকীয় সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার, জমিজমা এমন কি, বসতবাটী পর্যন্ত বাংলা দেশে উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নকল্পে দান করেন। National Education Council-কেই সব কিছু দেবেন স্থির, কিন্তু কি কারণে পুরাপুরি তা না করে আশুতোষের নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে দান করলেন। পরাধীন দেশে বিদেশী সরকারের অপ্রচুর অর্থসাহায্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে দেখে সার তারকনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো কয়েকজন দানবীর অনুরূপ অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সার রাসবিহারী ঘোষ, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, খয়রার মহারাজা, রাণী বাগেশ্বরী প্রমুখ আরও অনেকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে আর একটি সমকালীন দৃষ্টান্ত। উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন রাজা, মহারাজার দানলাভে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গড়ে তুললেন বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। দাতার দান এবং উপযুক্ত গ্রহীতার প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিবিধান অচিরে ফলপ্রসূ হলো। ১৯১৪ সালের ২৭শে মার্চ আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আশুতোষের আমন্ত্রণে রসায়নবিদ্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, পদার্থবিদ্যায় ডক্টর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন এবং গণিতে ডক্টর গণেশপ্রসাদ প্রমুখ মনীষীরা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তাছাড়া কলা বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন ব্রজেন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণান, ভাণ্ডারকর, দীনেশচন্দ্র প্রমুখ খ্যাতনামা বিদ্যোৎসাহী অধ্যাপক-বৃন্দ। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি যে, তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের সেরা ছাত্রদের উপর সার আশুতোষের সতর্ক নজর ছিল। পরীক্ষা পাশের পর এঁরা আশুতোষের কাছে চাকুরী লাভের আশায় আসতেন এবং আশুতোষও প্রয়োজনবোধে এই সকল কৃতী ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপনার কাজে সস্নেহে নিয়োগ করতেন। দেবেন্দ্রমোহন, সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ, শিশির কুমার, জ্ঞানচন্দ্র, নিখিলচন্দ্র, প্রিয়দারঞ্জন প্রমুখ তরুণ বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণায় বিজ্ঞান কলেজ পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করলো। শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে তিনি তখনকার দিনে খ্যাতনামা বহু বিদেশী অধ্যাপকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করতেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার প্রসার ও উন্নয়নকল্পে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রবর্তন করেন এবং উভয় বিভাগের প্রেসিডেন্ট পদে তিনি বহু বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৭ সাল থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হলো। বিভিন্ন কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত অধ্যাপক, রীডার

এবং লেক্‌চারারদের সাহায্যে শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু হলো। উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় আমরা পাই উপাচার্য হিসাবে তার প্রতিটি সমাবর্তন ভাষণে।

১৯০৬ সালে তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন—'It is not the number but the quality of students, it is not the quantum of knowledge but the character of training that is received that determines the position of the University. It is the paramount duty of the University to discover and develop the unusual talent. No University can rightly be regarded as fulfiling the purpose of its existence unless it affords to the best of its students, adequate encouragement to carry on research'. তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা ছিল 'To transform the University as a centre for the cultivation and advancement of knowledge'। আজকের দিনে আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে শিক্ষা-ব্যবস্থা এক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা হয়তো বা আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলতে বসেছি, আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছি। দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট—ছাত্র, শিক্ষক এবং সরকারী শিক্ষা দপ্তরের প্রশাসনিক ক্ষমতায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে—বোধ করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আশুতোষের আদর্শকে পুনর্বার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। ১৯২২ সালে উপাচার্য হিসাবে তাঁর প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন—"To my mind the University is a great storehouse of learning, a great bureau of standards, a great workshop of knowledge, a great laboratory for the training as well of men of thought as of men of action. The University is thus the instrument of the state for the conservation of knowledge, for the distribution of knowledge and above all, for the creation of knowledge-makers."

একথা প্রথমেই বলেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয় বিলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও আশুতোষের উপাচার্যপদ গ্রহণ জনসাধারণের—এমন কি, তখনকার দিনের মনীষীদের মনঃপূত হয় নি। বিভিন্ন বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। উপরন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। তাছাড়া আর্থিক সঙ্কট, সরকারের ঔদাসীন্য প্রভৃতিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে অন্তরায় স্বরূপ ছিল। ১৯২৩ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয় তহবিলে ঘাট্‌তির অঙ্ক প্রায় তিন লক্ষে এসে দাঁড়ালো। কয়েক মাস শিক্ষক এবং কর্মচারী বিনা বেতনে কাজ করে চললেন। তদানীন্তন চ্যান্সেলার লর্ড লীটন বিশ্ববিদ্যালয়কে যথাযথ অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন কতকগুলি অবশ্য পালনীয় সর্তের বিনিময়ে। সে সব সর্ত পালন করবার অর্থ পরাধীনতা মেনে নেওয়া, দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পুরাপুরি ইংরেজ সরকারের খেয়ালখুসীর কবলে বিসর্জন দেওয়া। সিনেট সভায় এই সর্তের তীব্র বিরোধিতা করতে এগিয়ে এলেন প্রবীণ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তাঁকে সমর্থন জানিয়ে আশুতোষ বজ্রকণ্ঠে সিনেটে ঘোষণা করলেন—'Take it from me that as long as there is one drop of blood in me I will not

participate in the humiliation of this University. This University will not be manufactory of slaves. We want to think truly. We want to teach freedom. We shall inspire the rising generation with thoughts and ideas that are high and ennobling. We shall not be a part of the secretariat of the Government. ...Should we barter away our independance for it? ...What will the posterity say? Will not the future generation cry shame that the senate of Calcutta University bartered away their freedom for two and a half lacs of rupees? —We will not take the money'—সরকারী দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। যাঁরা একদিন আশুতোষের তীব্র সমালোচক ছিলেন, তাঁরাও আশুতোষের স্বাজাত্যবোধের জ্বলন্ত নিদর্শনে মুগ্ধ হলেন। তিনি কোন দিন রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত কেউ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করুক, সেটাও আদৌ সমর্থন করতেন না। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের গতি ও প্রকৃতি দেখে বিপিনচন্দ্র পাল মন্তব্য করেছিলেন —'Asutosh has perhaps been the only politician and administrator that modern educated Bengalee community has produced. He is the most capable politician and administrator the British India has yet produced'. আশুতোষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে স্বাধীনতা আনা যায় না এবং শিক্ষাকে নষ্ট করে রাজনীতি করা আত্মহত্যার সামিল। তাই আমরা দেখতে পাই, শিক্ষাক্ষেত্রে দেশবাসীর অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —'Asutosh heroically fought against heavy odds for winning freedom for our education'. আশুতোষের নীতি তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রত্যেকটি সমাবর্তন ভাষণে —"We stand unreservedly by the doctrine that if education is to be our policy as a nation, it must not be our politics, freedom is its very life blood, the condition of its growth, the secret of its success...there stands forth unshaken the conviction that our insistent claim for the freedom of the University is a fight for a righteous cause, a fight for the most sacred and impalpable of national privileges...."

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রতিটি প্রয়াসে আমরা পরিচয় পাই আশুতোষের স্বাজাত্যবোধ ও স্বাদেশিকতার জ্বলন্ত নিদর্শনের। ১৯২২ সালে তাঁর সমাবর্তন ভাষণে তারই স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

"You give me slavery with one hand and money with the other. I despise the offer. I will not take the money. We shall retrench and we shall live within our means. We will starve. I will ask my post graduate teachers to starve their families but to keep their independence. ...I tell you, as members of the University, stand up for the right of the University. Forget the Government of Bengal, forget the Government of India. Do your duty as senators of this University. Freedom first, freedom second, freedom always,...nothing

else will satisfy me." জাতির চরিত্র শিক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসার ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত এবং বিপর্যস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে আশুতোষের অবদান মূর্ত হয়ে উঠেছে সার মাইকেল স্যাডলারের উক্তিতে—"He was mighty in battle. He would have ruled an Empire. But he gave the best of his powers to education because he believed that in education rightly interpreted lies the secret of human welfare and the key to every empire's moral strength."

১৯২৪ সালের ২৫শে মে সার আশুতোষ দেহত্যাগ করেন। অকাল মহাপ্রয়াণে গুণমুগ্ধ দেশবাসীর সমষ্টিগত শোক ও বিষাদের যথাযথ ভাষা পেল বিদ্রোহী কবি নজরুলের লেখনীতে—

"বাঙলার শের, বাঙলার শির
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর
সহসা ওপারে অস্তমান
এপারে দাঁড়ায়ে দেখিল ভারত
মহাভারতের মহাপ্রয়াণ
…　　…　　…
মদ-গর্ব্বীর গর্ব্ব-খর্ব্ব　বল-দর্পীর দর্পনাশ
খেতভীতুদের শ্যাম বরাভয় রক্তসুরের কৃষ্ণত্রাস
নবভারতের নব আশা-রবি প্রাচীর উদার অভ্যুদয়
হেরিতে হেরিতে হেরিনু সহসা বিদায় গোধুলী
গগনময়।"

দেশের সর্বাঙ্গীন শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীন সত্তা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ইত্যাদির আশুতোষকে অমর করে রেখেছে। তাঁরই মহান আদর্শকে পাথেয় করে অসমাপ্ত একটি বিশেষ কাজ আজ সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছে তাঁরই স্নেহধন্য পুত্রপ্রতিম শিষ্য আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। আজকের এই পুণ্য দিবসে আমরা তাই পরম শ্রদ্ধাভরে আশুতোষকে স্মরণ করি, আর প্রার্থনা করি যেন আমরা তাঁরই সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

# আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা

## গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে এক সময়ে কিমিয়াবিদ্যার চর্চা বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল। তার পর রসায়নশাস্ত্রের চর্চা সুরু হয় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশে যতটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, পাশ্চাত্য দেশগুলি তখনও তার কাছাকাছি এগুতে পারে নি। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই ভারতে বিজ্ঞান-অনুশীলনের ধারা ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। এই সময় থেকেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে দ্রুতগতিতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সুরু হতে থাকে। গ্যালিলিও, ল্যাভয়সিঁয়ে, নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের অভিনব আবিষ্কারে বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশে শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের বিকাশ সম্ভব হলেও বিজ্ঞান-অনুশীলনের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রয়াস লক্ষিত হয় নি। তারপর ভারতের বিজ্ঞান-অনুশীলনের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই এদেশে নব্যবিজ্ঞান-চর্চার উদ্বোধন করেন।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র পূর্ববঙ্গের ময়মনসিং সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ গ্রহণ করে ফরিদপুরে আসেন। সেখানে শৈশবের শিক্ষা সমাপ্তির পর জগদীশচন্দ্র কলকাতায় এসে ১৮৮০ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডে যাবার সঙ্কল্প করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে শাসন বিভাগে যোগদান করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর পিতার এতে মোটেই সম্মতি ছিল না। অতঃপর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্যে ১৮৮০ সালে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য অসুবিধার জন্যে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। অবশেষে ১৮৮১ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে যোগদান করেন। কেম্ব্রিজে তিন বছর অধ্যয়ন করবার পর জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি-বিজ্ঞানে ট্রাইপোস পাশ করেন এবং কিছু দিন পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফেরবার পর ১৮৮৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের বেশ কিছুকাল পরে জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। খুব সম্ভব ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত সার অলিভার লজের 'Heinrich Hertz and His Successors' শীর্ষক রচনা থেকে তিনি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে গবেষণায় প্রেরণা লাভ করেন। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে এক গাণিতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে ঈথার-তরঙ্গের আঘাতে আমাদের দৃষ্টির অনুভূতি জন্মে, সেই ঈথার-তরঙ্গ এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গ একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বায়ুর কম্পন-সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলে যেমন শব্দের অনুভূতি জাগে,

তেমনি ঈথারের কম্পন-সংখ্যা যদি একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে, তবে তা আমাদের কাছে আলো বলে প্রতীয়মান হবে। ম্যাক্সওয়েলের তথ্য অনুযায়ী জার্মান বিজ্ঞানী হেনরিক হার্ৎজ যান্ত্রিক উপায়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। হার্ৎজের যন্ত্রে উৎপন্ন ঈথার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুবই বড়, তাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু হার্ৎজ তার অস্তিত্ব-জ্ঞাপক প্রমাণ লাভের ব্যবস্থাও করেন। কিন্তু এই অদৃশ্য আলো এবং দৃশ্য আলো যে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তা কেমন করে জানা যাবে? আলোর যে সব ধর্ম আছে, যেমন—সোজা পথে চলা, অস্বচ্ছ বস্তুর ছায়া ফেলা, প্রতিসরণ, প্রতিফলন, সমবর্তন প্রভৃতি, সেগুলি যদি হার্ৎজের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মধ্যে দেখা যায়, তবেই তা প্রমাণিত হতে পারে।

দৃশ্য আলোর মত অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গেরও ওই ধর্মগুলি আছে কি না, হার্ৎজ তার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতির পরীক্ষায় অনেকটা সাফল্য লাভ করলেও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড় হবার ফলে এবং যথোপযুক্ত যান্ত্রিক সূক্ষ্মতার অভাবে অন্যান্য পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলো না। কিন্তু আর বেশী দূর অগ্রসর হবার পূর্বেই হার্ৎজ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রও এই অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তিনি হার্ৎজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের উন্নতি সাধন করে নতুন যন্ত্র নির্মাণ করেন। হার্ৎজের যন্ত্র থেকে কয়েক গজ দীর্ঘ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নির্গত হতো, কিন্তু জগদীশচন্দ্র যে যন্ত্র তৈরি করেন, তাথেকে মাত্র এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নির্গত হতো। এই তরঙ্গ ধরবার জন্যে তিনি 'কৃত্রিম চোখ' নামে গ্যালিনা কৃষ্ট্যালের সাহায্যে এক প্রকার গ্রাহক-যন্ত্র নির্মাণ করেন। এই যন্ত্র থেকে হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নির্গত হয়ে কৃত্রিম চোখের উপর পড়লেই তার কাঁটা নড়ে ওঠে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষায় তিনি অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গে দৃশ্য আলোর সবগুলি ধর্মের অস্তিত্বেরই প্রমাণ পেয়েছিলেন। দৃশ্য আলো এবং অদৃশ্য আলো যে একই গোষ্ঠীভুক্ত, তাঁর পরীক্ষায় তা নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে প্রমাণিত হলো। এই সকল পরীক্ষার সময় তিনি একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন—দৃশ্য আলোর পক্ষে কাচ স্বচ্ছ, জল স্বচ্ছ, কিন্তু ইটপাটকেল, আলকাত্‌রা প্রভৃতি অস্বচ্ছ। অদৃশ্য আলো কিন্তু জলের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না অথচ ইটপাটকেল, আলকাত্‌রা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে অনায়াসে চলে যায়।

জগদীশচন্দ্র চিন্তা করে দেখলেন—যন্ত্র থেকে নির্গত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কৃত্রিম চোখের উপর পড়লে বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে যদি একটা কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে পারে তাহলে কাঁটা না ঘুরিয়ে একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টাও বাজাতে পারে অথবা বারুদ-স্তূপে আগুন ধরিয়েও দিতে পারে। তাছাড়া যখন ইটপাটকেল ভেদ করে গিয়ে কৃত্রিম চোখে সাড়া জাগাতে পারে, তখন এই ব্যবস্থায় দূরবর্তী স্থানে সঙ্কেত প্রেরণ করা যাবে না কেন? ১৮৯৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এরূপ একটি পরীক্ষার আয়োজন করেন। যন্ত্রে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘর থেকে বন্ধ দরজা ভেদ করে অধ্যাপক পেড্‌লারের ঘরে স্থাপিত একটা পিস্তল ছুড়লো, বারুদস্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল। ১৮৯৫ সালে তিনি বাংলার গভর্ণর উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে অনুরূপ আর একটি পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। সেখানে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দুটি বন্ধ ঘরের দরজা ভেদ করে ৭৫ ফুট দূরে তৃতীয় একটি কক্ষে প্রবেশ করে বারুদ স্তূপ উড়িয়ে দিল, একটি গোলা নিক্ষেপ করলো

এবং পিস্তল ছুড়লো। এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এক মাইল দূরে তাঁর বাসভবনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাবার আয়োজন করেন। কিন্তু সে সময়ে জরুরী প্রয়োজনে বিদেশ যাত্রার ফলে ঐ সব কাজে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।

এর কিছুকাল পরেই জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-ধারায় একটা আকস্মিক পরিবর্তন আসে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গবেষণার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৮৯৯ সালে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকবার সময় একদিন তিনি জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণধর্মের অনুরূপ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। এই সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বলেছেন—"আমি তখন আকাশের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম এবং দূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক নূতন কল আবিষ্কার ও নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। দেখিতে পাইলাম, ধাতু-নির্মিত কলের লিপি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল, যেন কলটি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। লিপির ধরণ আমাদের ক্লান্তি-লিপিরই অনুরূপ। মানুষের যেমন বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হয়, কলটিরও সেইরূপ বিশ্রামের পর ক্লান্তি দূর হইল। আবার কতকগুলি ঔষধে যেমন আমাদিগকে উত্তেজিত করে, জড়নির্মিত কলেও তাহার অনুরূপ প্রক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। ইহার ফলে বহুদূর হইতে প্রেরিত অতি ক্ষীণ সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অপিচ কতকগুলি দ্রব্য কলের উপর বিষবৎ কার্য করিয়াছিল, যাহার জন্য কলের সাড়া দিবার শক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, অনেক সময় অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করিলে জীবদেহে উত্তেজকের ক্রিয়া করে, ধাতু-নির্মিত যন্ত্রেও সেইরূপ ফল দৃষ্ট হয়। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার আভাস দেখিতে পাইলাম। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, জড় ও জীব-জগৎ একই নিয়মে পরিচালিত এবং উহারা একই সূত্রে গ্রথিত।"

এভাবে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের এক নতুন জগতে প্রবেশ করেন। সে জগৎ জড় ও জীবের মধ্যবর্তী সীমারেখায় অবস্থিত। তখন থেকেই জগদীশচন্দ্রের গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলো। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে তিনি দেখালেন—প্রাণিদেহে আঘাত, উত্তেজনা বা বিষ প্রয়োগে যেরূপ সাড়ালিপি পাওয়া যায়, আঘাত-উত্তেজনা বা বিষ প্রয়োগে একখণ্ড টিনও অনুরূপভাবেই সাড়া দিয়ে থাকে; এথেকে তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, বাইরের আঘাত-উত্তেজনায় প্রাণী ও জড় পদার্থের মধ্যে যে স্পন্দন জাগে, তা মূলতঃ অভিন্ন।

জীব ও জড়ের মধ্যে উত্তেজনাজনিত সাড়ার ঐক্য প্রত্যক্ষ করে তাঁর মনে হয়—তাহলে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী উদ্ভিদদেহেও যদি অনুরূপ সাড়া পাওয়া যায়, তবে জড় পদার্থের চেতনা সম্পর্কে তাঁর মতবাদের সমর্থনযোগ্য অতিরিক্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে। পরীক্ষার ফলে জগদীশচন্দ্র জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়ালিপির মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। কিন্তু উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষার ফলে জগদীশচন্দ্র যে সব অভিনব রহস্যের সন্ধান পান, সেগুলি উদ্ভিদ সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রচলিত মতে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। বাইরের আঘাতে প্রাণীদের পেশী যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, উদ্ভিদে সেরূপ কিছুই হয় না। প্রাণীর দেহে একস্থলে আঘাত করলে স্নায়ুর সাহায্যে উত্তেজনা পরিচালিত হয়ে পেশীকে সঙ্কুচিত

করে, কিন্তু উদ্ভিদে উত্তেজনা বহনকারী কোন পথের অস্তিত্ব নেই। প্রাণীদের স্বতঃস্পন্দনশীল পেশীর মত উদ্ভিদে কোন পেশী দেখা যায় না। বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগে প্রাণীরা যেরূপ উত্তেজিত বা অবসাদগ্রস্ত হয়, উদ্ভিদে সেরূপ কিছু ঘটতে দেখা যায় না। কাজেই তখনকার উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা মনে করতেন—প্রাণী-জীবন ও উদ্ভিদ-জীবন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

উদ্ভিদ-জীবন সম্পর্কে এই সব ধারণার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্যেই জগদীশচন্দ্র নতুন উপায়ে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। প্রাণিদেহের সাড়া যন্ত্র-সংলগ্ন কলমের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু এসব যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের সাড়া লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানবার জন্যে তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ নামে নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ নিজেই তার আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় ভুষামাখানো কাচের গায়ে লিখে দিতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় অল্প আঘাতে উত্তেজনার বড় সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক আঘাতেও ক্ষীণ সাড়া লিপিবদ্ধ হয়। এই যন্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ অবস্থার সাড়া লিপিবদ্ধ হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি বহুগুণ বর্ধিতাকারে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

বিষ প্রয়োগে বা প্রচণ্ড আঘাতের ফলে উদ্ভিদের জীবনে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন সাড়া দেবার সমস্ত শক্তি লোপ পায়। এরূপ আঘাত মৃত্যুর আঘাত। মৃত্যুকালে প্রাণিদেহে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়, উদ্ভিদের দেহেও সেরূপ একটা আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে মুহূর্তের জন্যে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ উদ্ভিদের শরীরে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময়ে হঠাৎ জীবনের সাড়ার গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। রেখা ক্রমশঃ ছোট হতে হতে স্তব্ধ হয়ে যায়। এটাই হলো উদ্ভিদের অন্তিম সাড়া।

প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের পেশী যেমন আপনা-আপনি স্পন্দিত হয়, কোন কোন বিষ প্রয়োগে স্পন্দন স্তিমিত বা স্থগিত হয়, আবার অপর পদার্থ প্রয়োগে স্পন্দন দ্রুততর হয়, বনচাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্রগুলিতেও তেমনি স্পন্দনশীলতা দৃষ্টিগোচর হয়। জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত অভিনব যান্ত্রিক ব্যবস্থায় একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদের স্পন্দন-রেখা প্রাণিদেহের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-রেখারই অনুরূপ। উদ্ভিদের এক স্থানে আঘাত করলে স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে সেই উত্তেজনা-প্রবাহ যে অন্য স্থানে প্রেরিত হয় এবং তাতে কতটুকু সময় লাগে, তাঁর উদ্ভাবিত সমতাল্ নামক যন্ত্রের সাহায্যে তা অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণীত হয়ে থাকে। উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক বহুবিধ ক্রিয়াকলাপের বিষয় সঠিকভাবে জানবার জন্যে তিনি পটোমিটার, বাব্লার, গ্রোথ রেকর্ডার, স্ফিগ্মোগ্রাফ, ইলেকট্রিক প্রোব প্রভৃতি নানা রকমের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের মূলগত প্রক্রিয়া একইরূপে সাধিত হয়ে থাকে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশই বিজ্ঞান-অনুশীলনে ব্যয়িত করেছেন, কিন্তু বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর অল্প কয়েকজন গবেষক নিয়ে এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিষ্ঠানই আজ বহুগুণে পরিবর্ধিত হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জীবনের শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থেকে ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর গিরিডিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা-চক্রে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ ]

# সৃষ্টিতত্ত্ব ও জেম্‌স্ ডিউই ওয়াটসন

দীপ্তিময় দে

পুরনো নিউইয়র্ক টাইমস এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি ছবির উপর নজর পড়লো। ১৯৬২ সালের ১৯শে অক্টোবরের সংখ্যা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ অধ্যাপক একদল বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর জীববিদ্যার ক্লাশ নিচ্ছেন। পিছনের ব্ল্যাক বোর্ডে ছাত্রদেরই কেউ হয়তো লিখে রেখেছে—ডক্টর ওয়াটসন সবেমাত্র নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ছাত্রদের খুশীর হাসি দেখে বোঝা যায়, তাঁরা তাঁদের ৩৪ বছর বয়স্ক এই তরুণ অধ্যাপকের সাফল্যে আনন্দিত এবং গর্বিত। এই অধ্যাপকই জেম্‌স্ ডিউই ওয়াটসন। তাঁর যে গবেষণা নোবেল পুরস্কার কমিটির নজর পড়েছিল সেটি হচ্ছে, 'His contributions to the understanding of basic life process through the discovery of molecular structure of DNA, the substance of heridity.'

আশ্চর্যের কথা এই যে, যে আবিষ্কারের জন্যে এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো, তা এক যুগ আগে ডক্টর ওয়াটসনের ২৫ বছর বয়সেই সম্পূর্ণ হয়েছিল। ওয়াটসন জীবনের প্রথম থেকেই অসাধারণত্বের পরিচয় দেন। তিনি ১৯২৮ সালের ২৫শে এপ্রিল শিকাগো সহরে জন্মগ্রহণ করেন। বলতে গেলে হাটতে শেখবার আগেই তিনি রেডিওর অনুষ্ঠানে বিস্ময়কর শিশু বলে চিহ্নিত হয়েছিলন। ১৯ বছর বয়সে তিনি হাই স্কুল থেকে সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে পাশ করেন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করবার সময় তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তায় অধ্যাপকদের বিস্মিত করেন। পরিচিতদের মধ্যে তিনি জিমি নামে খ্যাত। পড়াশোনা নিয়ে জিমি এতই ব্যস্ত থাকতেন যে, অন্য কোন ব্যাপারে নজর দেবার কোন সময়ই পেতেন না। তাঁর একমাত্র সখ ছিল পাখী দেখবার। পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর এই সখ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন—ছেলেবেলার পাখী দেখবার এই অভ্যাসের মধ্যে খানিকটা বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছিলাম। যদিও ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পক্ষিবিজ্ঞানে স্নাতক হবার প্রস্তুতি হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তথাপি এই সময়ে আমেরিকার কয়েকজন বিখ্যাত প্রজনন-বিজ্ঞানীর (Geneticists) সংস্পর্শে এসে তিনি সে চিন্তা ছেড়ে দিলেন। ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগে দেশ ছেড়ে আসা বিখ্যাত ইটালিয়ান বিজ্ঞানী ডক্টর সালভাডর লুরিয়া ছিলেন ভাইরাস-বিজ্ঞানের একজন পথিকৃৎ। লুরিয়ার তত্ত্বাবধানে ওয়াটসন ব্যাকটেরিয়াল ভাইরাসের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে ১৯৫০ সালে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর।

কোপেনহাগেনে বছরখানেক জীবাণুতত্ত্বের উপর গবেষণা করবার পর এই তরুণ বিজ্ঞানী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেনডিস লেবরেটরীতে গবেষণা করবার আমন্ত্রণ পান। ওখানে সেই সময়ে বৃটিশ মেডিক্যাল কাউন্সিল আণবিক জীব-বিজ্ঞান (Molecular biology) সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে একটি গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই গবেষণাগারের কর্মকর্তারা প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের খোঁজ করছিলেন।

তরুণ বিজ্ঞানী ওয়াটসন এই সূত্রে বিজ্ঞানীদের একজন হয়ে কাজে যোগ দিলেন।

ওয়াটসনের ভয় ছিল, এই অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তিনি কি খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন? আর তাছাড়া এঁদের তুলনায় নতুন কি-ই বা তিনি করতে পারবেন? অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে বয়সে প্রায় দশ বছরের বড় ফ্রান্সিস ক্রীকের পরিচয় হওয়ায় তিনি খানিকটা ধাতস্থ হন। এই ক্রীকের সঙ্গেই তাঁর কাজ করবার কথা। ইংরেজ ক্রীক ছিলেন মূলতঃ একজন পদার্থবিদ। যুদ্ধের সময়ে তিনি রেডারের উন্নতিবিধানের জন্যে অনেক কাজ করেছিলেন। ক্রীকের কথাবার্তার ধরণ ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তিনি ছিলেন বহির্জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলী, সূক্ষ্ম রসবোধ ও কার্যকরী চিন্তাশক্তির অধিকারী। অপর দিকে তরুণ আমেরিকান বিজ্ঞানী ওয়াটসন ছিলেন শান্ত এবং অন্তর্মুখী। এই দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রীক DNA মডেল আবিষ্কার করে জীব-বিজ্ঞানে বিপ্লব আনয়ন করেন। এই মডেলের আকৃতি অনেকটা মোচড়-খাওয়া লোহার মইয়ের মত। মইয়ের দুটি পাশ যেমন পরস্পরের পরিপূরক, মডেলেও তাই। তাঁদের আবিষ্কারের মত এই দুই বিজ্ঞানীও ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক। ওয়াটসনের ভাষায় বলতে গেলে—ক্রীক আমাকে পদার্থবিদ্যা শেখাতেন আর আমি তাঁকে শেখাতাম জীববিদ্যা। এতে খুব চমৎকার কাজ হয়েছিল।

ঐ সময়ে নতুন গবেষণা ভবনটি তৈরি হচ্ছিল। তাই এই দুই বিজ্ঞানীকে লেবরেটরী হিসেবে ব্যবহারের জন্যে কাঠের তৈরি একটি ছোট ঘর দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আদর করে ঘরটির নাম দিলেন—কুটীর। পরে কোন এক সময়ে বৃটেনে পরিভ্রমণরত একদল সোভিয়েট বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পাওয়া গবেষণার লেবরেটরী দেখতে চাইলে তাঁদের কুটীরে নিয়ে যাওয়া হলো। লেবরেটরীর ঐ চেহারা দেখে তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের সঙ্গে রসিকতা করা হচ্ছে। তাঁদের মনে হলো, ওটা নিশ্চয়ই ছাত্রদের সাইকেল রাখবার শেড। লেবরেটরীর ঐ অবস্থা সত্ত্বেও ওয়াটসন ও ক্রীক এক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় পৃথিবীতে বসবাসকারী সর্বপ্রকার জীবিত বস্তুর প্রাণস্পন্দনের উৎসস্বরূপ বিস্ময়কর বস্তুটির আণবিক গঠনের প্রকৃতি সনাক্ত করেন।

১৯৫০ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত প্রায় কোন জীব-বিজ্ঞানীই আশা করেন নি যে, জীবনকালে তাঁরা কেউ কুয়াশায় ঘেরা জন্মরহস্যের মূল কথাটি জেনে যেতে পারবেন। যে অণু থেকে জীবনের বিকাশ ও বৃদ্ধি, তার গঠন নির্ণয় করা ছিল মানুষের কল্পনারও অতীত। প্রতিটি কোষ ভেঙ্গে তৈরি হয় এই বিস্ময়কর বস্তুটির অবিকল প্রতিরূপ। সময়ের সঙ্গে এর যা চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে, বংশধরদের মধ্যে তার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। যে দুই অসমসাহসী বিজ্ঞানী এই রহস্য উদ্ভেদের জন্যে ১৯৫২ সালে এই দুরূহ কাজে কোমর বেঁধে লেগে পড়েন, তাঁদের দুঃসাহসী ছাড়া আর কি বলা যায়।

এঁদের প্রায় সাতাশী বছর আগে মোরাভিয়ার এক ধর্মযাজক গ্রেগর মেণ্ডেল ১৮৬৫ সালে বলেছিলেন যে, জন্মসূত্রে লব্ধ বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটি একক উপাদানের উপর নির্ভর করে এবং তা অঙ্কের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। অবশ্য মেণ্ডেল এই উপাদানের কোন রাসায়নিক ব্যাখ্যা দেন নি বা দেহ-কোষের কোন্ জায়গায় তা রয়েছে, তাও কিছু বলেন নি।

মেণ্ডেলের এই তথ্য পরিবেশনের প্রায় তিন বছর পর এক তরুণ সুইস প্রাণ-রসায়নবিদ (Biochemist), ফ্রেডারিক মেইজার, রাইন

নদীতে ধরা স্যামন মাছের শুক্রাণু থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড বের করে নিতে সক্ষম হন। শুক্রাণু শুকিয়ে নেবার পর তার শতকরা ৫০ ভাগই হলো এই পদার্থ। তাঁর বিশ্বাস হলো, কোষের কার্যকারিতার সঙ্গে এই পদার্থের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আরও গবেষণা চালিয়ে যাবার মত তাঁর প্রস্তুতি ছিল না। চুনার মত সাদা নিউক্লিক অ্যাসিডের পাউডার বোতলে পুরে তিনি লেবরেটরীর তাকে তুলে রাখলেন। তিনি হয়তো আঁচ করেছিলেন যে, এই সাদা পাউডারই পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত বিখ্যাত DNA—যা বংশপরম্পরায় জীবজগতের স্বাতন্ত্র্য ধরে রেখেছে। সম্ভবতঃ তাই তিনি লিখে-ছিলেন—আমার পরীক্ষার ফলাফল হয়তো ভবিষ্যতে গবেষকদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় মনে হবে।

মেণ্ডেল এবং মেইজারের গবেষণার কাগজপত্র বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। তখনকার বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, কোষের মধ্যেকার ক্রোমোজোমের কেন্দ্রেই আছে মেণ্ডেলের সেই অন্যতম একক উপাদান (Genes)। দেখা গিয়েছিল, নিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিনই হলো ক্রোমোজমের মূল উপাদান। যদি ক্রোমো-জোম কেবল নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন দিয়ে গঠিত হয়, তবে এই দুটি অথবা যে কোন একটি জীবজগতে উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখবার মূল উপাদানের ধারক। প্রায় ৪০ বছর ধরে কোষ-রসায়নবিদেরা বলে এসেছিলেন যে, সৃষ্টিতত্ত্বের ঐ যাদুকরী পদার্থ খুব সম্ভব ক্রোমোজোমের প্রোটিনের মধ্যেই আছে।

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত এই ব্যাপারে প্রোটিনের উপর নজর রাখবার দরুণ নিউক্লিক অ্যাসিডের উপর কেউ বিশেষ একটা গুরুত্ব দেন নি। এই সময়ে অ্যাভারি ম্যাকলিয়ড এবং ম্যাকার্থী নামে দুজন বৈজ্ঞানিক রকফেলার ইনষ্টিটিউটে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করেন যে, ডিঅক্সি-রিবোনিউক্লিক অ্যাসিডই (Deoxyribonucleic Acid—DNA) সৃষ্টিতত্ত্বে উত্তরাধিকার-বৈশিষ্ট্য চালু রাখবার মূলে রয়েছে। তাঁদের এই গবেষণায় দেখানো হয়েছিল যে, প্রতিটি প্রাণীর DNA-এর এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, যা তার সৃজনী বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ মিললো যে, DNA-ই উত্তরাধিকার বৈশিষ্ট্যের একক। কিন্তু মেণ্ডেল আবিষ্কৃত একক উপাদান বা DNA-এর ক্রিয়াকলাপ পরিষ্কারভাবে বুঝতে গেলে এর আণবিক গঠন এবং কার্যকারিতার বিষয় জানা প্রয়োজন। যখন ওয়াটসন এবং ক্রীক ১৯৫১ সালে এই প্রায় অসম্ভব কাজের ঝুঁকি নিলেন, তখন তাঁরা পূর্বতন গবেষকদের গবেষণার ফলাফল জানবার জন্যে সন্ধান চালালেন। লণ্ডনের Kings Hospital-এর জৈব পদার্থবিদ্যা শাখার মরিস উইলকিন্স এই বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল উত্তে-জনার খোরাক যোগালো।

উইলকিন্স ওয়াটসন এবং ক্রীকের সঙ্গে কাজ করে একই সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পান। অ্যাটম বোমার উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে জড়িত ম্যান-হাটান প্রোজেক্টে তিনি এক সময়ে কাজ করতেন। যুদ্ধের পর তিনি আণবিক জীববিদ্যার (Molecular Biology) চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করতে গিয়ে উইলকিন্স সদ্য নিষ্কাশিত DNA পরিশোধন করে যে আঠালো বস্তু পেলেন, তাথেকে তিনি অতি সূক্ষ্ম আঁশ বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর উপর রঞ্জেন রশ্মির বিচ্ছুরণ প্রয়োগ করে তিনি DNA অণুর ভিতরকার পরমাণুগুলির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করেন। রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে নেওয়া তাঁর ছবিগুলিতে দেখা গেল যে, তার আণবিক গঠন অনেকটা মোচড়-খাওয়া লোহার সিঁড়ির মত।

ওয়াটসন ও ক্রীকের কাছে এই তথ্য যেন আঁধারে আলো হয়ে দেখা দিল। তাঁদের কল্পনায় DNA মডেলের রূপ দিতে এই তথ্য যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সিঁড়ির আকৃতির DNA অণুর পাশগুলি তৈরি হয়েছে পালাক্রমে সুগার-S (Deoxyribose) এবং ফস্‌ফেট-P-এর একক উপাদানে। সিঁড়ির পাশ দুটিকে যুক্ত করেছে এক জোড়া করে নাইট্রোজেনাস বেস (Base—Purines and Pyrimidines)। সিঁড়ির পাশ

DNA এর আনবিক গঠন

দুটির সুগার উপাদানকে যুক্ত করবার জন্যে (সিঁড়ির পাদানির মত) চার রকমের বেস আছে—Guanine, Cytosine, Adenine এবং Thymine। এদের যথাক্রমে ইংরেজী অক্ষর G, C, A এবং T দিয়ে সংক্ষেপে চিহ্নিত করা হয়। সিঁড়ির প্রতিটি পাদানি এক জোড়া করে পরিপূরক বেস দিয়ে গঠিত। যেমন—বেস G সব সময় C-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং A থাকে T-এর সঙ্গে। বেসগুলির আণবিক গঠনের দরুণই অন্য উপায়ে সংযোগ সাধন সম্ভব নয়। যেমন—যে কোন ভাষায় অক্ষর সাজিয়ে শব্দ তৈরি হয় আর শব্দ জুড়ে হয় বাক্য, তেমনি এই চারটি বেস দিয়ে চারটি প্রতীক সৃষ্টি হয়েছে, G-C, C-G, A-T এবং T-A। এগুলি নিয়েই তৈরি হয়েছে সৃষ্টিতত্ত্বের নিয়মাবলী। এর মধ্যেই রয়েছে জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদের সৃষ্টির পরিকল্পনার সকল তথ্য।

এই বেসগুলিকে অগুণ্‌তি উপায়ে সাজানো যায় এবং এই সজ্জার উপরই নির্ভর করে জীবের আকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তার খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা। একই জাতের অথবা ভিন্ন জাতের দুটি জীবের মধ্যেকার তফাৎ তাদের DNA অণুর মোট বেস-এর সংখ্যা এবং তাদের অবস্থানের পর্যায়ক্রম জানা গেলে ধরা পড়বে। জীবিত কোষগুলির মধ্যে হাজার হাজার বিশেষ ধরণের প্রোটিনের ভাঙ্গা-গড়ার খবর পাওয়া যায় DNA অণুর গঠন দেখে। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতিটি মানুষের কোষের কেন্দ্রে যে DNA আছে, তাতে ৫০ কোটি জোড়া বেস মানুষের শরীরের ৪৬ ধরণের ক্রোমোজোমের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যদি কেবলমাত্র একটি কোষের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা DNA-এর অংশগুলিকে সোজা করে পরপর সাজানো যায়, তাহলে লম্বায় তা প্রায় তিন ফুটের মত হবে। ক্রীক হিসাব করে দেখেছিলেন যে, এই পরিমাণ DNA-এর সাহায্যে প্রায় এক হাজার সংখ্যায় সমাপ্ত বিশ্বকোষের সকল জ্ঞাতব্য তথ্যকে সঙ্কেত-লিপিতে প্রকাশ করা যায়। কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া বিচিত্র নয়।

DNA-এর ব্যাপারে সবচেয়ে আশ্চর্যের জিনিষ এই যে, যতবারই একটি কোষ ভাঙ্গে

অথবা কোন জীব বংশবৃদ্ধি করে DNA-ও বিশ্বস্তভাবে তার অবিকল একটি প্রতিরূপ সৃষ্টি করে চলে। DNA-এর মডেল রচনার কাজ সম্পূর্ণ করে ওয়াটসন এবং ক্রীক লিখলেন—বিশেষ বিশেষ বেসগুলির জোট বাঁধবার কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে এও আমাদের নজর এড়িয়ে যায় নি যে, এর মধ্যেই সৃষ্টিতত্ত্বের অনুকৃতি রচনার বীজ নিহিত আছে। জীববিজ্ঞানে অনুকৃতি রচনার যে ব্যাখ্যা তাঁরা দিয়েছিলেন, তা খুবই সহজ। কোষগুলি ভাঙবার আগে মইয়ের আকৃতির DNA অণুর পাশ দুটি পরস্পর থেকে খুলে আসে এবং সোজা হয়ে যায়। এগুলি অনেকটা ছাঁচের মত কাজ করে এবং কোষের মধ্যে সঞ্চিত মালমশলা থেকে সঙ্গী তৈরি করে নেয়। তাই DNA জীবন-সঞ্জীবনী এবং জীবন সৃষ্টির উপাদানও বটে।

DNA অণুর মধ্যে যে সঙ্কেত লুকিয়ে আছে, তাথেকে পরিবর্তনশীল প্রতিটি জীবিত বস্তুর আকৃতি-প্রকৃতির নির্দেশ পাওয়া যায়—অ্যামিবা থেকে মানুষ, অ্যালজি (Algae) থেকে বিরাট শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বটগাছ পর্যন্ত কেউই বাদ যায় না। পূর্বপুরুষের কাছ থেকে বংশানুক্রমিকভাবে পাওয়া DNA যৌনকোষে সঞ্চিত থাকে। পিতা-মাতার কাছ থেকে আণুবীক্ষণিক পরিমাণ DNA ডিম্বকোষে সঞ্চারিত হয়। এরই উপর নির্ভর করে সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতি। DNA আবিষ্কৃত হওয়ায় পৃথিবীতে প্রাণস্পন্দন সুরু হবার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জীব-জগতের ক্রমবিকাশের ধারা অনুশীলনের অনেক সুবিধা হয়েছে। কালস্রোতে জীবজগতে এলোমেলো পরিবর্তন এসেছে এবং পারিপার্শিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে DNA-এর সঙ্কেতেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ভবিষ্যতেও এই কারণে যে সকল পরিবর্তন ঘটবে, তার উপর নির্ভর করবে আগামী দিনের প্রাণী ও উদ্ভিদের রকমফের।

ওয়াটসন ও ক্রীকের এই আবিষ্কারকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-জগতের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। এই দুই বিজ্ঞানী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেও গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন। ক্রীক কেম্ব্রিজের লেবরেটরীতে সৃষ্টির সঙ্কেতের নতুন নতুন রহস্য বের করতে ব্যস্ত রয়েছেন। ওয়াটসনও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষের ভিতরকার প্রোটিন-সংশ্লেষণ (Synthesis) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছেন। হয়তো ভবিষ্যতে তাঁর ছাত্রদের মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যাবে আরও অনেক বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকের।

ওয়াটসন ও ক্রীকের পর যে সব বৈজ্ঞানিক এই গবেষণার কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁরা হলেন, উইসকন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা, ডক্টর মার্শাল নিরেনবার্গ ও ডক্টর রবার্ট হয়েল। ১৯৬৮ সালে এই তিনজন বৈজ্ঞানিক যুগ্মভাবে ঐ কাজের জন্যে নোবেল পুরস্কার পান। ১৮৬৬ সালে যে কাজ একদিন মেণ্ডেল সুরু করেছিলেন, তার জের এখনও চলছে।

# কলকাতার জল-সরবরাহ সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সমস্যাসঙ্কুল কলকাতার সমস্যার অন্ত নেই। এখানে আছে বসবাসের সমস্যা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমস্যা, পথে যাতায়াতের সমস্যা, বর্ষার জল নিষ্কাশনের সমস্যা—এমনি কত যে ছোট বড় সমস্যা, তার শেষ নেই।

এখানে কলকাতার পানীয় জলের সমস্যার কথাই আলোচনা করবো। বাতাসের পরেই জলের স্থান। বাতাস না হলে কয়েক মিনিটও চলে না, জলের বেলায় কয়েক দিন মাত্র।

কোন সমস্যার বিষয় বিবেচনা করতে গেলে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কলকাতার জল-সরবরাহ সমস্যাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, একে তিনটি মুখ্য ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম—জল আহরণ

দ্বিতীয়—জল পরিশোধন

তৃতীয়—জল পরিবেশন—জল উপযুক্ত চাপে প্রেরণ, যাতে সুসম বন্টন সম্ভব হয়। এই তিনটি মৌল সমস্যারও নানা উপবিভাগ আছে।

জল সরবরাহের সমস্যার হেতু কি? যে জল উৎপন্ন হয়, তা বর্তমান জনসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট নয়। যত মানুষের জন্যে এই জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আজ তা অপ্রতুল। আর যে জল সংগৃহীত হয়, তা উপযুক্ত পরিবেশন-পদ্ধতির অভাবে কোন অঞ্চলে বেশী পাওয়া যায়, কোথাও আবার বিন্দুমাত্রও পাওয়া যায় না।

কলকাতার জলের কল প্রথম এক লক্ষ লোকের জন্যে তৈরি হয়েছিল। তবে ধাপে ধাপে বাড়ানো হয়েছে সত্য, কিন্তু চাহিদা মেটাতে পারে নি। স্বাধীনতার পরের যুগে এই শিথিলতা সর্বাধিক। এখন লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে মূল কলকাতাতেই তিরিশ লক্ষের বেশী হয়েছে। তার উপর শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির ফলে জলের চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সমস্যা হয়েছে সঙ্গীন। দিনের বেলায় শহরের বাইরে থেকে কাজ করতে আসে বহু লোক। তাদের জন্যেও জলের বিশেষ প্রয়োজন। জাহাজেও প্রচুর পানীয় জল এখান থেকে ভরে নেয়। তবে তা বোঝার উপর শাকের আঁটির মত। পলতা থেকে আনা পরিস্রুত পানীয় জল টালার প্রেরণাগার থেকে মারাঠা-খালের পশ্চিম অঞ্চলের কলকাতায় দিনে-রাতে কয়েক ঘণ্টা দেওয়া হয়। মল্লিকঘাট পাম্পিং ষ্টেশন থেকে দিন-রাত অপরিষ্কার গঙ্গাজল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু কাশীপুর অঞ্চলে সারা দিন-রাতই পরিস্রুত জল পাওয়া যায়। তাছাড়া শতাধিক বড় বড় নলকূপ থেকে প্রায় ১·৬ কোটি গ্যালন এবং পথের ধারে ছোট ছোট অজস্র চাপাকল থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা তো রয়েছেই। বহুলোক নিজেদের বাড়ীতেও নলকূপ স্থাপন করেছে। পলতায় ৮·৪ কোটি গ্যালন জল পরিস্রুত হয়—তার মধ্যে ৬·৬ কোটি গ্যালন মন্থর-বালুকা (Slow Sand) ফিল্টারে ও ১·৮ কোটি গ্যালন দ্রুত-বালুকা (Rapid Sand) ফিল্টারে। সেখান থেকে দীর্ঘ ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করে পুরনো পাইপ দিয়ে জল টালার প্রেরণাগারে উপস্থিত হয়। কিছুটা যে অপচয় হয়, সে কথা অনস্বীকার্য।

## পলতার জলকল

এখানে গঙ্গার অপরিস্রুত জল পাম্প করে চারটি প্রাথমিক পলিপাতনাধারে নেওয়া

হয়। এদের ধারণ-ক্ষমতা ৮.৫ কোটি গ্যালন। এরপর পলিপাতিত বা থিতানো জল আরও পরিষ্করণের জন্যে বিরাট এক হ্রদে সংগৃহীত হয়। সেখানে প্রায় ২০ কোটি গ্যালন জল ধরে। তারপর সেই জল ৫৯টি (৩৬+৬×২+১১×৩) মিহি বালির পরিস্রবণাধারে মন্থর-বালুকা প্রথায় পরিস্রুত করা হয়, যার ফলে ৬.৬ কোটি গ্যালন জল উৎপন্ন হয়। আর ১.৮ (১২×০.১৫) কোটি গ্যালন জল দ্রুত-বালুকা প্রথায় পরিস্রুত হয়। মোট ৮.৪ কোটি গ্যালন পরিস্রুত জল পলতায় উৎপন্ন হয়, যদিও আগে এই মন্থর-বালুকা প্রথায় আরও জল পরিস্রুত হতো। বর্তমানে পরিস্রাবণ প্রণালী ত্বরান্বিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, যাতে আরও দু-কোটি গ্যালন বেশী জল পাওয়া যায়। জলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে বর্তমানে একটি ৬ কোটি গ্যালনের পরিস্রবণাগার তৈরি হচ্ছে, যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো এই যে, গঙ্গার জল পাম্প করে ছয়টি এক কোটি গ্যালনের তঞ্চনাধারের (Clarifloculator) ভিতর দিয়ে এসে তিরিশটি বিশ লক্ষ গ্যালনের দ্রুত-বালুকা ফিল্টারের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে নতুন বসানো বাহাত্তর ইঞ্চি ব্যাসের পাইপের সাহায্যে টালায় পাঠানো হবে। ফটকিরি মেশাবার জন্যে ফ্লাস্ মিশ্রণের (Flash mixing) ব্যবস্থা আছে, যাতে তঞ্চনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। ফিল্টার করা জলে ক্লোরিন মেশানো হয়। কোটি গ্যালন জলে কোটি ভাগের ৫ থেকে ১০ ভাগ ক্লোরিন লাগে।

## পলতা থেকে টালা পাইপের ব্যবস্থা

(১) পলতা থেকে টালা পর্যন্ত ১৮৬৫ সালে বসানো ৪২ ইঞ্চি ব্যাসের ঢালাই লোহার পাইপ এখনও দিনে ৬০ লক্ষ গ্যালন জল বয়ে নিয়ে যায়।

(২) ১৮৯০ সালে বসানো ৪৮ ইঞ্চি ব্যাসের ঢালাই লোহার পাইপ দিনে ২.৪ কোটি গ্যালন জল বয়ে নিয়ে আসে টালায়, যেখানে চাপের কোনও চিহ্নই থাকে না। সেখান থেকে ৮০ ফুট চাপে জল পাম্প করে পাঠানো হয় শহরে।

(৩) ১৯২৯ সালে বসানো ৬০ ইঞ্চি ব্যাসের রিভেট করা $\frac{7}{16}$ ইঞ্চি ইস্পাতের চাদরের তৈরি পাইপের ভিতর দিয়ে ৮০ ফুট চাপে ৫.৬ কোটি গ্যালন জল চলে আসে টালায়। এতে নানা জায়গায় ছেঁদা হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এটি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। তাই এর আশু মেরামতির প্রয়োজন।

(৪) ১৯৬৪ সালে বসানো ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের ইস্পাতের পাইপ দিনে ৯ কোটি গ্যালন জল বইতে সক্ষম। কিন্তু এটি এখনও নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি।

উল্লিখিত ৪৮ ইঞ্চি ব্যাসের পাইপ আগেকার প্রয়োজনে ৩.২ কোটি গ্যালন পর্যন্ত জল বয়ে এনেছিল, কিন্তু এখন ২.৪ কোটি মাত্র জল বহন করে। দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে এর কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ায় জল বয়ে নেবার ক্ষমতা কিছু হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে ৭২ ইঞ্চি পাইপটি পলতার পর ৪৮ ইঞ্চি পাইপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

## টালার প্রেষণাগার

পলতা থেকে প্রায় ১৪ মাইল পথ আসবার পর মাটির তলায় ৮০ লক্ষ ও ১০০ লক্ষ গ্যালনের দুটি আধারের মধ্যে জল সঞ্চয় করা হয়। আর হয় ৯০ লক্ষ গ্যালনের উচ্চস্থিত জলাধারে। টালার এই জলাধারটি পৃথিবীর বৃহত্তম উচ্চস্থিত জলাধার।

৭০ লক্ষ গ্যালনের এক নতুন জলাধার নির্মাণের কাজ মাটির খানিকটা নীচে ও খানিকটা

উপরে রেখে চলেছে টালা পার্কে। ঢালাইয়ের ছাদ তৈরির পর এর উপর হাত দুই পুরু মাটি চাপা দিয়ে তাকে ক্রীড়াঙ্গন ও উদ্যানে রূপান্তরিত করা হবে।

এখান থেকে ১২০ ফুট চাপে পাম্প করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ দিয়ে জল পাঠানো হয়। মোট জল পাঠাবার ক্ষমতা হলো দিনে ২৮.৬ কোটি গ্যালন।

তাছাড়া বড় বড় নলকূপ ও রাস্তার ধারের চাপাকল থেকে স্থানীয় অধিবাসীরা ১ কোটি গ্যালনেরও বেশী জল সংগ্রহ করে। যত হাঙ্গামা বাধে গ্রীষ্মকালে, যখন নলকূপে আগেকার মত জল ওঠে না। ভূগর্ভস্থ জলবাহী বালুকা-তল যখন নীচে নেমে যায়।

### অপরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা

মল্লিকঘাট ও ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশন: হাওড়া পুলের দক্ষিণ গায়ে মল্লিকঘাট পাম্পিং ষ্টেশন। সেখান থেকে গড়ে ৬.৫ কোটি গ্যালন জল ও ওয়াটগঞ্জ থেকে ২.৫ কোটি গ্যালন জল দিন-রাত সরবরাহ করা হয়; অর্থাৎ মোট ৯ কোটি গ্যালন অপরিশ্রুত জল দিন-রাত পৌর-প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক অঞ্চলে কিন্তু মোট সংখ্যার ২।৩ ভাগ পুরবাসীকে সরবরাহ করা হয়। প্রায় ২০ লক্ষ লোক ময়লা জল সরবরাহের অঞ্চলে বসবাস করে। এই অপরিষ্কার জল পানীয় ছাড়া আর সব কাজেই ব্যবহৃত হয়, যেমন—রাস্তা ধোয়া, পায়খানা ধোয়া, আগুন নেবানো ও গন্ধনালা পরিষ্কার করা প্রভৃতি। নিখিল ভারত স্বাস্থ্যবিদ্যা ও জনস্বাস্থ্যের শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় এক হাজারের বেশী নদীর জলের নমুনা দীর্ঘ দশ বছর (১৯৫০-৫৯) ধরে পরীক্ষা করে শতকরা পাঁচ ভাগ জলে কলেরার বীজাণুর সন্ধান মিলেছিল।

কলকাতা মহানগরীর পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৩ সালে মল্লিকঘাট পাম্পিং ষ্টেশন থেকে জল পাম্প করবার সময় উপযুক্ত পরিমাণে ক্লোরিন সংযোগ করা হয়, যাতে পাইপ লাইনের অন্তিম প্রান্তে ক্লোরিনের সামান্য রেশটুকুরও সন্ধান পাওয়া যায়। যার ফলে অপরিশ্রুত জলের নমুনায় আর কলেরার বীজাণু পাওয়া যায় নি। কলকাতায় কলেরার প্রকোপ যথেষ্ট কমেছে, কিন্তু একেবারে অবসান হয় নি। ক্লোরিন প্রয়োগ নিয়ে ১৯৬৫ সালে বেজায় হৈ চৈ হবার পর আমি বিশিষ্ট অভ্যাগতদের নিয়ে দু-দিন মল্লিকঘাটে পাম্পিং ষ্টেশন পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে ঘণ্টায় ৬৫ পাউণ্ড ক্লোরিন দিতে দেখেছি। হঠাৎ কোন সময়ে কোন অনবধানতায় বন্ধ হয়েছিল কিনা, বলা প্রায় অসম্ভব। তবে কত তরল ক্লোরিন কেনা হচ্ছে, গুদামে কত ছিল, বর্তমানে কত আছে, কত জল পাম্প করা হয়েছে, তাথেকে সহজেই জানা যেতে পারে ক্লোরিন দেওয়া বন্ধ হয়েছিল কিনা। প্রয়োজন অনুযায়ী ২ থেকে ৩ অংশ ক্লোরিন ১০ লক্ষ ভাগ জলে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বর্ষার সময় যে ঘোলা জল যায়, তাতে যে পরিমাণ পলিমাটি থাকে, তা ময়লা নালা দিয়ে নিয়ে যাওয়া বর্তমানে এক জটিল সমস্যা। বার্ষিক গড়-পড়তা এই পলিমাটির পরিমাণ লক্ষে ৮০ ভাগ। বিশেষজ্ঞেরা এই ময়লা জলের সরবরাহ উঠিয়ে দিতে বলেছেন। না ওঠালে এতে স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আছে। কেন না, এই ময়লা জলের পাইপ ময়লাবাহী ভূ-নালার ম্যানহোলের মধ্য দিয়ে যাবার দরুণ, কখনো বা ময়লাবাহী নালার মধ্য দিয়ে এপার-ওপার যাওয়ার দরুণ, আগুন নেবানো কলের মুখ রাস্তার নীচে থাকায় দূষিত ধোয়ানির সংস্পর্শে আসবার ও পরিষ্কার জলের নলের

কলিকাতা জলসরবরাহ বিবর্ধনের
ভবিষ্যত পরিকল্পনা
হাওড়া
মিউনিসিপ্যালিটী
গঙ্গা নদী
বালী
খিদিরপুর রোড
টালীগঞ্জ
বেহালা
মানিকতলা
ট্যাংরা
রসপুঞ্জিকা
৭২", ৬০", ৪৮" ও ৪২" ব্যাসের
পলতা থেকে টালায় জল প্রেরক নল

সঙ্গে অপরিষ্কার জলের নলের সংস্পর্শ ঘটবার সম্ভাবনাও রয়েছে যথেষ্ট।

## কলকাতার সরবরাহ অঞ্চল

কলকাতা সহরে দৈনিক কত জল সরবরাহ হচ্ছে, তার যদি একটা ধারণা দিতে হয়, তাহলে একথা বললেই চলবে যে, যদি ১০ ফুট চওড়া ও ৫ ফুট গভীর ১০৫ মাইল দীর্ঘ একটি নালা কাটা হয়, তবে সেই নালা এই জলে ভর্তি করা সম্ভব; অর্থাৎ এক দিনের জলে ভর্তি খাল দিয়ে যদি নৌকা চালানো যায়, তবে সেই নৌকা করে আমরা হাওড়া থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত চলে যেতে পারি।

যদি জলের উৎসবিশেষে এর বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে, জল আসছে—

| | |
|---|---|
| টালা থেকে | ৮০৫ লক্ষ গ্যালন |
| বড় ব্যাসের নলকূপ থেকে | ২০০ লক্ষ গ্যালন |
| ছোট ব্যাসের নলকূপ থেকে | ৪০ লক্ষ গ্যালন |
| শতকরা ৫০ ভাগ অপরিষ্কার জলের কেন্দ্র থেকে | ৪৫০ লক্ষ গ্যালন |
| ( ৫০% গৃহস্থালীর কাজে লাগে বলে ) | |
| মোট | ১৪৯৫ লক্ষ গ্যালন |

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ২,৬৪৪, ০০০ লোকের জন্যে ১৪৯,৫০০,০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা হয়। এতে দেখা যাবে, মাথাপিছু লোক গড়ে দিনে ৫৬ গ্যালন জল পায়। এছাড়া নিজেদের বাড়ীতে নলকূপ আছে। যদিও পলতা থেকে ১৬১ কোটি গ্যালন জল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে, কিন্তু সহরের রাস্তায় পোঁতা পুরনো পাইপ দিয়ে সে জলের সুসম বণ্টন সম্ভব হবে না। তারও বিশেষ উন্নতির প্রয়োজন। পানীয় জল সরবরাহের উন্নতির ব্যবস্থাকে মুখ্য তিন ভাগে ভাগ করে প্রধান সুপারিশগুলি হলো নিম্নরূপ:

১। অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ ( ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ) পরিস্রুত জল-সম্ভারে:

(ক) প্রতি অঞ্চলের পৃথক পৃথক জল সরবরাহের নল এক সঙ্গে সংযোজিত করতে হবে, যাতে একটি সংযুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

(খ) জলের কলের পাইপের বিন্যাসের কিছু উন্নতি সাধন করতে হবে।

(গ) সহায়ক পাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করা, যাতে ৯০ লক্ষ গ্যালনের উচ্চস্থিত জলাধারটি কাজে লাগে।

(ঘ) জল পরিবেশনের চাপ বাড়াবার জন্যে নতুন দুটি ছোট পাম্পিং ষ্টেশন নিম্নচাপের অঞ্চলে স্থাপন করতে হবে, যাতে (৫২) প্রতিদিন ৩ কোটি গ্যালন জল ৩৫ psi * চাপে প্রেরিত এবং (৬১) প্রতিদিন ২ কোটি গ্যালন জল ৩০ psi চাপে প্রেরিত হয়। একটি হবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ীর সামনের পার্কে, অপরটি সার্কুলার রোডের উপর মিন্টো পার্কে।

(ii) অপরিষ্কার জল সরবরাহে বর্তমানে কোন পরিবর্তন করা প্রয়োজন হবে না। শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে, যাতে জলের অপচয় ও ছিদ্র দিয়ে জল নির্গমন রোধ করা যায়।

২। মধ্যবর্তীকালীন সুপারিশ (১৯৮১ সালের পরে)

যখন ফারাক্কার বাঁধ তৈরি হয়ে মূল গঙ্গার জল ভাগীরথী, হুগলী বেয়ে প্রচুর পরিমাণে আসতে সুরু করবে, তখন জোয়ারে সমুদ্রের নোনা জলের চাপ গার্ডেনরীচ পর্যন্ত জলকে বিশেষ লবণাক্ত করবে না। তখন পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

### পরিস্রুত জল সম্ভারে

(ক) সহরের রাস্তার তলায় নলের যোজনায় আরও উন্নতি সাধন ও নতুন নল স্থাপন করতে হবে।

---

*psi—প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কত পাউণ্ড চাপ

(খ) অন্তবর্তী কালে দুটি চাপবর্ধক পাম্পিং ষ্টেশনের ক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। সেখানে নতুন জল সংগ্রহাগারও স্থাপন (দেড় কোটি গ্যালন) করবার প্রয়োজন।

(গ) দুটি চাপবর্ধক ষ্টেশনে সর্বোচ্চ ঘণ্টায় (Maximum hour) জল সরবরাহের প্রয়োজন মেটাতে দেড় কোটি গ্যালন জল সংগ্রহাগার স্থাপন করতে হবে।

(ঘ) দক্ষিণ কলকাতায় ওয়াটগঞ্জের ৪২" ব্যাসের পাইপের বদলে ২০" নতুন পাইপ স্থাপন করতে হবে, যাতে ঐ ২০" পাইপ ওয়াটগঞ্জের ময়লা জল সরবরাহে ব্যবহৃত হয়।

অপরিষ্কার জল সরবরাহ

(ক) মল্লিকঘাট ও ওয়াটগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনকে বাতিল করতে হবে।

(খ) গার্ডেনরীচের কাছে একটি পাম্পিং ষ্টেশন নতুন করে গড়ে তুলতে হবে এবং পরিস্রবণাগার হবার আগেই জলে ক্লোরিন মিশিয়ে অপরিষ্কার জল সরবরাহের বিকল্প ব্যবস্থায় সরবরাহ সুরু করা চলবে।

(গ) ওয়াটগঞ্জ থেকে অপরিষ্কার জলের পাইপের যোজনা গার্ডেনরীচের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। বর্তমান ৪২" পাইপকে 'ফিল্টারর্ড' জলের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপরিষ্কার জলের পাইপের যোজনার সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

(৩) অন্তিম বা চূড়ান্ত ব্যবস্থায় (২০০১ খৃষ্টাব্দে)

পূর্ণ পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা যখন চালু হবে, তখন ফারাক্কা ব্যারাজ থেকে প্রচুর জল ভাগীরথী দিয়ে বয়ে চলবে।

(ক) তখন গার্ডেনরীচে জল পরিস্রবণাগারের পরিস্রাবণ ব্যবস্থা পূর্ণ করতে হবে।

(খ) অপরিষ্কার গঙ্গাজল সরবরাহের ব্যবস্থার ইতি ও সম্পূর্ণ পরিস্রুত জল সরবরাহ চালু হবে।

(গ) টালিগঞ্জ অঞ্চল এবং টালিগঞ্জ ও পঞ্চান্নগ্রাম বাঁধের মধ্যে ভবিষ্যতে সংযুক্ত অঞ্চল দুটিতে নল সংযোজন ব্যবস্থা প্রসারিত করতে হবে।

(ঘ) জলের চাপ বাড়াবার জন্যে কতকগুলি স্থানে নল সংযোজন কিছু পাল্টে জল সরবরাহের উন্নতি করতে হবে। স্থানগুলির নির্দেশ ও নলের ব্যাসের নির্দেশ নক্সায় দেওয়া আছে।

(ঙ) অন্তর্বর্তী কালের ব্যবস্থায় নল সংযোজন ও পাম্পিংয়ের যে ব্যবস্থা হয়েছিল, অন্তিম পর্যায়ে তার সামান্য সংশোধন করতে হবে।

(চ) আরও নতুন চারটি স্থানে মাঝ পথে চাপ বাড়াবার জন্যে ১½ কোটি গ্যালনের সংগ্রহাধার ও পাম্পিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ছ) পরিশেষে টালা থেকে ১৬·১ কোটি গ্যালন জল ৫৫ psi-তে ও গার্ডেনরীচ থেকে ১৪·৭ কোটি গ্যালন জল ৯০ psi চাপে প্রেরিত হবে।

# পাতালের জল

শিশির নিয়োগী

পাতালের জল অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার আমরা প্রাচীন কাল থেকেই করছি। প্রথম যখন মানুষ বুঝতে শিখলো যে, নদী বা পুকুরের জল খেলে অসুখ হয়, কিন্তু মাটি খুঁড়ে কুঁয়ো তৈরি করলে সে জলে শরীর খারাপ হবার সম্ভাবনা অনেক কম, তখন থেকেই মানুষ পাতালের জলের সন্ধানে আরও উৎসাহী হলো।

আমেরিকার সহরগুলির মধ্যে শতকরা কুড়ি ভাগ জল হলো পাতালের জল। নেদারল্যাণ্ডে পাতালের জলের পরিমাণ মোট ব্যবহৃত জলের ৭০ শতাংশ, যুগোশ্লাভিয়ার ৯০ শতাংশ লোকই পাতালের জলের উপর নির্ভরশীল।

ভূগর্ভস্থ জলের ঝামেলা আছে অনেক। অনেক জায়গায় জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও জল হার্ড অর্থাৎ শক্ত হতে পারে অথবা আমেরিকার মত অনেক জায়গায় জলে হাইড্রোজেন সালফাইডের পরিমাণ বেশী থাকে। লণ্ডন সহরের আশেপাশের টিউবওয়েলের জলে নরম সাদা লাইমষ্টোনের পরিমাণ বেশী থাকায় জল হয় শক্ত। বাংলা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলের মত পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই পাতালের জলে থাকে তীব্র লবণাক্ততা। সে জল খাওয়া যায় না। আর এই লবণাক্ততা দূর করাও কম ঝামেলার ব্যাপার নয়।

সমুদ্রের উপকূলবর্তী জায়গাগুলির জলে লোহার পরিমাণ থাকে বেশী—এছাড়া থাকে ম্যাঙ্গানিজ ও অ্যামোনিয়া।

পৃথিবীর সব দেশেই লোকসংখ্যা ও কলকারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নদীর জলের অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে। লোকের মলমূত্র ও ব্যবহৃত ময়লা জল এবং কলকারখানার দূষিত নোংরা জল নদীতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে অবলীলাক্রমে। এই সব কারণে সবাই পাতালের জল ব্যবহার করবার দিকে ঝুঁকেছেন। তবে ভূগর্ভস্থ জলের অধিক ব্যবহারের ফলে পাতালের জলেও টান পড়ে অনেক সময়। তখন প্রশ্ন ওঠে, পাতালের জলের ভাণ্ডারে কিভাবে জলের সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়? অনেক সময় নদীর দূষিত জল পাম্প করে কোন নীচু জমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে জলসেচের ফলে জমিতে চাষ-আবাদেরও যেমন সুবিধা হয়, তেমনি এই জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির স্তরের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে পাতালে গিয়ে জমা হয়। নদীর জল নোংরা হলেও সেই জল মাটি ও বালির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে যখন পাতালের দিকে যেতে থাকে, তখন সেই জল পরিস্রুত হয়ে যায়—পাতালে জমা হবার আগেই জল হয়ে যায় পবিত্র। জার্মেনীর অনেক জায়গায় এভাবে শুকিয়ে যাওয়া পাতালকে আবার সরস করা হচ্ছে।

সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে অনেক সময় পাতালের জলে অতিমাত্রায় লবণ পাওয়া যায়। জলের অত্যধিক লবণাক্ততার জন্যে এই জল সাধারণভাবে শোধন করেও খাওয়া যায় না। সমুদ্রের তীরে এই ধরণের লবণাক্ততার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ভূগর্ভস্থ যে স্তরে জল থাকে, সেই স্তর সাধারণতঃ সমুদ্রের তলে গিয়ে শেষ হয়। টিউবওয়েলের সাহায্যে যখন জল তোলা হয়, তখন সাধারণভাবে স্তরের-মধ্যেকার মিষ্টি জলই আসবার কথা। এই জল তোলা হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের জলবাহী

অন্যান্য স্তর থেকে ঐ স্তরের জলের ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়। তবে টিউবওয়েলের জলের টান যদি এত বেশী হয় যে, আশেপাশের অন্যান্য স্তর থেকে জল সরবরাহ করেও ঐ টিউবওয়েলের চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না, তখন দেখা যায় যে, ঐ স্তরের যে অংশটি সমুদ্রের জলের তলায় গিয়ে মিশেছে, সেখান থেকে সমুদ্রের লোনা জল জলস্তরের মধ্যে ঢুকছে ও শেষ পর্যন্ত টিউবওয়েলের জলও লোনা করে দিচ্ছে।

ঝরণার জল—ভূগর্ভস্থ জলই পাহারের বুক চিরে ঝরণার ধারায় নামে। এই জল ধরে একটা বড় দীঘিতে জমা করে থিতিয়ে নিতে পারলে পরিষ্কার জল পাওয়া যায় অনেক সময়। দার্জিলিং ও কালিম্পং সহরের জল এই ধরণের ঝরণা থেকেই পাওয়া যায়।

আগেই ভূগর্ভস্থ জলের অনেকগুলি দোষের কথা বলেছি। ভূগর্ভস্থ জল সাধারণতঃ একটু শক্ত হয়। চুন অথবা চুন ও সোডা মিশিয়ে এই ধরণের জলকে কোমল করা হয়ে থাকে। অনেক জায়গায় Zeolite Softner-এর সাহায্যে জলের কাঠিন্য দূর করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কোম্পানী তাদের পেটেন্ট Contact Softner, যেমন—অ্যাকৃসিলেটর, ক্ল্যারিফ্লো (Clariflow) বা স্পড্‌লিং প্রেসিপিটেটর (Spaudling Precipitator) বাজারে ছেড়েছেন।

শক্ত বা কঠিন জলের মস্ত অসুবিধার একটা হলো সাবান কাচা। শক্ত জলে কাপড় কাচতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়। আজকাল এই ধরণের অসুবিধার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সাবানের বদলে নানান ধরণের সিন্‌থেটিক ডিটারজেন্ট বেরিয়েছে। আমাদের দেশেও এর প্রসার ঘটেছে। সার্ফ, ডেট, ম্যাজিক—এই ধরণেই বিকল্প সাবান। এই সব ডিটারজেন্ট ব্যবহারের ফলে একটা বড় অসুবিধা আমরা লক্ষ্য করেছি। সেটা হলো, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী বা স্যুয়ারের মধ্যে ফেনার সৃষ্টি। আমাদের ব্যবহৃত ময়লা জলের মধ্যে যখন ডিটারজেন্ট মেশে, তখন উভয়ে মিলে স্যুয়ার লাইনের মধ্যে গিয়ে অবাঞ্ছিত ফেনার সৃষ্টি করে। এই ফেনা-বহুল ময়লা জল যখন স্যুয়েজ শোধন কেন্দ্রে (Sewage Treatment Plant) গিয়ে পৌঁছায়, তখন সেখানে গিয়েও প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই অবাঞ্ছিত ফেনা কিভাবে নষ্ট করা যায়, তা নিয়ে জোর গবেষণা চলছে সব জায়গায়।

যে সব জলে লোহা বা ম্যাঙ্গানিজ থাকে, সাধারণতঃ সেই জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা অ্যামোনিয়া বা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসও থাকতে পারে। এই ধরণের জল থেকে অবাঞ্ছিত জিনিষগুলি দূর করতে গিয়ে 'এয়ারেশন' পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এয়ারেশন হলো, জলকে স্প্রে করে দিয়ে হাওয়া খাওয়ানো। জলের মধ্যেকার অনেক গ্যাস হাওয়ায় মিলিয়ে যায় আর কিছু রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসের মধ্যেকার অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে অদ্রবণীয় সল্টে পরিণত হয়ে তলায় পড়ে যায়। এবার এই জল ছেঁকে নিলেই হয়ে গেল।

ভূগর্ভস্থ জলের দোষ-গুণ দুই-ই আছে। বর্তমান কালে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যাপারে দু-রকমের গবেষণা চলছে। প্রথমতঃ ভূগর্ভস্থ জল ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করবার জন্যে বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা 'পানি মহারাজের'* উপর ভরসা করে থাকতে

*পানি মহারাজ—রাজস্থান ও ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এঁরা গ্রামবাসীকে ভূগর্ভস্থ জলের সন্ধান দেন। কোথায় মাটি খুঁড়লে ভাল জল পাওয়া যাবে, পানি মহারাজ তাঁর যাদুদণ্ডের সাহায্যেই নাকি বলে দিতে পারেন।

পারছেন না। এই ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ভূতত্ত্ববিদেরা। আর চেষ্টা চলেছে, কিভাবে কম খরচে ভূস্তর ভেদ করে ঐ জল উপরে তোলা যায়। ভূস্তরে নানা ধরণের বিন্যাস বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। তাই নানা জায়গায় বিজ্ঞানীরা ভূস্তরে জলের সন্ধান পেলেও সেই স্তরের উপরের কঠিন পাথরের আচ্ছাদন ভেদ করে জলের নাগাল পাওয়া বহু ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করাই মানুষের ব্রত। চেষ্টা চলেছে ভূগর্ভস্থ জলের মধ্যেকার খারাপ জিনিষগুলি কিভাবে কম খরচে দূর করা যেতে পারে। জল হলো একটি দৃঢ়বদ্ধ যৌগিক পদার্থ (Stable compound)। বাইরের কলুষে জলের নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা নষ্ট হয় না। জলের মধ্য থেকে ময়লাগুলি বের করে দিতে পারলেই পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের সাধনা চলেছে, কেমন করে ভূগর্ভস্থ জলের মধ্যেকার দূষিত জিনিষগুলি দূর করে আসল জলটাকে পাওয়া যেতে পারে।

# বায়োনিক্স

বিমান বসু

আমরা দেখেছি যে, প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ নানা প্রাকৃতিক বিষয় অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছে এবং তার ফলে সে নতুন নতুন যন্ত্রও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। গত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিখ্যাত ইটালীয় বৈজ্ঞানিক লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি (Leonardo da vinci) উড়ন্ত পাখীদের দেখে মানুষের ওড়বার উপযোগী যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি সে চেষ্টায় সফল হতে পারেন নি। তবুও বর্তমান বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা আবার দা ভিঞ্চির পন্থায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণের দ্বারা জীব-জগতের বিভিন্ন কার্য-প্রণালীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের প্রাপ্ত তথ্যাদির সাহায্যে জাহাজ, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির নক্সা এবং বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধনও করা হচ্ছে। এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে গবেষণাই হলো বায়োনিক্সের (Bionics) মূল উদ্দেশ্য। কারোর মতে বায়োনিক্সের একমাত্র লক্ষ্য হলো, প্রয়োগ-বিদ্যার (Technology) উন্নতির জন্যে জীব-জগতে অনুসন্ধান করা। এই বিষয়টি বিজ্ঞান-জগতে এত নতুন যে, এর প্রকৃত সীমা এখনও নির্ধারিত হয় নি। কারণ দেখা গেছে যে, এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার জন্যে প্রয়োজন—জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত, যন্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান।

এখন দেখা যাক, কি ভাবে বায়োনিক্সের প্রয়োগ করা হয়। আমরা সকলেই জানি যে, সূর্যমুখী ফুল সব সময়ে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। কি ভাবে সূর্যমুখী ফুল আকাশে সূর্যের গতি অনুসরণ করে, আমরা যদি তা আবিষ্কার করতে পারি, তবে হয়তো আমাদের মহাকাশযান-গুলির অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে আরও উন্নত ধরণের সূর্যসন্ধানী যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে। বায়োনিক্সের সাহায্যে এই সমস্যাটির সমাধানের জন্যে সর্বপ্রথমে একজন জীব-বিজ্ঞানী উক্ত জটিল প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করেন এবং লব্ধ মূলতত্ত্ব-গুলি একজন গণিতবিদের দ্বারা গণিতের ভাষায়

পরিবর্তিত করা হয়। সর্বশেষে একজন যন্ত্রশিল্পী সেই গণিতশাস্ত্রগত তথ্যগুলিকে নক্সা বা মডেল রূপে গ্রহণ করে একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা তৈরি করেন, যা পরে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়।

এছাড়াও আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমান যুগের বৈদ্যুতিক কম্পিউটার, রেডার, ডুবোজাহাজ প্রভৃতিতেও প্রকৃতির অনুকরণে তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রাদির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে জীব-জগতের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি কেবলমাত্র কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ ও মূলতঃ জলের সমন্বয়ে গঠিত এবং সে জন্যে সেগুলি বেশী উত্তাপ, অ্যাসিড ইত্যাদি সহ্য করতে পারে না। পক্ষান্তরে আমাদের হাতে তামার তার, কাচের লেন্স, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি অফুরন্ত ও বিশেষ গুণসম্পন্ন দ্রব্যসামগ্রী আছে, যার দ্বারা আমরা আরও প্রয়োজনোপযোগী যন্ত্রাদি তৈরি করতে পারি।

আকাশে মেঘ বা উড়োজাহাজ ইত্যাদি খোঁজবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা গত মহাযুদ্ধের সময় রেডার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। অদৃশ্য কোনও বস্তুর স্থান নির্ণয়ের জন্যে রেডার থেকে উচ্চ কম্পন-বিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়, যা উক্ত বস্তুটির দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে একটি গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে। প্রেরিত ও গৃহীত সঙ্কেতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থেকে বস্তুটির গতি ও দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

আবার জীব-জগতে দেখা যায় যে, বাদুড়ও একই প্রণালীতে পোকামাকড় বা অন্য কোনও প্রতিবন্ধকের অবস্থান নির্ণয় করে। তবে সে বেতার-তরঙ্গের বদলে উচ্চ কম্পনযুক্ত শব্দ-তরঙ্গের ব্যবহার করে। বাদুড় ওড়বার সময় মুখ থেকে উচ্চ কম্পনযুক্ত শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে' তা সম্মুখ দিকে প্রেরণ করে এবং কোনও বস্তু থেকে প্রতিফলিত শব্দ-তরঙ্গ কানের সাহায্যে গ্রহণ করে। কিন্তু বাদুড়ের প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র মানুষের তৈরি যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। বাদুড়ের প্রেরক-যন্ত্র এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই অদ্ভুত ক্ষমতার রহস্যটির উদ্ঘাটন করা বায়োনিক্সের সাহায্যে যদি সম্ভব হয়, তবে ভবিষ্যতে হয়তো আরও উন্নত ধরণের রেডার যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হবে।

বাদুড় ছাড়া আরও কয়েক রকমের জলচর প্রাণী তাদের চলাফেরা ও শিকার ধরবার জন্যে শব্দের প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে। এই প্রসঙ্গে শুশুক জাতীয় প্রাণীদের নাম করা যেতে পারে। এরা সমুদ্রের গভীর তলদেশে থাকে, যেখানে সূর্যের আলো সচরাচর পৌঁছায় না। তবুও দেখা গেছে যে, জলের মধ্যে শব্দের প্রতিধ্বনির সাহায্যে এরা অতি দক্ষতার সঙ্গে জলের তলায় চলাফেরা এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এই জীবগুলির কার্যপ্রণালীর অনুকরণেই সমুদ্র বা নদীর গভীরতা মাপবার বা জলের তলায় ডুবোজাহাজ ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে বর্তমান সোনার (Sonar) যন্ত্রটির উদ্ভাবন হয়।

আমরা দেখেছি যে, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি আবিষ্কারের পূর্বে ডাক আদান-প্রদানের জন্যে পায়রা ব্যবহার করা হতো এবং তার মূলে ছিল পায়রার পথ চিনে ফেরবার অদ্ভুত ক্ষমতা। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা পায়রার দেহের সঙ্গে ছোট ছোট বেতার প্রেরক-যন্ত্র বেঁধে তাদের উড়িয়ে দিচ্ছেন এবং সেই বেতার প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রেরিত সঙ্কেতের সাহায্যে তাদের গতি অনুসরণ করছেন। তাদের এই পরীক্ষার দ্বারা যদি পায়রার অবস্থান ও দিগনির্ণয়ের অসাধারণ ক্ষমতাটির ব্যাখ্যা করা যায়, তবে হয়তো পথ-নির্দেশের নতুন কোনও উপায় বের করা যাবে।

বর্তমান কালে যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি বিশেষ অস্ত্র হলো—নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র (Guided missile)। এই ক্ষেপণাস্ত্রের একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, একবার নিক্ষিপ্ত হলে এগুলি কেবলমাত্র শত্রু-বিমানের নির্গমন পথ থেকে উৎপাদিত তাপের

পথরেখাকে (Heat trail) অনুসরণ করেই বিমানটিকে ধ্বংস করতে পারে। তবে এই ক্ষেপণাস্ত্রের তাপ-সন্ধানী যন্ত্রের চেয়ে আকারে ও কার্যকারিতায় অনেক উন্নত তাপ-সন্ধানী যন্ত্র আমরা প্রাণী-জগতে দেখতে পাই। র‍্যাটল্ নামক বিষধর সাপের মাথার উপরে দুটি চোখের মাঝখানে ক্ষুদ্রাকার একটি বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে, যা বাতাসের তাপমাত্রার ১/১০০০ ডিগ্রীর তারতম্যও ধরতে পারে এবং সেই তাপ অনুসরণ করে শিকার খুঁজে বের করতে পারে। এই সাপের ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয়টির কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করে ক্ষেপণাস্ত্রের তাপ-সন্ধানী যন্ত্রের আরও উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

জলে জাহাজ ও ডুবোজাহাজের গতিবেগ আরও দ্রুত করবার জন্যে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো জাহাজের খোলের সঙ্গে জলের প্রতিরোধ যথাসম্ভব হ্রাস করা। কারণ—দেখা গেছে যে, একটি জলযানের ইঞ্জিনের বেশ কিছু শক্তি ঐ প্রতিরোধ অতিক্রম করতেই নষ্ট হয়ে যায়। আবার তিমি, হাঙ্গর ইত্যাদি বিশালকায় সামুদ্রিক জীবগুলি অনায়াসে অতি দ্রুতবেগে জলের মধ্যে চলতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, দেহের আয়তনের তুলনায় এই জীবগুলি অতি অল্প শক্তি প্রয়োগ করেই দ্রুতগতিতে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। এই জীবগুলির এইরূপ ক্ষমতার একটি মূল কারণ হলো এদের দেহের বিশেষ গঠন, যার দরুণ এরা অনায়াসে জল কেটে এগিয়ে যেতে পারে। এদের দেহের আকারের অনুকরণেই বর্তমান জাহাজ ও ডুবোজাহাজগুলির খোলের গঠন-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে, যার জন্যে সেগুলি আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়েছে।

সর্বশেষে মানুষের দেহের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, যথা—চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে আমরা সকল পার্থিব বস্তু চিনতে পারি। বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধরেই মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্বাদ-গ্রহণশক্তি ও স্পর্শশক্তির রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছেন এবং বর্তমানে তাঁরা প্রায় সব কয়টিরই কার্যসাধনের ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রয়োগ করে এমন সব যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলির সাহায্যে মানুষের সান্নিধ্য ছাড়াও দূরবর্তী যে কোনও বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে সনাক্ত করা যেতে পারে। এরূপ বিশেষ ধরণের কয়েকটি যন্ত্রের সাহায্যেই অ্যাপোলো-৮-এর অভিযানের পূর্বে চন্দ্রের গঠন সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকেরা রকেটের সাহায্যে ঐ যন্ত্রগুলি চন্দ্রে প্রেরণ করেন, যেখানে সেগুলি অবতরণের পর সেখানকার বাতাসের তাপ ও চাপ, বিকিরণের মান (Radiation level), চন্দ্রপৃষ্ঠের কাঠিন্য ও রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি ধার্য করবার পর প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিভিন্ন বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করে। যন্ত্রের এইরূপ কার্যকুশলতা সত্যিই অচিন্তনীয়।

মানুষের শরীরের আর একটি প্রধান ও খুবই জটিল অঙ্গ হলো মস্তিষ্ক। তাছাড়া অন্যান্য জীবজন্তুর মস্তিষ্কের তুলনায় আমাদের এই ইন্দ্রিয়টি কার্যকারিতায় অনেক বেশী উন্নত। মস্তিষ্কের দুটি প্রধান কাজ হলো—কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবার পর তা স্মরণ রাখা এবং প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আমাদের বিভিন্ন অঙ্গকে চালিত করা। আমাদের হাত, পা ইত্যাদির চালনার মূলে হলো মস্তিষ্কের ফীড ব্যাক্ (Feed back) নামক বিশেষ প্রণালী। এই ফীড ব্যাক্ প্রণালীর উদাহরণ আমরা যে কোনও চালকের গাড়ীচালনায় দেখতে পাই। গাড়ীর গতি বাড়াবার জন্যে মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষ থেকে উৎপাদিত স্নায়বিক সঙ্কেত চালকের পায়ের পেশীতে প্রেরণ করা হয়, যার ফলে

তা গাড়ীর বেগবর্ধক পেডালে চাপ দেয়। গাড়ীর গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে বেগমাপক যন্ত্রের (Speedometer) কাঁটা তা নির্দেশ করে। চালকের চোখ তখন সেই কাঁটা দেখে মস্তিষ্কে সঙ্কেত প্রেরণ করে এবং তাকে গাড়ীর গতিবেগ জানায়। মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষ এবার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গাড়ীর গতিবেগ আরও বাড়ানো উচিত কি না, তা স্থির করে এবং সেই সিদ্ধান্ত পায়ের পেশীতে প্রেরণ করলে তা পেডালে চাপ শিথিল বা দৃঢ় করে অথবা দরকারমত ব্রেক প্রয়োগ করে। এছাড়াও একটি অনুরূপ প্রথায় চোখ, মস্তিষ্ক ও হাতের সাহায্যে গাড়ীর দিক পরিবর্তনও করা হয়। এভাবে চালকের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহযোগে একটি আবর্তনশীল প্রণালী কাজ করে, যা চালককে গাড়ীর গতি ও দিক নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

উপরিউক্ত উদাহরণটি ছাড়াও আরও বহু জটিল কার্য সাধনের জন্যে ফীড ব্যাক্ প্রণালীর প্রয়োগ করা হয়। বায়োনিক্স-বিজ্ঞানীরা এই প্রণালীর ভিত্তিতে বর্তমানে বহু উপযোগী এবং জটিল যন্ত্রাদি তৈরি করেছেন, যেগুলি মানুষের মতই বহু কার্য সমাধা করতে সক্ষম। এইরূপ একটি বহুল প্রচলিত যন্ত্র হলো তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র (Thermostat)। এই যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে কোনও বস্তুর তাপমাত্রা স্থির রাখতে পারে। এরূপ একটি যন্ত্রের তিনটি প্রধান অঙ্গ হলো একটি দ্বিধাতুর সরু ফালি, একটি বৈদ্যুতিক রিলে ও একটি বৈদ্যুতিক তাপকুণ্ডলী (Heating element)। দ্বিধাতু খণ্ডটির একটি বিশেষ গুণ হলো এই যে, তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে এটি বেঁকে যায় এবং তার ফলে বৈদ্যুতিক রিলের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহের গতিপথ সংযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করে। রিলেটি আবার তাপকুণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং এখানেও একটি আবর্তনশীল প্রণালী কাজ করে, যা বস্তুটির তাপমাত্রা স্থির রাখতে সাহায্য করে।

সেইরূপ মানুষের মস্তিষ্কের এত জটিলতা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা অবশেষে এর কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে বেশ কিছু জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁদের প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রয়োগের ফলে হলো, বর্তমান যুগের আর একটি বিস্ময়কর অবদান—বৈদ্যুতিক কম্পিউটারের সৃষ্টি। কম্পিউটারের কার্যপ্রণালী অনেকটা আমাদের মস্তিষ্কের মতই, তবে এর দ্রুততা মস্তিষ্কের চেয়ে বহুগুণ বেশী অর্থাৎ যে সব গণনা-কার্য করতে আমাদের কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন সময় লাগে, তা একটি কম্পিউটার মাত্র কয়েক সেকেণ্ডেই সম্পাদন করতে পারে।

তাছাড়া বর্তমানে ফটো সেল, মাইক্রোফোন, ট্র্যানজিষ্টর প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের প্রয়োগ করে এমন সব উন্নত ধরণের যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে, যা কথা বা লেখাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারে কিংবা ব্যাঙ্কের চেকে গ্রাহকের হস্তাক্ষরের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। এগুলির মধ্যেও সবচেয়ে আশ্চর্যজনক যন্ত্রটি হলো, একটি বিশেষ ধরণের টাইপ মেসিন, যা মানুষের মতই কোনও কথা শুনে তা আপনা থেকেই টাইপ করতে পারে। বায়োনিক্সের প্রয়োগ চিকিৎসাশাস্ত্রেও এক যুগান্তর এনেছে এবং বর্তমানে শল্যচিকিৎসায় কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের ব্যবহার বহু রোগীর প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

উদাহরণগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়োনিক্সের প্রয়োগের অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি মাত্র এবং ভবিষ্যতে এর সাহায্যে আরও কত কঠিন সমস্যার সমাধান হবে, তা বলা হয়তো এত শীঘ্র সম্ভব নয়, তবে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে কোনও দিন হয়তো মানুষের সব কাজই যন্ত্রের দ্বারা করা সম্ভব হবে।

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## তাপ উৎপাদনে শহরের আবর্জনা ব্যবহার

বৃটেনের নটিংহাম শহরের একাংশে একটি নতুন তাপ সরবরাহ পরিকল্পনা (সম্ভবতঃ এটি ইউরোপের বৃহত্তম তাপ সরবরাহ পরিকল্পনা) চালু করা হবে।

এটি আবর্জনা পোড়ানো যন্ত্র (Incinerator) ও হিটিং প্ল্যান্টের যৌথ রূপ নেবে। ইনসিনারেটর কয়লা-চালিত বয়লারের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

এই প্রকল্প থেকে ৪০,০০০ লোকের শহরের গৃহস্থালী, ব্যবসায় ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ সরবরাহ করা যাবে। এর ফলে প্রত্যেক বাড়ীর হিটিং ব্যবস্থা ও গরম জলের খরচ এক-তৃতীয়াংশ কমে যাবে।

১৯৭০ সালে থেকে এই প্রকল্প থেকে কাজ পাওয়া যাবে আশা করা যায়। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে ইনসিনারেটর ১১০,০০০ টন আবর্জনা প্রতি বছর পোড়াতে সক্ষম হবে। এর অর্থ ৪০,০০০ টন কয়লা পোড়াবার সমান কাজ করবে।

## তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসা

কোন কোন ধরণের রক্তের ক্যানসার বা লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসা তেজস্ক্রিয় শক্তির সাহায্যে হতে পারে। এই মারাত্মক শক্তি কেবলমাত্র রক্ত-কণিকার উপর প্রয়োগ করা নিয়ে বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন। সম্প্রতি এই রশ্মি দেহের অন্য কোন অংশে না পড়ে যাতে রোগীর রক্তের উপরই পতিত হয়, তার পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এজন্যে তেজস্ক্রিয় শক্তি উৎপাদনের একটি যন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি হয়েছে। যন্ত্রটির ওজন মাত্র ৫০ পাউণ্ড, সহজেই নাড়াচাড়া করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় রোগীর শয্যাপার্শ্বে এই যন্ত্রটি রাখা হয়। তার হাতের রক্তবহা নাড়ী থেকে রক্ত বের করে একটি নলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মি উৎপাদনের ঐ যন্ত্র থেকে নির্গত রশ্মি ঐ নলের মধ্যে প্রবাহিত রক্তের উপর পতিত হয়। ঐ রক্ত আবার আর একটি নলের সাহায্যে ধমনীর মধ্যে প্রেরণ করা হয়।

## বেতো রোগীদের সাহায্যে পিভিসি

মেস্তজ (ডি. এ. ডি.)—পিভিসি কি বস্তু? এর পুরা নাম পলিভিনাইল ক্লোরাইড। এটি একরকম কৃত্রিম পদার্থ। অনেকেই এখন জানেন যে, কৃত্রিম বা সিন্থেটিক কাপড়ের পোষাক-পরিচ্ছদ পরলে নানারকম চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পিভিসি দিয়ে তৈরি অন্তর্বাস এবং ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করলে ব্যথা কমে ও তাড়াতাড়ি সেরে যায়। এ জিনিস ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই বাতের গোলযোগ ও ভীতিজনিত প্রদাহের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে।

পিভিসির গুণাগুণ সম্বন্ধে ডাক্তারেরা স্থির সিদ্ধান্তে না এলেও পিভিসি-তে কোন ভেষজগুণ থাকা সম্ভব। পিভিসি-র আপেক্ষিক তাপ কম এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তুর তুলনায় এটি অত্যন্ত দুর্বল পরিবাহী। এই কারণেই হয়তো পিভিসি বাত সারাতে সাহায্য করে।

## ক্ষত নিরাময়ে শব্দ-তরঙ্গ

বৃটিশ জীব-বিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীর একটি দল লক্ষ্য করেছেন যে, ক্ষত নিরাময়ে শব্দ-তরঙ্গ সাহায্য করতে পারে।

স্বল্প শক্তির আল্ট্রাসোনিক শব্দ-তরঙ্গ প্রয়োগ করে তাঁরা একটি ক্ষতের আরোগ্য দ্রুততর করেছেন।

পরীক্ষামূলকভাবে একটি খরগোসের কানে একটি ক্ষত সৃষ্টি করে তার কান থেকে এক সেন্টিমিটার পরিমাণ টিস্থ তুলে নেওয়া হয়। তার পর এই ক্ষতটির উপর সপ্তাহে তিন বার করে প্রতিবারে ১৫ মিনিট ধরে আলট্রা সাউণ্ডের কম্পন প্রয়োগ করা হয়। ক্ষত নিরাময়ের জন্যে যে সব নতুন টিস্থ গজায়, এর ফলে সেগুলিকে অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

এই দ্রুততর ক্ষত নিরাময়ের কারণ কি তা জানা যায় না। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, স্ট্রীমিং (Streaming) নামে একপ্রকার ক্রিয়া চলতে থাকে, যার ফলে নতুন টিস্থ তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় মালমশলা অনেক দ্রুত পরিবাহিত হয় বলে মনে হয়। পরবর্তী গবেষণায় এই ধারণাই অনেক পরিমাণে সমর্থিত হয়েছে।

সম্প্রতি লণ্ডনে পদার্থ-বিজ্ঞান প্রদর্শনী সুরু হয়েছে। সেখানে গি'জ হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগের এক গবেষক দলের এই কাজ প্রদর্শিত হচ্ছে।

## ঔষধের দ্বারা কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত নবম আন্তর্জাতিক কুষ্ঠ কংগ্রেসে ঔষধের দ্বারা কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার কথা উঠেছিল। বৃটেন ও বিদেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার বৃটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজের কথা জানান। বর্তমানে বিশ্বে অন্ততঃ ১৫,০০০,০০০ লোক এই রোগে ভুগছে এবং এই রোগ ক্রমবর্ধমান।

ঔষধের দ্বারা কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা গত কয়েক বছর হলো সম্ভব হচ্ছে। কুষ্ঠরোগের ঔষধ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে অন্যতম অন্তরায় ছিল এই যে, কোন গবেষণা-প্রাণীর মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত করবার কোন উপায় জানা ছিল না। এখন বৃটিশ গবেষণার ফলে এই বাধা অপসারিত হয়েছে।

মালয়েশিয়ার লেপ্রোসি রিসার্চ ইউনিটের ডাঃ এম. এফ. আর ওয়াটারস সম্মেলনে বলেন, সালফা ড্রাগ নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণতঃ যে পরিমাণ ঔষধ রোগীকে দেওয়া হয়ে থাকে, তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ দেওয়া দরকার। যেমন ড্যাপসন বা ডি-ডি-এস সপ্তাহে ৬০০ মিলিগ্র্যাম করে দেওয়া হয়ে থাকে। ডাঃ ওয়াটারস দেখেছেন, সপ্তাহে ৭ মিলিগ্র্যামই যথেষ্ট। সাত জন রোগীকে কম ডোজে এই ঔষধ সাড়ে চার মাস ধরে দিয়ে দেখা গেছে, বেশী ডোজের রোগীদের তুলনায় তাদের বেশী উন্নতি ঘটেছে।

সম্মেলনে আলোচিত বিষয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, কুষ্ঠরোগ-বিরোধী ঔষধের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে।

# কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

## জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৯

২২শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

পরিষদ-আয়োজিত মডেল প্রদর্শনীতে একটি ক্রেন ও একটি মাইক্রো-ওয়েভ লিংকের মডেল দেখা যাচ্ছে।
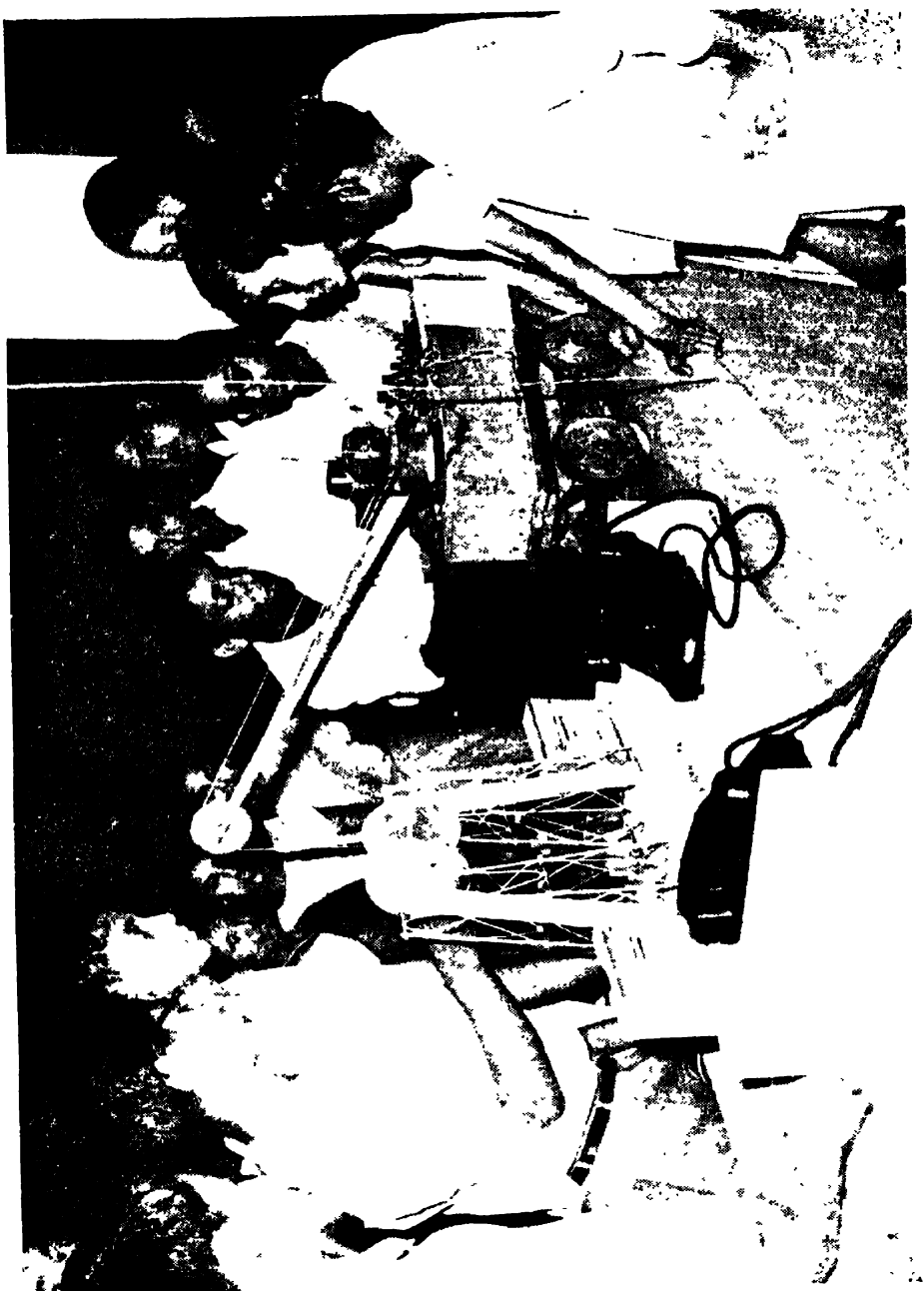
# কাঠ থেকে কাপড়

প্রাকৃতিক বিভিন্ন সম্পদকে মানুষ অনেক দিন ধরেই নিজের কাজে লাগিয়ে আসছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কাজে লাগাবার ব্যাপারে মানুষ খুব বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারে না। বিজ্ঞানের কোন রকম সাহায্য না নিয়েই আমরা কাঠ বা কয়লাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করি।

কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদকে বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাভাবে পরিবর্তিত করে মানুষ যে ভাবে আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শিখেছে, তা খুবই বিস্ময়কর। আজ পৃথিবীতে যত কাপড় বা কাগজ ব্যবহৃত হয়, তার অনেক অংশই যে কাঠ থেকে তৈরি, তা জানলে সত্যিই অবাক হতে হয়।

কাঠ থেকে কিভাবে কাপড় তৈরি করা হয়, সে কথাই সংক্ষেপে বলছি। কাঠ থেকে সাধারণত: যে কাপড় তৈরি হয় তা সিল্কের কাপড় বা রেশমী কাপড়ের মত দেখায় বলে তার নাম হয়েছে নকল রেশম। নকল রেশম তৈরির জন্যে কাঁচা মাল হিসাবে যা প্রয়োজন, তার নাম সেলুলোজ। উদ্ভিদ-দেহের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ থাকে। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সেলুলোজের উপাদান। কিভাবে গাছ থেকে সেলুলোজ সংগ্রহ করা হয় এবং কিভাবেই বা তা দিয়ে নকল রেশম তৈরি করা হয়, এবারে সে কথায় আসা যাক।

বন থেকে গাছ কেটে সেগুলিকে জলে ভাসিয়ে বা অন্যভাবে কল-কারখানায় নিয়ে আসবার পর সেখানে তাদের ছাল ছাড়ানো হয়। তারপর গাছকে ছোট ছোট খণ্ডে কেটে টুকরাগুলিকে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থে ফোটানো হয়। আরও কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাঠকে রেজিন প্রভৃতি অপদ্রব্য থেকে মুক্ত করা হয়। এই ভাবে প্রাপ্ত পরিশোধিত কাঠকে বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজে পরিণত করে তাকে বাষ্পের সাহায্যে শুকিয়ে নিয়ে কাপড়ের কলে পাঠানো হয়।

নকল রেশমের আধুনিক নাম হয়েছে রেয়ন। কারখানায় সেলুলোজকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও আর্দ্রতায় কষ্টিক সোডার দ্রবণে ডোবানো হয়। এইভাবে প্রাপ্ত অধিকতর বিশুদ্ধ সেলুলোজের নাম অ্যালকালি সেলুলোজ।

অ্যালকালি সেলুলোজকে শুকনো করে গুঁড়া করবার মেসিনে ঢোকানো হয়। এই মেসিনের ভিতর কতকগুলি ব্লেড এমনিভাবে ঘুরতে থাকে, যাতে সেলুলোজ সম্পূর্ণরূপে গুঁড়া হয়ে যায়।

গুঁড়া সেলুলোজকে এইভাবে কয়েক ঘণ্টা রেখে দেবার পর তার সঙ্গে তার ষাট শতাংশ পরিমাণ কার্বন বাইসালফাইড মেশানো হয়। এই মিশ্রণের ফলে সাদা সেলুলোজের কণাগুলি ক্রমশঃ আয়তনে বাড়তে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হলুদে লাল রঙের এক রকম থলথলে পদার্থে পরিণত হয়। একে বলা হয় সেলুলোজ জ্যানথেট। সেলুলোজ জ্যানথেটকে জলে মিশিয়ে মিশ্রণটাকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করা হয়। এর ফলে ভিস্‌কোজ নামে মধুর মত এক প্রকার পদার্থ তৈরি হয়।

রাসায়নিক কারণে ভিস্‌কোজকে কয়েক দিন একই ভাবে ফেলে রাখা হয়। ভিস্‌কোজের মধ্যে কোন রকম অপদ্রব্য বা কঠিন পদার্থ যাতে না থেকে যায়, সে জন্যে ভিস্‌কোজকে এই সময়ে পরিশোধন করা হয়। ভিস্‌কোজের মধ্যে যদি কোন গ্যাস বা বাতাস থাকে তবে এই সময়ে যন্ত্রের সাহায্যে তাও বের করে নেওয়া হয়।

এইভাবে প্রাপ্ত ভিস্‌কোজকে সূতা তৈরির সরু ধাতব নলের মধ্যে চালনা করা হয়। এই নলগুলির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কয়েকটি ছিদ্র থাকে। এই নলগুলি এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে ছিদ্রগুলি কোন পাত্রের মধ্যে রাখা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণের মধ্যে ডোবানো অবস্থায় থাকে। কোন কোন নলের ছিদ্রের ব্যাস এক ইঞ্চির পাঁচ-শ' ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

এই সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চালিত হবার পর ভিস্‌কোজ সূতার আকারে বেরিয়ে আসে এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণের সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে যায়।

এভাবে প্রাপ্ত সূতাকে প্রথমে একটা ঘূর্ণায়মান বাক্সের মধ্যে জড়ানো হয়। পরে সেই সূতার কুণ্ডলীর উপর জল ঢেলে তাথেকে অ্যাসিড এবং অন্যান্য অপদ্রব্য দূরীভূত করা হয়। এরপর সূতার কুণ্ডলীকে চুল্লীতে গরম করবার পর শুষ্ক করে ব্লিচিং মেসিনে শোধন করা হয়। সূতার কুণ্ডলীকে গন্ধক-মুক্ত করবার জন্যে এর উপর সোডিয়াম সালফাইড স্প্রে করা হয়। ব্লিচিং মেসিনে শোধন করবার ফলে সূতার কুণ্ডলীর মধ্যে যে ক্ষারীয় ভাবের সৃষ্টি হয়, তা প্রশমিত করবার জন্যে লঘু অ্যাসেটিক অ্যাসিডের দ্রবণ এর উপর স্প্রে করা হয়।

অতঃপর এই কুণ্ডলীকে সাবান-জলে ধৌত করে চুল্লীর উত্তাপে শুষ্ক করা হয়।

এভাবে নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ, চাপ এবং আর্দ্রতা প্রভৃতি বজায় রেখে কাঠ থেকে প্রাপ্ত নকল রেশমের সূতায় নানারকম পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরি হয়ে থাকে।

প্রভাতকুমার দত্ত

# যাযাবর পাখী

শীতের আমেজ পড়তে না পড়তেই চঞ্চল হয়ে ওঠে পাখীদের মন। নতুন ঠিকানার খোঁজে এক সঙ্গে এরা নীল আকাশের বুকে ডানা মেলে পাড়ি দেয় উত্তর থেকে দক্ষিণে, পশ্চিম থেকে পূবে। প্রতি বছর এরা একই সময়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমায়। দূর দেশের পর্যটকেরা যেমন এদেশে আসেন দলে দলে, এরাও আসে তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে। এরা যাযাবর পাখী—শীতের অতিথি।

কলিকাতার চিড়িয়াখানায় প্রতি বছর অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে এই সব যাযাবর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জড়ো হয়। এরা সংখ্যায় থাকে প্রায় আট-দশ হাজার। এই পাখীগুলি সাধারণতঃ আসে সাইবেরিয়া, উত্তর প্রদেশ, হিমালয় অঞ্চল ও এশিয়ার পশ্চিম দিক থেকে। এই সময় বাংলা দেশের নদী-নালা, খাল-বিল ও নদীর চড়ায় অসংখ্য পাখী দেখা যায়। কয়েক মাস ধরে মুর্শিদাবাদে পদ্মার চরে, সুন্দরবন এলাকার বন-বাদাড়ে, নদীর পাড়ে ওরা স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলে। প্রাচীন কালে লোকেরা মনে করতো, যাযাবর পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চন্দ্রে চলে যায়, আবার কিছু দিন পরে পৃথিবীতে ফিরে আসে। আবার কেউ কেউ মনে করতো, এরা অন্য দেশে গিয়ে অন্য রূপ ধারণ করে কিছু দিন সেখানে বাস করবার পর পুনরায় পূর্ব রূপ ধারণ করে আপন বাসস্থানে ফিরে যায়।

পারস্য দেশের লোকেরা পাখীদের গমনাগমন দেখে বর্ষপঞ্জী তৈরি করতো, রেড-ইণ্ডিয়ানরা যাযাবর পাখীর আবির্ভাবে নববর্ষ উৎসবে মেতে উঠতো। মিশর দেশে লাল রঙের আইবিস পাখীর আগমনে পূজার উৎসবের ধুম পড়ে যেত। তারা এই পাখীদের আগমন সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করতো। অতীত ইতিহাসের কলম্বাস সমুদ্রযাত্রা করবার সময় দিক ভুল করেছিলেন। উড়ন্ত পাখীদের দেখে তিনি ঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন।

আমাদের দেশে যাযাবর পাখীর সংখ্যা কম। ইউরোপে পাখীরা যখন স্থান ত্যাগ করতে আরম্ভ করে, তখন উড়ন্ত পাখাদের আনাগোনায় আকাশ ঢেকে যায়, দিন-রাত্রি তারা উড়ে চলে—তাদের দেশান্তর যাত্রার সময় নীচে পড়ে থাকে সাগর-প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত। হাজার হাজার মাইল তারা এমনি উড়ে যায়—উড়ে যায় সুমেরু থেকে কুমেরুতে। উদ্দাম গতিতে ওড়বার সময় ঘণ্টায় এদের গতিবেগ হয় ষাট মাইলেরও বেশী এবং তিন হাজার ফুটেরও বেশী উপরে উঠে যায়। আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, তারা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী একই নির্দিষ্ট জায়গায়—

হয়তো বা কোন ঝিল, পুকুর, বাড়ী বা অন্য কোন জায়গায় বছরের পর বছর এসে উপস্থিত হয়। ছোট্ট একটা তিন মাসের বাচ্চারও এই একই কাজ—এতটুকুও ভুল হয় না।

বিজ্ঞানীরা বলেন, পাখীদের দিগনির্ণয় করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। ওড়বার সময় পাখীরা কোন নিশানার উপর নির্ভর না করে নিজেদের ওড়বার পথটা বুঝে নিতে পারে। হয়তো সূর্যের তাপ এবং স্থান পরিবর্তন সম্বন্ধে পাখীদের একটা জন্মগত সংস্কার আছে। এই ভাবে উড়ে এসে যখন গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন তারা গাছ, বাড়ী, ঝিল, দেখে তা চিনে নিতে পারে।

তাদের আর একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য হলো—সময়-জ্ঞান। তাদের সঠিক সময় জ্ঞান দেখে অতীতে অনেক দেশ তাদের বর্ষপঞ্জী তৈরি করতো। বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের সময়-জ্ঞানকে চার ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) দৈনিক, (২) চন্দ্রভিত্তিক, (৩) ঋতুগত, (৪) চক্র-অনুসারিক। এদের মধ্যে পাখীদের আবির্ভাব ঋতুগত। সহজাত অনুভূতি-শক্তি প্রবল হওয়ায় তারা ঋতুর পরিবর্তন সহজেই বুঝতে পারে। গ্রীষ্মের পর শীত আসছে, বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব, বায়ুর আর্দ্রতা কম, সূর্যের তেজ কম, গাছের পাতা ঝরছে—এই সব দেখেই পাখীরা দেশান্তর-যাত্রার সময় বুঝতে পারে।

আবার নিজ বাসস্থানে ফিরে যাবার সময়ও পাখী এভাবেই বুঝতে পারে। গাছের নতুন সবুজ পাতা, বাতাসের দিক পরিবর্তন, সূর্যের তেজ, সূর্যের পূর্ব দিকে ঘুরে যাওয়া প্রভৃতি দেখে বা অনুভব করে নিজ বাসস্থানে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান, পাখীরা সময়-সচেতন বলে সূর্যের অবস্থান-বৈশিষ্ট্যের জন্যে সহজেই প্রত্যাবর্তনের কাল নির্ধারণ করতে পারে।

শ্রীআশীষ রায়চৌধুরী

# মডেল প্রতিযোগিতা

ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানে উৎসাহিত করবার জন্যে, বিশেষতঃ কারিগরীবিদ্যায় তাদের উদ্ভাবন-ক্ষমতার উন্মেষের জন্যে তাদের দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ক মডেল তৈরির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সেই জন্যে এই বছর মার্চ মাসে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক মডেল তৈরির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়বস্তুর উপর পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করতে বলা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় ৩২টি মডেল এসেছিল এবং ১৮টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীগণ এতে অংশ নিয়েছিল। বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। আসানসোল, বোলপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। মডেলগুলি সাধারণ দর্শকদেরও দেখানো হয়েছে। মডেলের বিষয়বস্তু ও ক্রিয়া-কৌশল প্রতিযোগীরাই পরীক্ষক ও দর্শকদের নিকট ব্যাখ্যা করে বোঝায়। মডেলের মৌলিকত্ব, গঠন-কৌশলের উৎকর্ষ, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ণীত হয়েছে।

মডেল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে :—

১। শ্রীপূর্ণেন্দু সরকার (গোবরডাঙ্গা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়), মডেলের নাম—এয়ার ইণ্ডিকেটর মেশিন।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে—

২। শ্রীকাবেরী বন্দ্যোপাধ্যায় (বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা), মডেলের নাম—শক্তির উৎস এবং শ্রীমীরা দে (বেথুন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা), মডেলের নাম—আয়তন ও ওজনের ইলিউশন।

তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে—

৩। শ্রীশকুন্তলা মুখোপাধ্যায় (মাল্টিপারপাস গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, আলিপুর), মডেলের নাম—লক ড্রয়ার, শ্রীশুভেন্দু রায় (সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির), মডেলের নাম—স্বয়ংক্রিয় ক্রেন, শ্রীপ্রশান্ত শেঠ (কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর), মডেলের নাম—ঝুলন্ত গাড়ী।

এছাড়াও এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে শ্রীপলাশ পাল (বি. ই. কলেজ মডেল স্কুল, শিবপুর), মডেলের নাম—প্ল্যানেটেরিয়াম, সমীর বর্মণ (সরিষা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ), মডেলের নাম—রকেট গান, শ্রীঅভিজিৎ বসু ( রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, আসানসোল ), মডেলের নাম—মাইক্রো-ওয়েভ লিঙ্ক, শ্রীকল্যাণপ্রভা নন্দী ( মাল্টিপারপাস গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল, আলিপুর ), মডেলের নাম—ম্যাজিক বক্স।

এই প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন অধ্যাপক তপেন রায়, অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায় এবং আলোচ্য বিষয়ের লেখক।

প্রত্যেক পুরস্কার প্রাপকদের বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্বাক্ষরিত মানপত্র দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদে বক্তাদের তৈরী মডেল সম্বন্ধে তাদের সাবলীল ব্যাখ্যা এই প্রতিযোগিতার আকর্ষণ যথেষ্ট বাড়িয়েছিল।

শ্যামসুন্দর দে

# পাইরোসেরাম আবিষ্কারের কাহিনী

কাচের প্লেটের উপর ফটো তোলা যায় কি না, সে সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে আমেরিকার এক বিজ্ঞানী অভিনব এক বস্তু আবিষ্কার করেন, যা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ওই আলোড়ন সৃষ্টিকারী বস্তুটির নাম—পাইরোসেরাম। গল্পটা এই রকম :—

১৯৪৯ সালে আমেরিকার এক গবেষণাগারে বিজ্ঞানী ডাঃ ষ্টুকে কাচের প্লেটের উপর ফটো তোলা যায় কি না, সে সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। সে সময়ে তিনি এই গবেষণার কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। এমনি ব্যস্ততার মধ্যে বিজ্ঞানী ষ্টুকে একদিন তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যান, না গেলে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, তাই যাওয়া নতুবা তিনি যেতেন না। কিন্তু এদিকে ঘটে গেল এক অঘটন। যাবার আগে তিনি কাচ তৈরির যে সমস্ত উপাদান মিশ্রিত অবস্থায় ৬০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে উত্তপ্ত করবার জন্যে গরম চুল্লীর উপর রেখে গিয়েছিলেন, সে কথা তাঁর মনেই ছিল না। সে রাত্রে ফিরতেও বেশ দেরী হয়ে গেল। রাত বেশী হওয়ায় তিনি আর গবেষণাগারে গেলেন না, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে ডাঃ ষ্টুকে গবেষণাগারে গিয়ে দেখলেন, সেই মিশ্রিত উপাদান-গুলি সারারাত্রি ধরে অতিরিক্ত উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে কাচের মত একরকম স্বচ্ছ

বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ডাঃ ষ্টুকে সেই অবস্থা দেখে উত্তেজিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, সামান্য ভুলের জন্যে গেল তো উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে! মূল্যও তো কম নয়! রাগে, দুঃখে, মনস্তাপে তখন তিনি রীতিমত কাঁপছিলেন। তাই তিনি ঐ রূপান্তরিত বস্তুটি হাতে নিয়ে দেখছিলেন—এটা কি হলো? এমন সময় হঠাৎ সেই জিনিষটা হাত থেকে ফস্‌কে মেঝেতে পড়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য! জিনিষটি পড়ে গিয়েই খানিকটা লাফিয়ে উঠে আবার স্থির হয়ে র'লো। ভূত দেখবার মত আঁৎকে ওঠলেন বিজ্ঞানী। এও কি সম্ভব! স্বভাবতঃই কৌতুহল বেড়ে গেল ষ্টুকের। তিনি ঐ বস্তুটিকে পুনরায় হাতে তুলে নিয়ে উঁচু থেকে সজোরে নিক্ষেপ করলেন মেঝের উপর। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, আকার-আয়তনে এবারও জিনিষটির কোন ক্ষতি বা পরিবর্তন হলো না। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না—অস্থির হয়ে উঠলেন এবং সেই জিনিটির উপর ক্রমাগত চালালেন হাতুড়ির ঘা। এতেও যখন বস্তুটির কোন পরিবর্তন হলো না, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠলেন। সে আনন্দ নতুন কিছু আবিষ্কারের আনন্দ। এমনি আকস্মিকভাবে নতুন এক আশ্চর্য বস্তু—যা লোহার চেয়ে শক্ত, অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে হাল্‌কা, কাচের মত স্বচ্ছ, ইস্পাত-গলানো তীব্র উত্তাপ যাকে গলাতে পারে না, অম্ল বা ক্ষার জাতীয় পদার্থও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না, এই পদার্থটি প্রতি ১৬'৩৬ বর্গসেন্টিমিটার স্থানে চাপ সহ্য করতে পারে ১৮১৪৪ কিলোগ্র্যাম। কাচের সমজাতীয় এই অত্যাশ্চর্য বস্তুটির নাম দিলেন তিনি পাইরোসেরাম।

পাইরোসেরাম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ ষ্টুকের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা ও বিমান বাহিনী তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে ফেললো। উচ্চচাপ ও তাপবাহী স্বচ্ছ জিনিষের অভাবে যে শিল্প এতদিন গড়ে উঠতে পারে নি, এই অত্যাশ্চর্য পদার্থ পাইরোসেরাম সেই সম্ভাবনার পথ খুলে দিল।

সুনীল সরকার

# প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। ভেষজ হিসাবে মধুর ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

দীপা ঘোষ দস্তিদার,
চন্দনা সেন, নবরূপা দে
ডায়মণ্ডহারবার

প্রশ্ন ২। মেদ বৃদ্ধির কারণ কি? এর প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সমীরকুমার নিয়োগী ও পার্থসারথী নিয়োগী
কলিকাতা-২৪

উঃ ১। মধু যে শুধু মিষ্টি তাই নয়—এর ভেষজ গুণ এবং জীবাণুনাশক শক্তিও অসাধারণ। এর উৎস হচ্ছে, ফুল ও গাছ-গাছড়ার ভেষজ গুণ এবং মৌমাছির মুখনিঃসৃত লালা। বিভিন্ন রোগবীজাণু—যেমন টিটেনাস ব্যাসিলাস, বিভিন্ন ছত্রাক, ষ্টেপ্‌টোকক্কাস প্রভৃতি মধুর সংস্পর্শে বিনষ্ট হয়। পুরাতন ক্ষত অথবা ফোড়ায় মধুর প্রলেপ দিলে দূষিত হবার ভয় থাকে না। বিভিন্ন ফুলের মধু বিভিন্ন রকম এবং এদের রোগ প্রতিষেধক গুণও পৃথক। কিন্তু মৌমাছিরা বিভিন্ন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে বলে মৌচাক থেকে আমরা যে মধু পাই, সেটা সাধারণতঃ পাঁচমিশালী হয়ে থাকে।

ফুসফুসে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত রোগীদের নিয়মিত মধু খাওয়াবার ফলে দেখা যায়, তাদের কাশি ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং রোগীর ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকস্থলীর ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রিক আলসারের রোগীকে নিয়মিত মধু খাইয়ে পেটের যন্ত্রণা, বুকজ্বালা ও বমির ভাব একেবারে দূর করা যায়। হাজার বছরের প্রাচীন মিশরের একটি পিরামিড থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কিছু মধু বের করেন। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সুদীর্ঘ সময় পরেও এই মধু খাদ্য হিসাবে পুরাপুরি উপযুক্ত রয়েছে, অসাধারণ জীবাণুনাশক শক্তির জন্যে এই মধু কিছুমাত্র বিকৃত হয় নি।

বর্তমানে মধু উৎপাদনের জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু মৌমাছি-পালন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

উঃ ২। প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে শরীরে মেদ বৃদ্ধি ঘটে থাকে। এই সব কারণগুলির মধ্যে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ, অলসতা অথবা শারীরিক গ্রন্থিসমূহের অস্বাভাবিকতাই প্রধান। আমাদের শরীরে থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ হ্রাস পেলে

শরীরের দহন-ক্রিয়া হ্রাস পায় এবং দেহে সঞ্চয়ের সব কিছু ক্রমাগত জমা হয়ে শরীরকে মেদবহুল করে তোলে। অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত ইনসুলিন অতিরিক্ত ক্ষুধার উদ্রেক করে এবং তার ফলে অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ দেহকে স্ফীত করে তোলে। মেদবৃদ্ধি অনেক সময় বংশানুক্রমিক রোগ হিসাবে প্রকাশ পায়। মেদবৃদ্ধির ফলে কর্মকুশলতা হ্রাস পায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহ থেকে প্রচুর ঘাম নির্গত হয়। স্থূলকায় ব্যক্তি সহজেই নানারকম রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। দেহে অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি অসুস্থতার কারণ হলেও মেদশূন্য দেহ ভাল নয়। মেদ শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, উপবাসের সময় মেদ দেহকে শক্তিদান করে এবং দেহের তাপ সংরক্ষণ করে।

স্থূলতা কমাবার জন্যে বাজারে যে সমস্ত ওষুধ পাওয়া যায়, সেগুলি প্রধানতঃ থাইরয়েডের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে, যার ফলে শরীরের দহন-ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় ও মেদ-বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত ওষুধ সাময়িকভাবে ফলপ্রসূ হলেও এগুলির অতিরিক্ত ব্যবহার শরীরের ক্ষতিসাধন করে। নিয়মিত ব্যায়াম, পেশী সঞ্চালন, ভ্রমণ, সাঁতার কাটা ও কর্মবৃদ্ধিতে দেহের স্থূলতা হ্রাস পায়। দেহের মেদ অপসারণের জন্যে খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। কিন্তু খাদ্যতালিকা প্রস্তুতিতে কয়েকটি বিশেষ ব্যাপারে নজর রাখা দরকার। খাদ্যদ্রব্যের ক্যালোরি ভ্যালিউ অপেক্ষাকৃত কম হওয়া প্রয়োজন। টাট্কা ফল, মাঠাতোলা দুধ, সব্জি, মাংস ইত্যাদি খাদ্যতালিকাভুক্ত করা দরকার। ঘি, মাখন, মিষ্টি ও শর্করা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য মেদবৃদ্ধির সহায়ক।

শ্যামসুন্দর দে

## এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা


১। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
'স্বস্তিক'
৫০।১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

২। সমরেন্দ্রনাথ সেন
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি
কাল্টিভেসন অব সায়েন্স
যাদবপুর
কলিকাতা-৩২

৩। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

৪। শ্রীনির্মলেন্দুনাথ রায়
( রসায়ন বিভাগ )
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সি. এম. পি. ও
১, গার্ষ্টিন প্লেস
কলিকাতা-১

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

শিশির নিয়োগী
রেন্ট্যাল হাউসিং
ব্লক-জে ফ্ল্যাট-২
৩৭, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৩৭

৮। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

৯। দীপ্তিময় দে
১৪।৩, নারায়ণ রায় রোড
কলিকাতা-৯

১০। বিমান বসু
7, U. F. College Road
New Delhi-1

১১। আশীষ রায়চৌধুরী
১৫-এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬

১২। প্রভাতকুমার দত্ত
৩৬ বি, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫

১৩। সুনীল সরকার
B. P. C. Technical School
P. O. Krishnagar
Dist. Nadia

১৪। শ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯


---


সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাবিংশ বর্ষ | জুন, ১৯৬৯ | ষষ্ঠ সংখ্যা

## ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার নোবেল পুরস্কার লাভ ও প্রাণ-বিজ্ঞানের অগ্রগতি

রামনারায়ণ চক্রবর্তী

১৯৬৮ সালের শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন তিন জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারত-সন্তান ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানা। ইনি বর্তমানে আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনষ্টিটিউট অব এনজাইম রিসার্চের প্রাণ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে কাজ করছেন। এছাড়া যে দু-জন ঐ পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন আমেরিকার সল্ক্ ইনষ্টিটিউটের ডাঃ রবার্ট ডাব্‌লিউ. হলি ও ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেল্‌থ-এর ডাঃ মার্শাল ডাব্‌লিউ. নীরেনবার্গ। এঁরা বংশগত গুণাগুণের সঙ্কেত বা জেনেটিক কোড সম্বন্ধে পৃথকভাবে গবেষণা করে যে সব মূল্যবান তথ্য আহরণ করেছেন, তার জন্যেই এই পুরস্কার।

মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের ডাঃ খোরানা লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪৫ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করবার পর ইনি ইংল্যাণ্ডে যান। এখানে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে চুল ও দেহের ত্বকের রং মেলানিন সম্পর্কে রাসায়নিক গবেষণা করেন। এখানে ১৯৪৮ সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের পর ইনি কিছুকাল সুইজারল্যাণ্ডে অধ্যাপক ভি. প্রেলোগের কাছে এরিথ্রিনিয়া অ্যাবিসিনিকার অ্যালকালয়েড সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫২ সালে ডাঃ খোরানা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গ্যানিক বা কার্বনিক রসায়নের অধ্যাপক লর্ড আলেকজাণ্ডার টডের কাছে গবেষণা করেন। এখানেই প্রথম তিনি

নিউক্লিওটাইড রসায়নের কাজে হাত দেন এবং এখানেই তিনি এই বিষয়ে গবেষণার কাজে আকৃষ্ট হন ও বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৫৭ সালে লর্ড টড নিউক্লিওটাইড রসায়নে তাঁর অবদানের জন্যে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কেম্ব্রিজে কাজের সময় ডাঃ খোরানা নিউক্লিওটাইড রসায়নের বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষকদের ফলাফল সম্বন্ধে কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন।

এরপর ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ডাঃ খোরানা ক্যানাডায় ভ্যাঙ্কুবারে বৃটিশ কলাম্বিয়া রিসার্চ কাউন্সিলের অধীনে একটি অর্গ্যানিক বা কার্বনিক রাসায়নিক দলের অধিনায়ক হিসাবে গবেষণা করেন। এখানে তিনি নিউক্লিওটাইড জাতীয় বহু জৈব রাসায়নিক পদার্থের কৃত্রিম রাসায়নিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা করে বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানে সুদীর্ঘ সাত বছরের শেষের দিকে তিনি কো-এনজাইম-এ কৃত্রিম কার্বনিক রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করে বিশেষ খ্যাতত্ব অর্জন করেন। কো-এনজাইম-এ জীবন পরিচালনার কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এর কৃত্রিম প্রস্তুতির বিষয়ে চেষ্টা করেছেন।

ডাঃ খোরানা আমেরিকায় মেডিসনে উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব এনজাইম রিসার্চে লাইফ সায়েন্স বা প্রাণ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন ১৯৬০ সালে এবং এপর্যন্ত তিনি ঐখানেই গবেষণা করছেন। ঐখানে তিনি কৃত্রিম কার্বনিক রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি-এন-এ ও রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর-এন-এ পলিমারগুলির মত কিন্তু ছোট ছোট পলিমার কৃত্রিম কার্বনিক রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করেন ও তাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এভাবে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর-এন-এ-র শৃঙ্খল বা চেনের মত লম্বা অণুর দিকে লক্ষ্য করলে চারটি কার্বনিক ক্ষার বা বেসকে বারংবার দেখা যায়। এই চারটি বেস হচ্ছে অ্যাডিনিন (অ্যা), সাইটোসিন (সা), গুয়ানিন (গু) ও ইউরাসিল (ইউ)। ঐ আর-এন-এ অণুতে পর পর সাজানো তিনটি করে বেস বা বেসত্রয়ী একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডকে প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতির কাজে নির্দেশ দেয়। এই প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতি প্রাণ বা জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ। উপরিউক্ত চারিটি বিভিন্ন বেস-এর মধ্যে তিনটিকে বিভিন্নভাবে সাজাবার মোট উপায়ের সংখ্যা হচ্ছে চব্বিশ। কিন্তু যদি এক-একটি বেসকে একের অধিক বার নেওয়া যায়, তাহলে মোট উপায়ের সংখ্যা হয় চৌষট্টি। আর এদিকে প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতির কাজে লাগে মোট কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড। এথেকে বোঝা যায় যে, একাধিক বেসত্রয়ী একই অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিনে যুক্ত করবার কাজে লাগতে পারে। এই কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির নাম নীচে দেওয়া হলো।

১। ফিনাইল অ্যালেনিন
২। লিউসিন
৩। আইসোলিউসিন
৪। মেথিয়োনিন
৫। ভেলিন
৬। সেরিন
৭। প্রোলিন
৮। থ্রিওনিন
৯। অ্যালেনিন
১০। টাইরোসিন
১১। হিষ্টিডিন
১২। গ্লুটামিন
১৩। অ্যাসপেরাজিন

১৪। লাইসিন
১৫। অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড
১৬। গ্লুটামিক অ্যাসিড
১৭। সিষ্টাইন
১৮। ট্রিপ্টোফেন
১৯। আর্জিনিন
২০। গ্লাইসিন

আর-এন-এর লম্বা শৃঙ্খলের কোন্ কোন্ বেসত্রয়ী প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতির সময়ে কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিডকে যুক্ত হতে নির্দেশ দেয়, তা নিয়ে প্রদত্ত বংশগত গুণাগুণের সঙ্কেত বা জেনেটিক কোডের নক্সা থেকে বুঝতে পারা যায়।

এককোষী জীবাণু ই-কোলাই-এর বিষয় ভিত্তি করে নীরেনবার্গ তাঁর বংশগত গুণাগুণ নির্দেশক বা 'কোডন এসাইনমেন্ট'-এর চিত্র গঠন করেন। এর জ্বলন্ত প্রমাণ জোগাড় করেছেন ডাঃ খোরানা ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ। এর জন্যে তাঁদের দিনের পর দিন বিভিন্ন বেসত্রয়ীযুক্ত আর-এন-এ-র অনুরূপ অণু কৃত্রিম কার্বনিক রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করতে হয়েছে ও তাদের প্রোটিনের পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খলে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্ত করবার গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করতে হয়েছে। এই বিষয়ে ডাঃ খোরানা এমনই সুষ্ঠু পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখেন নি।

বেসত্রয়ীগুলি এই জেনেটিক কোডের নক্সায় বেসের আদ্যাক্ষর দিয়ে সাজানো হয়েছে। কোডন 'ইউ ইউ ইউ' অর্থাৎ পর পর তিনটি ইউরাসিল আর-এন-এ-র অণুতে থাকলে বোঝায় যে, ঐ কোডন প্রোটিনের পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খলে অ্যামিনো অ্যাসিড বা ( ১ ) ফিনাইল অ্যালেনিন সংযুক্ত করবার নির্দেশ দেয়। সেইরূপ কোডন 'গু অ্যা ইউ' অর্থাৎ পর পর বেসত্রয়ী গুয়ানিন-অ্যাডিনিন-ইউরাসিল আর-এন-এ-র অণুতে থাকলে বোঝায় যে, ঐ কোডন প্রোটিনের পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খলে অ্যামিনো অ্যাসিড ( ১৫ ) বা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড সংযুক্ত করবার নির্দেশ দেয়। কোডন 'ইউ গু অ্যা' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ই-কোলাই জীবাণুর ক্ষেত্রে এই কোডনের নির্দেশ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না ( ননসেন্স কোডন), হয়তো 'ইউ অ্যা অ্যা' ও 'ইউ অ্যা গু'-এর মত কাজ করে। মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সিষ্টাইনের নির্দেশ দেয়। কোডন 'ইউ অ্যা অ্যা' ও 'ইউ অ্যা গু'-এর 'ওকার' ও 'অ্যামবার' চিহ্নিত করা হয়েছে রেলপথের সাঙ্কেতিক আলোর মত। মনে হয়, এদের কাজ প্রোটিনের পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খলকে শেষ করে দেওয়া, যাতে আর কোন অ্যামিনো অ্যাসিড এসে ওর সঙ্গে নতুন করে সংযুক্ত হতে না পারে এবং যাতে ঐ প্রোটিনের পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খল জৈব প্রস্তুতির দ্বারা আর লম্বা না হতে পারে। কোডন 'অ্যা ইউ গু' অর্থাৎ বেসত্রয়ী অ্যাডিনিন-ইউরাসিল-গুয়ানিন প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতির সময়ে অ্যামিনো অ্যাসিড (৪) বা মেথিয়োনিনের সংযুক্তির নির্দেশ দেয়। এই কোডন এন-ফর্মাইল মেথিয়োনিন দিয়ে প্রোটিনের লম্বা পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খল আরম্ভ করবারও নির্দেশ দিতে পারে।

ঐ কোডন বেসত্রয়ীগুলি আর-এন-এ-র লম্বা অণুতে একটির পর একটি সাজানো আছে ও ঐ আর-এন-এ-র সাহায্যে প্রোটিনের যে জৈব প্রস্তুতি হয়, তাতে ঐ বেসত্রয়ীগুলি একটির পর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুক্ত করবার নির্দেশ দেয়। টেলিগ্রামের বার্তা যেমন কেবলমাত্র ফুটকি ও দাঁড়ি অর্থাৎ ডট ও ড্যাসের সাহায্যে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে লেখা হয় এবং বিশেষজ্ঞেরা কোড বা সঙ্কেতের নিয়ম জানলে অনায়াসে পড়তে পারেন, সেরূপ আর-এন-এ-র অণুতে বেসত্রয়ীগুলির পর পর সজ্জা-পদ্ধতি দেখে কোন্ অ্যামিনো

| প্রথম অক্ষর | দ্বিতীয় অক্ষর: ইউ = ( ইউরাসিল ) | সা = ( সাইটোসিন ) | অ্যা = ( অ্যাডিনিন ) | গু = ( গুয়ানিন ) | তৃতীয় অক্ষর |
|---|---|---|---|---|---|
| ইউ | ইউ. ইউ. ইউ. } (১) | ইউ. সা. ইউ } (৬) | ইউ. অ্যা. ইউ } (১০) | ইউ. গু. ইউ. } (১৭) | ইউ |
| | ইউ. ইউ. সা. | ইউ. সা. সা | ইউ. অ্যা সা. | ইউ. গু. সা. | সা |
| | ইউ. ইউ. অ্যা. } (২) | ইউ. সা. অ্যা | ইউ. অ্যা. অ্যা. ওকার | ইউ. গু. অ্যা. ? | অ্যা |
| | ইউ. ইউ. গু | ইউ. সা. গু | ইউ. অ্যা. গু. অ্যামবার | ইউ. গু. গু. (১৮) | গু |
| সা | সা. ইউ. ইউ. } (২) | সা. সা. ইউ. } (৭) | সা. অ্যা. ইউ } (১১) | সা. গু. ইউ. } ১৯ | ইউ |
| | সা. ইউ. সা. | সা. সা. সা. | সা. অ্যা. সা. | সা. গু. সা. | সা |
| | সা. ইউ. অ্যা. | সা. সা. অ্যা. | সা. অ্যা. অ্যা. } (১২) | সা. গু. অ্যা. | অ্যা |
| | সা. ইউ. গু. | সা. সা. গু. | সা. অ্যা. গু. | সা. গু. গু. | গু |
| অ্যা | অ্যা. ইউ. ইউ. } (৩) | অ্যা. সা. ইউ } (৮) | অ্যা. অ্যা. ইউ. } (১৩) | অ্যা. গু. ইউ. } (৬) | ইউ |
| | অ্যা. ইউ. সা. | অ্যা. সা. সা. | অ্যা. অ্যা সা. | অ্যা. গু. সা. | সা |
| | অ্যা. ইউ, অ্যা. | অ্যা. সা. অ্যা | অ্যা. অ্যা. অ্যা. } (১৪) | অ্যা. গু. অ্যা. } (১৯) | অ্যা |
| | অ্যা. ইউ. গু. (৪) | অ্যা. সা. গু | অ্যা. অ্যা. গু | অ্যা. গু. গু. | গু |
| গু | গু. ইউ. ইউ. } (৫) | গু. সা. ইউ } (৯) | গু. অ্যা. ইউ. } (১৫) | গু. গু. ইউ. } (২০) | ইউ |
| | গু. ইউ, সা. | গু. সা. সা. | গু. অ্যা. সা. | গু. গু. সা. | সা |
| | গু. ইউ. অ্যা | গু. সা অ্যা | গু. অ্যা. অ্যা. } (১৬) | গু. গু. অ্যা. | অ্যা |
| | গু. ইউ. গু | গু. সা. গু. | গু. অ্যা. গু | গু. গু. গু. | গু |

বংশগত গুণাগুণের সঙ্কেত বা জেনেটিক কোডের নক্সা

অ্যাসিডের পর কোন্ অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিনে সংযুক্ত হবে, তা বুঝতে পারা যায়। একে বলা হয় 'ক্র্যাকিং অফ দি জেনেটিক কোড' অর্থাৎ যেন বাদামের শক্ত খোসা ভেঙ্গে ভিতরের সারাংশ বের করা। জেনেটিক কোডের ঐ সাঙ্কেতিক চিত্রকে গানের স্বরলিপির সঙ্গেও তুলনা করা যায়।

একটি সেল বা কোষের মধ্যে নানা ধরণের বিচিত্র জিনিষ আছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলকজার মত, যাদের সাহায্যে ঐ কোষ খাদ্য আহরণ করে, খাদ্য হজম করে, জীবন্ত বা প্রাণবন্ত থাকে, বর্ধিত হয় এবং ক্রমশঃ দুটি অনুরূপ কোষে বিভক্ত হয়। এই কোষের মধ্যে ডি-এন-এ একটি বিশিষ্ট কর্তৃত্বের ভূমিকায় কাজ করে। ডি-এন-এ-র অণুতে চারটি বেস—অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন পুনঃপুনঃ যেভাবে সাজানো থাকে, তার উপরই ঐ কোষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কেন না, ডি-এন-এ-র টেমপ্লেট বা ছাঁচে মেসেঞ্জার বা দূত আর-এন-এ তৈরি হয়, যে আর-এন-এ-র বিষয়ে উপরে লেখা হয়েছে। ডি-এন-এ থেকে দূত আর-এন-এ প্রস্তুতির সময় ডি-এন-এ-র চারটি বেস—অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন দূত আর-এন-এ-তে যথাক্রমে ইউরাসিল, সাইটোসিন, অ্যাডিনিন ও গুয়ানিনে পরিণত হয়। কোষের মধ্যে রিবোসোম নামক একপ্রকার অণু আছে। এর কাজ হচ্ছে দূত আর-এন-এ-র লম্বা অণু ধরে বরাবর যাওয়া ও পর পর ঐ সব কোডন বেসত্রয়ীর নির্দেশ অনুযায়ী একটির পর একটি যথোপযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে কোষের মধ্যে প্রোটিনের জৈব প্রস্তুতি করা।

যখন একটি কোষ বিভক্ত হয়ে দুটি অনুরূপ শিশু কোষে পরিণত হয়, তখন দুটি শিশু কোষেই পূর্বের পিতৃকোষের মত একই রকম ডি-এন-এ থাকে। কেমন করে পিতৃকোষের ডি-এন-এ থেকে একই রকমের দুটি অনুরূপ শিশু কোষের একই রকম ডি-এন-এ প্রস্তুত হয়, সে সম্বন্ধেও ডাঃ খোরানা বিশেষ মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই ভাবে একটি পিতৃ ডি-এন-এ থেকে দুটি অনুরূপ শিশু ডি-এন-এ-র জৈব প্রস্তুতিকে ডি-এন-এ-র রেপ্লিকেশন বলা হয়। পিতৃকোষের ডি-এন-এ ও দুটি শিশু কোষের ডি-এন-এ-র গুণাগুণ সর্বতোভাবে সমান, অর্থাৎ এই ভাবে ঐ পিতৃকোষের গুণাগুণ দুটি শিশু কোষে দেখা যায় এবং এই ভাবেই গুণাগুণ বংশপরম্পরায় একই থেকে যায়। বিভিন্ন জীবের মধ্যে বংশপরম্পরায় যে গুণাগুণ বেশ কিছুটা এক ভাবে থাকতে দেখা যায়, তার মূলেও এই নীতি প্রযোজ্য। ডাঃ খোরানার গবেষণার ফলে ডি-এন-এ-র রেপ্লিকেশন-এর সময়ে যে সব রাসায়নিক ও ভৌত ঘটনা ঘটে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে।

আগেকার দিনে অনেকের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, অজৈব রাসায়নিকগুলি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হলেও অর্গ্যানিক বা কার্বনিক রাসায়নিকগুলির গবেষণাগারে কৃত্রিম প্রস্তুতি সম্ভব নয়। অনেকে এই সব কার্বনিক রাসায়নিকগুলির সঙ্গে প্রাণের সংযোগ আছে বলে মনে করতেন। তাই তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, একমাত্র জীবন্ত কিছু থেকেই এদের প্রস্তুতি সম্ভব এবং এদের কৃত্রিম প্রস্তুতি অসম্ভব। এই বিষয়ে সে যুগের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বার্জিলিয়াসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর 'ভিস ভিটালিস' থিওরি আশাতীতভাবে ধাক্কা খেয়েছিল, যখন ১৮২৮ সালে ভোলার তাঁর গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে অজৈব রাসায়নিকের সাহায্যে ইউরিয়া প্রস্তুত করে কৃত্রিম কার্বনিক রাসায়নিক প্রস্তুতির উদ্বোধন করেন

এরপর ১৮৯৭ সালে বুখনার দেখান যে, পচাই পদ্ধতিতে মদ বা অ্যালকোহল তৈরি করবার সময়ে জীবন্ত বা মৃত ঈষ্ট কোষের বদলে ঐ

ঈষ্ট কোষ থেকে প্রাণহীন ও কোষহীন আরক প্রস্তুত করে তা ব্যবহার করলে একই ভাবে কাজ করে; অর্থাৎ এই পচাই-এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণের কোন প্রয়োজন নেই। এই প্রাণহীন ও কোষহীন পচাই পদ্ধতির জন্যে বুখনার ১৯০৭ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ডাঃ খোরানার গবেষণার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে ভিটালিস থিওরির কোনরূপ নতুন সংস্করণেরও টিকে থাকবার কোনও আশা নেই। প্রাণ-বিজ্ঞানের গবেষকদের মধ্যে এখন একটি বিশেষ প্রচেষ্টা চলবে, কিভাবে গবেষণাগারে কৃত্রিম পদ্ধতির দ্বারা জীবন্ত কোষ প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রাণ-বিজ্ঞানের গবেষকদের জীবনের এক এক অংশ বেছে নিয়ে কাজ করা এখন পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ হবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে তা আশা করা যায়।

ভোলারের ইউরিয়ার কৃত্রিম প্রস্তুতির পর বহু জটিল কার্বনিক রাসায়নিকের কৃত্রিম প্রস্তুতি সম্ভব হয়েছে—এমন কি, কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই বর্তমানে প্রাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় প্রোটিনগুলির কৃত্রিম প্রস্তুতি অসম্ভব নয় এবং এভাবে কৃত্রিম প্রাণের দিকে প্রাণ-বিজ্ঞানের গবেষকদের যথেষ্ট অগ্রগতি সম্ভব।

প্রাণ-বিজ্ঞান ও প্রাণী-বিজ্ঞান বা জীব-বিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে, একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে। প্রাণ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাণ বা জীবন আর প্রাণী-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণী অর্থাৎ গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি, যদিও সাধারণে প্রাণের কথা চিন্তা করলে সাধারণ জীব-জন্তুর কথাই ভেবে থাকেন তথাপি প্রাণ-বিজ্ঞানের গবেষকদের বর্তমান গবেষণা প্রধানতঃ জীবন্ত কোষেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কোষের সহজ সরল জীবন সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান আহরণের পর জীবন্ত কোষের কৃত্রিম প্রস্তুতি হতে পারে। এদিক দিয়ে জীবজন্তুর জীবন যে অনেক জটিল, সে কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রাণ-বিজ্ঞানকে বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবন্ত কোষ-বিজ্ঞান বললেও ভুল হবে না। প্রাণ-বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে গেলে একদিকে যেমন কোষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ জীব-বিজ্ঞানবিদের প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতে সক্ষম সুদক্ষ কার্বনিক রসায়নবিদ্, জৈব রসায়নবিদ ও জৈব-ভৌত রসায়নবিদের। ডাঃ খোরানা তাঁর এই বর্তমান গবেষণায় প্রধানতঃ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতিতে অভিজ্ঞ কার্বনিক রসায়নবিদের মত কাজ করেছেন।

প্রাণের কৃত্রিম প্রস্তুতির পথে এখনও বহু অন্তরায় আছে। সাধারণ বহুকোষী জীবজন্তুর কৃত্রিম প্রস্তুতির অসুবিধা সম্বন্ধে উপরে আলোচনা হয়েছে। প্রথম দিকে এককোষী প্রাণীদের কৃত্রিম প্রস্তুতির কথা চিন্তা করতে হবে। এক-কোষী প্রাণীদের মধ্যে ই-কোলাই জীবাণুর সম্বন্ধেই বিশদভাবে যা কিছু জানা গেছে। তাই কৃত্রিম প্রাণ-প্রস্তুতির বিষয়ে অন্য কিছুর তুলনায় ই-কোলাই-এর দিকে বেশী নজর দেওয়া হবে, আশা করা যায়। এককোষী প্রাণী অপেক্ষা ভাইরাসের সংগঠন অনেক সরল। নিউক্লিও-প্রোটিন দিয়ে ভাইরাসগুলি সংগঠিত, অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিড যেমন ডি-এন-এ বা আর-এন-এ-ও একটি প্রোটিন! ঐ প্রোটিনটি ঐ নিউক্লিক অ্যাসিডের দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। ভাইরাসকে একটি কার্বনিক রাসায়নিক বললেও ভুল হবে না। কার্বনিক রাসায়নিকের মত একে কেলাসিত করা যায়, যেমন—টোবেকো মোজেইক ভাইরাস। এদিক দিয়ে এককোষী প্রাণীর কৃত্রিম প্রস্তুতির তুলনায় ভাইরাসের কৃত্রিম প্রস্তুতি বেশ কিছুটা সহজ হবে বলে আশা করা যায়। তবে ভাইরাসকে জীবন্ত রাখতে হলে জীবন্ত কোষের প্রয়োজন, একথা মনে রাখতে হবে।

তাই ভাইরাসের প্রাণ আছে কি না, সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা স্বাভাবিক।

জেনেটিক কোড বা বংশগত গুণাগুণের সঙ্কেত সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য আহরণের জন্যে আরও অনেক বেশী চেষ্টা চলবে, আশা করা যায়। এর ফলে বহু রকমের দুরারোগ্য রোগ, যেমন—ক্যান্সার, লিউকিমিয়া প্রভৃতি এবং বংশগত রোগ, যেমন—অসাধারণ হিমোগ্লোবিনজনিত রোগ ও কয়েক রকমের মানসিক ব্যাধি প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যেতে পারে।

বারো-তেরো বছর আগে কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে গবেষণার সময়ে আমার এক আমেরিকান সহকর্মী ডাঃ ড্যানিয়েল এল. ক্রেম্যান ঠাট্টার ছলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আমি হাত গণনায় বিশ্বাস করি কিনা। এর উত্তরে আমি বলি যে, বিশ্বাসও করি না আবার অবিশ্বাসও করি না, তবে হাতের রেখার সঙ্গে মানুষের ভবিষ্যতের বেশ কিছুটা সম্বন্ধ আছে, একথা যদি একদিন আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণার তথ্য হিসাবে প্রকাশ করেন, তাহলে আমি আশ্চর্য হবো না। মানুষের হাতের রেখা দেহের ডি-এন-এ-গুলির জন্যে হতে পারে অথবা হাতের বহু কাজের জন্যে হতে পারে। আমার মনে হয় কিছুটা দুই কারণেই হাতের রেখাগুলি হয়ে থাকে। যদি কোন দাগ ডি-এন.-এ-র জন্যে হয়, তাহলে সেই দাগ থেকে ঐ মানুষের ভবিষ্যতের কিছুটা খবর পাওয়া যেতে পারে। এর উত্তরে ডাঃ ক্রেম্যান জিজ্ঞাসা করেন যে, মানুষের দেহের আরও অন্যান্য অংশে যে সব রেখা আছে, তাহলে তাদেরও তো ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর উত্তরে আমি বলি—যে কারণ আমি দেখিয়েছি, সে অনুযায়ী এটাও সম্ভব হতে পারে। আঙুলের ছাপ সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায়, ঐ ছাপগুলি এক এক মানুষের এক এক রকম। এর সঙ্গে ডি-এন-এ-র সম্বন্ধ রয়েছে মনে হয় এবং এই বিষয়ে আমাদের যথাযথ জ্ঞান থাকলে আঙুলের ছাপ থেকে ঐ মানুষের বিষয়ে খবর পাওয়া যেতে পারে। যে কাঠের আঁশ বা সেলুলোজ অণুর লম্বা শৃঙ্খলের গুচ্ছগুলি লম্বা দিকে থাকে, সেই কাঠ লম্বাদিকে সহজেই ফাটে বা ভাঙে। কিন্তু যে কাঠের আঁশ বরাবর লম্বা না থেকে এঁকেবেঁকে থাকে, সেই কাঠ সহজে ফাটে না। আর যখন ফাটে, তখন এঁকেবেঁকে থাকা আঁশের লাইন ধরে ফাটে। ঐ আঁশের সজ্জা-পদ্ধতির জন্যে দায়ী গাছের ডি-এন-এ। হাত গণনাকে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করবার প্রচেষ্টা অনর্থক নাও হতে পারে, বিশেষতঃ যখন বর্তমানে প্রাণ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য যদি কোন দিন ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন হাত গণনার পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন হতে পারে।

# ফসিল

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ফসিল কথাটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদ চঞ্চল প্রাণধারায় স্পন্দিত হয়েছিল, প্রকৃতির কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতিতে সে সব আজ ফসিল বা জীবাশ্মে রূপান্তরিত। এই প্রসঙ্গে হয়তো আর একটি কথা জানা উচিত—প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বা উদ্ভিদের যে ছাপ পাথরের গায়ে রয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে তাকেও বিজ্ঞানের ভাষায় জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) বলে অভিহিত করা হয়। প্যালিওন্টোলজি (Palaeontology) বা জীবাশ্মবিদ্যায় ফসিল সম্বন্ধে সবিশেষ অনুশীলনের ফলেই অতীতের অস্পষ্ট পাতাগুলি আবার যেন সজীব হয়ে ওঠে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর কাছে।

প্রাণী বা উদ্ভিদের ফসিলে পরিণত হবার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দুটি একান্ত প্রয়োজনীয় সর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ, যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদের কঠিন অবয়ব আছে, তাদেরই ফসিলে পরিণত হবার সবিশেষ সম্ভাবনা, কারণ নরম অংশগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় খুব সহজেই বিনষ্ট হয়। হয়তো এই কারণেই জেলি ফিস জাতীয় নরম প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় না। জীবাশ্মীভবন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় সর্তানুযায়ী মাটি বা বালুকা জাতীয় পদার্থের মধ্যে স্তরীভূত হয়ে প্রাণী বা উদ্ভিদকে সংরক্ষিত হতে হবে। নতুবা প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বিক্রিয়ায় ফসিলে পরিণত হবার আগেই মৃতদেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু সমুদ্রের তুলনায় ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগে স্থলজ প্রাণী বা উদ্ভিদের স্তরীভূত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। যদিও জীবাস্থি স্থলভাগের অভ্যন্তরে কখনো কখনো জলবাহিত হয়ে নদী অথবা সমুদ্রের বুকে সংরক্ষিত হতে পারে। স্বভাবতঃই সাগরের বিশাল ব্যাপ্তির ফলে স্থলভাগের প্রাণীর চেয়ে সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিলে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা বেশী।

বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ বা প্রাণীর কঠিন অংশের গঠন ও রাসায়নিক সংযুতির মধ্যে যথেষ্ট অমিল থাকায় প্রকৃতিতে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের ফসিল সমপরিমাণে লক্ষিত হয় না। যেমন—অ্যারগোনানটা (Argonanta) প্রাণীর আবরণ পাত্‌লা ক্ষণভঙ্গুর শেলের তৈরি বলে সেগুলিকে কদাচিৎ ফসিলের আকারে দেখা যায়। আবার অন্য দিকে ঝিনুক, শঙ্খ বা প্রবাল জাতীয় প্রাণীর আবরণ অত্যন্ত কঠিন ও সহনশীল পদার্থে গঠিত বলে সহজেই ফসিল হিসাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাণী বা উদ্ভিদের অবয়বের গঠন ও আকৃতির চেয়ে রাসায়নিক সংযুতির ভূমিকা ফসিল গঠনের ব্যাপারে অধিকতর উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পোকামাকড় জাতীয় প্রাণীর দেহ সাধারণতঃ গরু-মোষের শিঙের চিটিন (Chitin) জাতীয় উপাদানে গঠিত, কিন্তু ডায়াটম (Diatom), রেডিওলেরিয়া (Rediolaria) ও কিছু কিছু স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীর দেহ-গঠনের মুখ্য উপাদান সিলিকা ($SiO_2$), মেরুদণ্ডী প্রাণীদের (যেমন—মানুষ, বানর ইত্যাদি) কঙ্কাল (Skeleton) কার্বনেট (Carbonate) বা ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটের উপাদানে তৈরী,

যদিও প্রবাল বা ঝিনুক জাতীয় প্রাণীদের দেহের উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট ছাড়া কিছুই নয় আর উদ্ভিদ-জগতের অধিকাংশ পদার্থের শক্ত অংশের উপাদান কাঠ আর সোলা (Cork) জাতীয় তন্তু। এই সমস্ত দেহের উপাদানের মধ্যে চিটিনের দ্রাব্যতা অত্যন্ত কম, আর সিলিকা যাবতীয় খনিজ পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী এবং অদ্রাব্য পদার্থগুলির অন্যতম। অবশ্য বিশেষ অবস্থায় ভূগর্ভস্থ খনিজবাহী জলের সংস্পর্শে সিলিকা পুরাপুরি রূপান্তরিত হতে পারে। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের দেহ কার্বনিক অ্যাসিড সমন্বিত জলে অতি সহজেই দ্রবণীয়। অবশ্য দ্রবণের আনুপাতিক মাত্রা নির্ভর করে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কেলাসিত রূপের (অ্যারাগোনাইট—Aragonite বা ক্যালসাইট—Calcite) হের-ফেরের উপর, কারণ অ্যারাগোনাইট ক্যাল-সাইটের তুলনায় অনেক বেশী দ্রবণীয়।

আগেই বলা হয়েছে, ফসিলের গঠন ও প্রকৃতি নির্ভর করে প্রাণী বা উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ সংযুতি ও জীবাশ্মীভবন প্রক্রিয়ার পরিবেশের উপর। অবস্থাভেদের উপর নির্ভর করে ফসিলের আকৃতি, প্রকৃতি ও আয়তন; যেমন—

১। অপরিবর্তিত অবস্থায় জীবাশ্মীভবন:

একথা আগেই বলা হয়েছে, সাধারণ অবস্থায় প্রাণীর কঠিন অংশগুলিই ফসিলে পরিণত হয়, তবু কদাচিৎ বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে মৃত প্রাণী প্রায় অবিকৃত অবস্থায় ফসিলে পরিণত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তর সাইবেরিয়ার প্রচণ্ড শীতে বরফ ও কাদামাটির নীচে চাপা পড়ে একটি রাইনো-সেরাস ও একটি ম্যামথ (হস্তী জাতীয় প্রাণী) প্রায় অবিকৃত অবস্থায় ধীরে ধীরে ফসিলে রূপান্তরিত হয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, ফসিলে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও রাইনোসেরাসটির গায়ের লোমগুলি পর্যন্ত সূর্যের আলোয় চকচক্ করছিল।

২। অপরিবর্তিত অবস্থায় সম্পূর্ণ জীবাস্থির জীবাশ্মীভবন:

কখনো কখনো প্রাণী-দেহের নরম অংশগুলি ছাড়া বাকী কঠিন জীবাস্থি প্রায় সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ফসিলে রূপান্তরিত হতে পারে। ইংল্যাণ্ডে প্লায়োসিন (Pliocene) যুগের পাথর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ফসিল শেল (Shell)। এগুলির সঙ্গে আধুনিক যুগের জীবিত শেলের বিশেষ কোন অমিল নেই, যদিও কেবলমাত্র ফসিল শেলগুলি তুলনামূলকভাবে সামান্য হাল্‌কা, ছিদ্রযুক্ত ও বর্ণহীন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে খনিজ পদার্থের (যেমন ক্যালসিয়াম কার্বনেট) ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে ফসিলগুলি পরিপুষ্ট হয়ে ওজনে সামান্য ভারী আর শক্ত হতে পারে।

৩। কার্বনাইজেসন (Carbonisation) প্রক্রিয়ায় জীবাশ্মীভবন:

কোন কোন জাতের উদ্ভিদ অথবা চিটিনযুক্ত প্রাণী-দেহ (যেমন গ্র্যাপ্টোলাইট) জীবাশ্মী-ভবন প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবয়বে কার্বনের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় ফসিলে রূপান্তরিত হয়। প্রায় একই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ থেকে রূপান্তরিত হয়ে কয়লার উৎপত্তি হয়।

৪। অবয়বের (Skeleton) ছাঁচ:

কখনো কখনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবয়ব প্রাকৃতিক শক্তিগুলির ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে দ্রবী-ভূত বা বিনষ্ট হয়। কেবলমাত্র অবয়বের ছাপ পড়ে মাটি বা পাথরের গায়ে ধীরে ধীরে মৃত প্রাণীটির একটি ছাঁচ গড়ে উঠতে পারে। সাধারণতঃ যদি মৃত প্রাণীটির দেহ অ্যারাগোনাইটে (ক্যালসিয়াম কার্বনেটের এক বিশেষ কেলাসিত অবস্থা) তৈরি হয় ও সচ্ছিদ্র পলিমাটির স্তরে চাপা পড়ে, তবেই মৃত প্রাণীটির (শামুক বা শঙ্খ প্রভৃতি) অবয়বের ছাঁচ পাওয়া অপেক্ষাকৃত

সহজ হয়। এসব ক্ষেত্রে খোলসের অন্তর্ভাগ ধীরে ধীরে পলিমাটি বা আনুষঙ্গিক মৃত্তিকায় ভরাট হতে থাকে, আর ভিতরের নরম দেহাংশ অতি সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ক্রমে কার্বনিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলের ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অ্যারাগোনাইটের শেল দেহটি দ্রবীভূত হয়ে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটের আকারে বেরিয়ে আসে। ফলে মাটি (Clay), শেল (Shale) বা অন্য পাথরের গায়ে খোলসের ভিতর ও বাইরের ছাপ পড়ে প্রাকৃতিক ছাঁচের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির কোলে একদা বিরাজমান প্রাণীটির চিহ্ন থেকে যায়, যার সাহায্যে আজকের বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করতে পেরেছেন হারিয়ে যাওয়া দিনের জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ। জুরাসিক (Jurassic) যুগের শঙ্খ বা ঝিনুক জাতীয় অ্যাপ্টিক্সিয়েলা (Aptyxiella) ও ট্রাইগোনিয়া (Trigonia) ফসিলের হুবহু ছাপ দেখতে পাওয়া গেছে উলাইট (Oolite) নামে এক ধরণের পাললিক শিলার অভ্যন্তরে।

৫। প্রস্তরীভূত (Petrified) জীবাশ্ম :

কোন কোন ফসিলে মূল রাসায়নিক পদার্থটির আমূল রূপান্তর হওয়া সত্ত্বেও আদি অবস্থার সূক্ষ্ম গঠনবৈচিত্র্য হুবহু সংরক্ষিত থাকে ; যেমন—গাছের ফসিলে পূর্বতন প্রাগৈতিহাসিক বৃক্ষটির সূক্ষ্ম দেহকোষ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বৈচিত্র্য জীবন্ত বৃক্ষের মতই স্পষ্ট, যদিও মূল দেহের পদার্থটি সেলুলোজের বদলে সিলিকায় তৈরি। এই মূল পদার্থের রূপান্তর এমন সূক্ষ্ম পর্যায়ে ঘটে যে, একে জীবিত বৃক্ষকাণ্ডের অংশ বলে ভুল করা বিচিত্র নয়। যে সব খনিজ পদার্থ প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহের মূল পদার্থকে রূপান্তরিত করে, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

(ক) ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) স্পঞ্জের সিলিকাকে রূপান্তরিত করে' ক্যালসাইটে পরিণত করে।

(খ) সিলিকা গাছের সেলুলোজকে পরিবর্তিত করে।

(গ) আয়রন সালফাইড (FeS)—অ্যামোনাইট ও গ্র্যাপ্টোলাইটের অবয়বকে রূপান্তরিত করে।

(ঘ) আয়রন অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইড—শেল (Shell) বা বর্মাবৃত প্রাণীর খোলসকে পরিবর্তিত করে।

(ঙ) লাইম, সালফেট, ব্যারাইট, গ্যালিনা, ম্যালাকাইট ইত্যাদি—বিভিন্নভাবে প্রাণীর দেহকে পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত করে।

৬। ফসিল ছাপ (Imprints) :

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর হাত-পায়ের ছাপ অথবা জেলি ফিসের ছাপ কখনো কখনো পাথরের গায়ে লক্ষ্য করা যায়। যদিও এগুলি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর দেহাংশ নয়, তবু জীবাশ্মবিদ্যার ভাষায় এগুলিকে ফসিল আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক দিনের অস্পষ্ট পাতাগুলির পাঠোদ্ধার করবার ব্যাপারে ফসিলের গুরুত্ব অসামান্য। যুগ কাল হিসেবে স্তরীভূত শিলাকে (Stratified rocks) কতকগুলি বিরাট ভাগে ভাগ করা হয়েছে—এক-একটি ভাগের নাম সিষ্টেম (System)। স্তরীভূত শিলার এক-একটি সিষ্টেম কতকগুলি বিশেষ ফসিলের জাতি (Genera) ও প্রজাতির (Species) দ্বারা চিহ্নিত, অর্থাৎ সেই বিশেষ ফসিলের জাতি বা প্রজাতি কেবলমাত্র সেই সিষ্টেমের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে কোন বিশেষ ফসিলের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়ানো পাললিক শিলার মধ্যে অনুবন্ধক (Correlation) ও আনুমানিক বয়স নির্ধারণ সম্ভব।

তাছাড়াও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর খাদ্যাভ্যাস, স্বভাববৈচিত্র্য, বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ

গবেষণার পর প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা ফসিলের সাহায্যে পরোক্ষভাবে পাললিক শিলার গঠনের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর সমুদ্র ও স্থলের সংস্থান, সমুদ্রের গঠন-বৈচিত্র্য, আকার ও গভীরতা ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়ে জীবাশ্মবিদ্যা নানাভাবে সাহায্য করে সন্দেহ নেই। এই বিশেষ বিদ্যার আধুনিক নাম প্রাগৈতিহাসিক ভূগোলবিদ্যা (Palaeogeography)। প্রায় একই ভাবে প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ার (Palaeo-climate) খবর, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী বা উদ্ভিদের গঠন, স্বভাব এবং সমুদ্রজ বা স্থলজ প্রাণীর বিভিন্নতা ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যের সাহায্যে অনুধাবন বা উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব।

প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবাশ্মের গবেষণা থেকে বর্তমান প্রাণী-জগতের বিবর্তনের (Evolution) একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া সম্ভব। পুরাকালের বহু প্রাণী, যেমন—ডাইনোসর, ডাইনোথেরিয়াম বা আরও সব ভয়ঙ্কর প্রাণী ও উদ্ভিদ আজকের দিনে আর দেখা যায় না, যদিও অতীতে এরা হয়তো এক যুগে পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মানবজাতির বিবর্তনের পরিপূর্ণ ইতিহাস আজও মানুষের অজ্ঞাত। এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে উত্তরণের মধ্য দিয়ে তৈরি যে ইতিহাস, তা পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি নির্ভুল এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির অভাবে। এই বিবর্তন-চক্রের মধ্যে অনেকখানি অংশ অধিকার করে রয়েছে অজ্ঞাত প্রাণীর দল, যাদের বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় মিসিং লিঙ্ক (Missing link), অর্থাৎ যাদের সন্ধান আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আশা করা যায়, Palaeontology বা জীবাশ্মবিদ্যার সার্বিক অনুসন্ধান ও অনুধাবনের মধ্য দিয়েই হয়তো একদিন এই ফাঁকগুলি ভরে উঠবে। আর সেদিন সকলের গোচরীভূত হবে মানুষ, তথা সমগ্র প্রাণী-জগতের স্বভাববৈচিত্র্যের পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

# আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে বর্তমান মতবাদ

শ্রীগদাধর মাহাত

মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন চিরদিনই অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে চেয়েছে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাতেই ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলী মানুষের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল। মানুষ তখন তাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজে পায় নি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ধরা দেয় নি মানুষের বুদ্ধির কাছে। তারা বিশ্বাস করেছিল—এই সবের পিছনে আছে এক দৈবশক্তি। অলক্ষ্য থেকে তার আদেশই সমস্ত ঘটনাবলীর কারণ।

সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষের সঙ্গে আলোর পরিচয়। তখন থেকেই আলোর প্রকৃতির বিষয় মানুষ জানতে চেয়েছে। পিথাগোরাসের সময় তিনি বিশ্বাস করতেন—আলো হলো উজ্জ্বল-উৎস থেকে বেরিয়ে আসা তীব্র গতিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণিকা। প্লেটো এবং তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদেরা বিশ্বাস করতেন, আলো হলো আমাদের চোখ থেকে নির্গত এক ধরণের নিঃসরণ। অ্যারিষ্টটল মনে করতেন, আলো একটা অবাস্তব ঘটনা—যা দ্রষ্টব্য বস্তু এবং আমাদের চোখের মধ্যে ঘটছে।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, আলো এক ধরণের

শক্তি। এই শক্তির আদান-প্রদান অর্থাৎ শক্তির প্রবাহই আলোর উৎস এবং আমাদের চোখের মধ্যে ঘটছে। শক্তিকে দু-ভাবে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে—তরঙ্গের সাহায্যে অথবা কোন বস্তুর স্বীয় গতির সাহায্যে। এই ভাবে আলো সম্বন্ধে দুটি পৃথক ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষের মনে সাড়া তুলেছিল। তাদের একটি হলো তরঙ্গতত্ত্ব, (Wave theory) এবং অপরটি হলো কণিকাতত্ত্ব (Corpuscular theory)।

আলোর কণিকাতত্ত্ব—নিউটন তাঁর অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে বিজ্ঞান-জগতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি আলোর কণিকাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং আজীবন আলোর সমস্ত ঘটনাকে কণিকাবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কণিকাবাদ অনুসারে আলো তীব্র গতিসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু-কণিকার সমষ্টি। কণিকাগুলি উৎস থেকে বেরিয়ে সরলরৈখিক পথে ছুটে চলে। তারা যখন আমাদের রেটিনায় এসে ধাক্কা দেয়, তখন আমরা দেখবার অনুভূতি লাভ করি। আলোর বিভিন্ন বর্ণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বস্তুকণিকা-গুলির বিভিন্ন আকার দিয়ে।

নিউটনের কণিকাবাদ তখন বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আলোর সরলরেখায় গমন, প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি ঘটনাবলীকে এই কণিকাবাদ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কিন্তু কণিকাবাদ আলোর কতকগুলি ধর্মকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। যেমন—কণিকাবাদ অনুসারে আলোর গতি লঘুতর বস্তু অপেক্ষা ঘনতর বস্তুতে বেশী—যা পরীক্ষিত সত্যের বিপরীত। একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আলো যখন কোন সরু স্লিট অথবা কোন বস্তুর ধারালো কিনারায় এসে পড়ে, তখন তার সরলরৈখিক গতিপথ থেকে একটু বিচ্যুত হয় অর্থাৎ জ্যামিতিক ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করে। আলোর এই ধর্মকে বলে বক্রমণ বা Diffraction। নিউটনের কণিকা-বাদ আলোর এই ধর্মকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি।

১৮০০ সালে বৈজ্ঞানিক ইয়ং আলোর একটা নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখান যে, কোন কোন সময় আলোর সংযোগ ঘটালে অধিকতর আলোর পরিবর্তে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। ইংরেজীতে এই ধর্মটিকে বলা হয় ইন্টারফিয়ারেন্স। কণিকাবাদের সাহায্যে আলোর এই ধর্মকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। দুটি পদার্থকণিকা কখনো পর-স্পরকে ধ্বংস করতে পারে না। নিউটনের কণিকাবাদ এইরূপ অনেক পরীক্ষিত সত্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি এবং সে জন্যে বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃতি লাভ করে নি।

আলোর তরঙ্গবাদ—১৬৭৮ সালের কাছাকাছি সময়ে হাইগেন্স (Huygens) আলোর তরঙ্গ-বাদ বৈজ্ঞানিক জগতে উপস্থাপিত করেন। তাঁর তরঙ্গবাদ অনুযায়ী আলোর উৎস একটি কল্পিত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শক্তি প্রেরণ করে। এই তরঙ্গসমূহ উৎসকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। হাইগেন্স কল্পিত মাধ্যমটির নাম দিয়েছেন ঈথার (Ether)। এই তরঙ্গ-গুলি যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে, তখন আলোকগ্রাহী স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয় এবং আমরা দেখবার শক্তি লাভ করি। হাইগেন্সের মতে, তরঙ্গপথের বরাবর ঈথার-কণাগুলি কাঁপতে থাকে। এইরূপ তরঙ্গকে Longitudinal তরঙ্গ বলে।

হাইগেন্সের তরঙ্গবাদ সুন্দরভাবে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, আলোকের দ্বিত্ব প্রতিসরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। আমরা জানি, আলোক-তরঙ্গ উৎস থেকে

নির্গত হয়ে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। এই সব বিভিন্নমুখী তরঙ্গসমূহ থেকে কোন একটা বিশেষ দিকে প্রবাহিত তরঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাকে আলোর পোলারিজেসন বা সমবর্তন বলে। হাইগেন্সের তরঙ্গবাদ প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারলেও সমবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। দ্বিতীয়তঃ, হাইগেন্স আলোর সরলরৈখিক গতিকেও ব্যাখ্যা করতে পারেন নি, নিউটনের কণিকাবাদ যাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম

হাইগেন্সের তরঙ্গবাদের এই সব ত্রুটি থাকায় ফ্রেনেল, ইয়ং প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা তরঙ্গবাদের একটু পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁরা বললেন—আলোক-তরঙ্গ হলো ট্রান্সভার্স অর্থাৎ ঈথার-কণিকাগুলি, যেগুলি না থাকলে তরঙ্গ-প্রবাহ ঘটতে পারে না, সেগুলি গতিপথের লম্ব বরাবর কাঁপতে থাকে। ফ্রেনেলের এই তত্ত্ব অতি সহজেই পোলারিজেসন ও অন্যান্য ঘটনাগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু ঈথারের প্রকৃতির রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। ঈথারের প্রকৃতি জানবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা যখন উঠেপড়ে লাগলেন, তখন তরঙ্গবাদ একটা ধাক্কা খেল। শূন্যে আলোর গতিবেগ অত্যন্ত বেশী—সেকেণ্ডে ৩×১০<sup>১০</sup> সেঃ মিঃ অথবা ১৮৬,০০০ মাইল। অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে দেখানো যায় যে,

$$\text{আলোর গতিবেগ} = \sqrt{\frac{E}{P}}$$

E হলো মাধ্যমটির আয়তন-বিকৃতি গুণাঙ্ক (Bulk modulus) এবং P হলো ঘনত্ব (Density)। যেহেতু আলোর গতি অত্যন্ত বেশী, সেহেতু এর আয়তন-বিকৃতি গুণাঙ্ক অত্যন্ত বেশী এবং ঘনত্ব অত্যন্ত কম। বাস্তব জগতে আমরা এমন কোন পদার্থ পাই না, যার প্রকৃতির সঙ্গে ঈথারের প্রকৃতির একটুও মিল আছে।

তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব—ঈথারের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে সব অসুবিধা দেখা দিয়েছিল, ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব সেগুলি সহজেই দূর করে দিল। ফ্রেনেলের সময় পর্যন্ত বিশ্বাস করা হতো যে, আলোর সঙ্গে তড়িৎ অথবা চুম্বকের কোন সম্পর্ক নেই। ১৮৭৩ সালে ম্যাক্সওয়েল দেখালেন যে, তড়িচ্চুম্বকীয় একক এবং স্থিরতড়িৎনির্ভর এককের অনুপাত আলোর গতিবেগের সমান। ম্যাক্সওয়েলের মতে, আলো এক প্রকার তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রবাহ। দুটি পারস্পরিক লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তড়িৎ ক্ষেত্রের পরিবর্তনের জন্যেই এই তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।

১৮৮৮ সালে হেনরিক হার্জ পরীক্ষার সাহায্যে এই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপন্ন করেন এবং আলোর তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ মতবাদকে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে একটা বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আরও দেখালেন যে, এই তরঙ্গগুলিকে প্রতিফলিত, প্রতিসরিত করা যেতে পারে। এক কথায় এই তরঙ্গগুলি আলোর অধিকাংশ ধর্মই মেনে চলে। আরও দেখা গেল, শূন্য স্থানে এই তরঙ্গগুলির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। ফ্রেনেলের ধারণার সঙ্গে ম্যাক্সওয়েলের ধারণার প্রাথমিক পার্থক্য হলো এই যে, ম্যাক্সওয়েল বলবিদ্যাভিত্তিক ধারণার পরিবর্তে তড়িচ্চুম্বকীয় ধারণার প্রবর্তন করলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোর সঙ্গে আলোর ক্রিয়াগুলি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, যেমন—বক্রমণ (Diffraction), ইন্টারফিয়ারেন্স (Interference) ইত্যাদি, ততক্ষণ পর্যন্ত তরঙ্গবাদ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় নি। কিন্তু আলোর সঙ্গে পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়াজনিত ধর্মগুলিকে তরঙ্গবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তরঙ্গবাদ একটা ধাক্কা খেল। অনেক সময় তরঙ্গবাদ এমন ফল এনে হাজির করলো,

যার সঙ্গে পরীক্ষিত সত্যের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে কালো বস্তু[১] (Black body) বিকিরিত বর্ণালীর মধ্যে শক্তির বন্টন কিভাবে হয়েছে, এই সমস্যাই প্রথম তরঙ্গবাদের উপর আঘাত হানলো।

র‍্যালে (Rayleigh) ও জীন্স (Jeans) তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে উক্ত সমস্যাটিকে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই তরঙ্গবাদের সাহায্যে তাঁরা যে ফল পেয়েছিলেন, তা বৃহৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হচ্ছিলো, কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গের সময় সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) প্রবর্তিত ফোটনবাদ বা কণিকাবাদই এই সমস্যাটিকে সুন্দরভাবে ব্যাখা করতে সক্ষম হলো।

তরঙ্গবাদ আরও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হলো। দেখা যায় যে, এমন কতকগুলি ধাতু আছে, যাদের উপর আলোক-রশ্মি এসে পড়লে তারা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়। এই সন্মুক্ত ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ আলোক-রশ্মির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আলোক-রশ্মির কম্পনাঙ্কের উপর। এইভাবে আলোক-রশ্মির সাহায্যে কোন বস্তুর উপরিতল থেকে ইলেকট্রনের নির্গমনকে ফোটো ইলেকট্রিক এফেক্ট (Photoelectric effect) বলা হয়।

তরঙ্গবাদের সাহায্যে এই তথ্যটিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সমস্যাটি সমাধান করবার জন্যে আইনষ্টাইন ফোটনবাদ বা কণিকাবাদের সাহায্য নেন এবং যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। ১৯০০ সালের পরে এইরূপ আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে, তরঙ্গবাদ যেগুলির ব্যাখ্যা করতে পারে নি।

ফোটনবাদ, কণিকাবাদ বা কোয়ান্টামবাদ—১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টামবাদের প্রবর্তন করে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। এই তত্ত্ব সত্যিকারের তাপ-বিকিরণ সম্পর্কিত নিয়মটির জন্ম দিল। কোয়ান্টামবাদ আমাদের এতকালের ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করেছে। প্ল্যাঙ্ক বললেন—শক্তির বিকিরণ নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, ঘটে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকণার তরঙ্গায়িত বিচ্ছুরণে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণাগুলিকে বলা হয় কোয়ান্টাম (Quantum) বা ফোটন (Photon)। আলো হলো এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-কণা বা ফোটনের সমষ্টি। যে কোন একটি কোয়ান্টাম তার সমস্ত শক্তি একটা পরমাণু কিংবা অণুকে দিয়ে দিতে পারে। আলোর বিভিন্ন বর্ণের প্রভেদ হলো ফোটনের আকৃতিগত পার্থক্যে। এই মতবাদের সত্যতা নিম্নের পরীক্ষাটির দ্বারা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়। পরীক্ষাটি Photoelectric effect-এর ভিত্তি-নির্ভর ( ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য )।

অতিবেগুনী (Ultraviolet) আলোক-রশ্মি ক প্লেটের উপর এসে পড়ছে। খ প্লেট ক প্লেটের সমান্তরাল। অতএব আমরা দেখলাম যে, আলোর তরঙ্গবাদ প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বক্রমণ (Diffraction), ইন্টারফিয়ারেন্স (Interferece) প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। অন্যদিকে আলোর ফোটনবাদ বা কণিকাবাদ বস্তু ও শক্তি সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনাকে ( ফোটোইলেকট্রিক এফেক্ট, কম্পটন এফেক্ট ) সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে কোন্ মতবাদটা সত্য? তরঙ্গবাদ, না কণিকা-

১। কালো বস্তু (Black body)—আমরা জানি, কোন বস্তুর উপর আলো পড়লে কিছু পরিমাণ প্রতিফলিত, কিছু প্রতিসরিত ও কিছুটা শোষিত হয়। যে পদার্থ আলোর সমস্ত শক্তিটুকু শোষণ করতে পারে, তাকে কালো বস্তু (Black body) বলা হয়।

বাদ? আলো সম্বন্ধে দুটি মতবাদই বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত—তরঙ্গবাদ (Wave theory) ও কণিকাবাদের (Particle theory) মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় Wavicle theory (Wave & Particle)।

আলোক সম্বন্ধে এই আপাতদৃষ্ট দুটি পৃথক ধারণা হাইসেনবার্গ (Heisenberg) ও শ্রোডিংগারের (Schrodinger) একটা মতবাদের দ্বারা দূরীভূত হলো। যে বলবিদ্যার সাহায্যে বিচ্যুতি খুবই কম। এই বলবিদ্যা অনুসারে, প্রত্যেক পদার্থকণিকার সঙ্গে একটা তরঙ্গ-সমষ্টি জড়িত আছে। এই তরঙ্গসমষ্টির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো কণিকাটির ভরবেগের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ স্বাধীন বস্তুকণার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $\lambda = \frac{h}{mv}$। আমেরিকায় ডেভিসন ও জার্মার এবং ইংল্যাণ্ডে জি. পি. টোম্পসন পরীক্ষার সাহায্যে উপরিউক্ত সমীকরণটির সত্যতা যাচাই করেছেন। তাঁরা
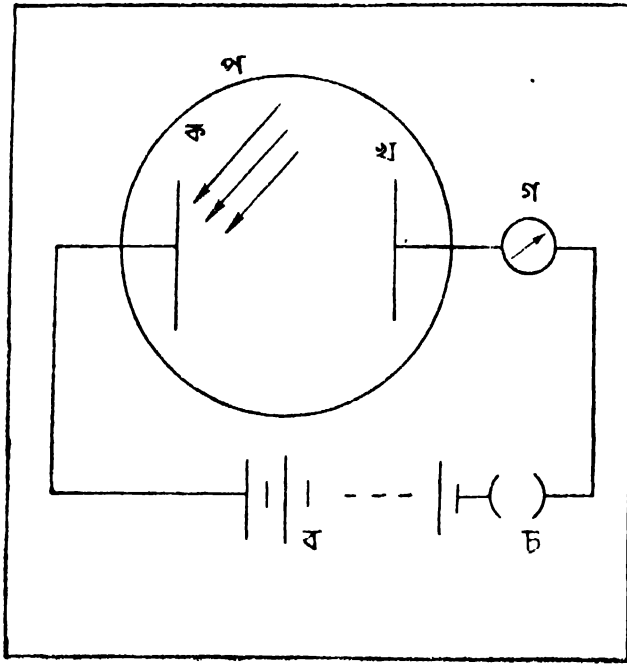
১নং চিত্র

ক, খ → জিঙ্ক প্লেট, গ → গ্যালভানোমিটার, চ → চাবি,
ব → ব্যাটারি, প → বায়ুশূন্য গ্লাসের পাত্র।

তাঁরা এই বৈষম্য দূর করেছেন, তার নাম হলো কোয়ান্টাম মিকানিক্স (Quantum Mechanics) বা ওয়েভ মিকানিক্স (Wave Mechanics) আণবিক বা পারমাণবিক রহস্যের সমাধানে এই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অবদান অপরিহার্য। আপাতঃ বৃহৎ বস্তুর ক্ষেত্রেও এই বলবিদ্যা প্রযোজ্য, কিন্তু সেখানে নিউটনীয় বলবিদ্যা থেকে দেখালেন যে, আলোক-রশ্মির ন্যায় ইলেকট্রনকে বক্রমিত (Diffracted) করা যেতে পারে এবং কিছু দিন পরেই ষ্টার্ন (Stern) অণু ও পরমাণুর বক্রমণের দ্বারা প্রমাণিত করেন।

এই তরঙ্গসমষ্টির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য এই যে, তাদের কোন স্থানের বিস্তারের (Amplitude) বর্গ কণিকাটিকে সেই জায়গায় দেখবার

সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে। অতএব দেখা যাচ্ছে কোয়ান্টামের চেয়ে অধিকতর তড়িৎ-বিভব-সম্পন্ন বর্তনী সম্পূর্ণ করলেই গ-গ্যালভ্যানো-মিটারে একটা তড়িৎ-স্রোতের নির্দেশ পাওয়া যায়। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, ঋণাত্মক তড়িৎ-সম্পন্ন ইলেকট্রন ক-প্লেট থেকে বহির্গত হয়ে খ-প্লেটের দিকে ধাবিত হয়। প্লেট দুটির মধ্যেকার বিভব পার্থক্যের পরিবর্তন করে সহজেই ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায়। দেখা যায় যে, ইলেকট্রনসমূহের গতিবেগ বা গতীয় শক্তি, আলোক-রশ্মির তীব্রতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে আলোচ্য আলোক-রশ্মির কম্পনাঙ্কের উপর। আইনষ্টাইন কোয়ান্টামবাদ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, গতীয় শক্তি=এক ফোটন শক্তি—ইলেকট্রনটিকে প্লেটের গাত্র থেকে মুক্তকরণের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি।

$$(\tfrac{1}{2}\, m\, \nu^2 = h\nu - p)$$

উপরিউক্ত সমীকরণটিকে আইনষ্টাইনের ফোটো-ইলেকট্রিক সমীকরণ বলা হয়।

ফোটনের অস্তিত্বের সব পরীক্ষা কিংবা উপরে বর্ণিত পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, ফোটনগুলির সম্ভাব্য শক্তি তাদের কম্পনাঙ্কের উপর নির্ভর করে। শক্তি ও কম্পনাঙ্কের মধ্যেকার আনুপাতিক ধ্রুবকটি হলো h, প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক =৬.২৫৯×১০<sup>-২৭</sup>। অতএব আমরা একটা পরীক্ষিত সত্য পেলাম—

ফোটন-শক্তি $E = h\nu$, $\nu$ হলো কম্পনাঙ্ক।

এখন ফোটনটির ভরবেগ নির্ণয় করবার জন্যে আইনস্টাইনের শক্তি ও ভর সম্পর্কিত সমীকরণটির বিষয় চিন্তা করা যাক।

$E = mc^2$ ( c=আলোর গতিবেগ, m= বস্তুর ভর )

উপরিউক্ত দুটি সমীকরণ থেকে আমরা সহজেই পাই ভরবেগ অর্থাৎ ভর × বেগ $= \frac{h\nu}{c}$

কম্পটন এফেক্টের ( যখন এক্স-রে কোন একটা বিচ্ছুরিত পদার্থের দ্বারা কোন নির্দিষ্ট কোণে বিচ্ছুরিত হয়, তখন বিচ্ছুরিত এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্ধিত হয়। একে কম্পটন এফেক্ট বলে ) সাহায্যে উপরের সমীকরণটির সত্যতা সহজেই প্রমাণ করা যায়। বলবিদ্যা কণাগুলির সামগ্রিক বা একটা সার্বিক বিস্তৃতি আমাদের কাছে হাজির করে—এর বেশী অভ্যন্তরে আমরা যেতে পারি না।

একটা ফোটনের স্থিতি ও ভরবেগ অর্থাৎ ফোটনটির ধর্ম কতদূর জেনেছি, তার উপর আমাদের কণিকাবাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কোন বস্তুর এই ধর্মগুলি সহজেই নির্ণয় করা যায়। কিন্তু হাইসেনবার্গ ১৯২৭ সালে বললেন—এই ক্ষুদ্র কণাগুলির স্থিতি ও ভরবেগ সম্পূর্ণ যাথার্থ্য ও সঠিকতার সঙ্গে আমরা একই সময়ে জানতে পারি না। এদের একটাকে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করবার জন্যে যদি কোন পরীক্ষা করা যায়, তখন দ্বিতীয়টা হবে অনির্দিষ্ট। একটা পরীক্ষার সাহায্যে আমরা একই সময়ে দুটিই মাপতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভুলতার সঙ্গে নয়। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক

ধরা যাক—একটা ইলেকট্রনের স্থিতি ও ভরবেগ একই সময়ে জানবার জন্যে একটা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় নিয়ে আসা হলো। এর জন্যে নিশ্চয়ই ইলেকট্রনটিকে আলোর দ্বারা দৃশ্যমান করতে হবে। ইলেকট্রনের দ্বারা প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি যখন আমাদের চোখে এসে পড়বে, তখনই আমরা ইলেকট্রনটিকে দেখতে পাব। কিন্তু যেইমাত্র ইলেকট্রনটির উপর আলো ফেলা হবে, তখনই সে একটা ধাক্কা খাবে, কারণ আলোর মধ্যে বেশ কয়েক ফোটন শক্তি রয়েছে। এই ধাক্কার পরিমাণ আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না, কেবল তাদের সম্ভাব্যতা

নির্দেশ করতে পারি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যখনই স্থিতি নির্ণয় করবার জন্যে ইলেকট্রনটির উপর আলো ফেললাম, তখনই তার ভরবেগের একটা রদবদল হয়ে গেল। অবশ্য আমরা ভরবেগকে কিছুটা অনির্দেশ্যতার সঙ্গে জানতে পারি, যদি ইলেকট্রনটির আহরিত ভরবেগ খুব কম হয়। এই ধাক্কাটি যত ছোট হবে, আমাদের ভুলের সীমা ততই কমে যাবে। মনে করা যাক এর জন্যে সবচেয়ে কম শক্তিবিশিষ্ট ফোটনটি বা সবচেয়ে কম ফ্রিকোয়েন্সি বা বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ফোটনটি কাজে লাগালাম। কিন্তু বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করবার ফলে আমাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির নির্ভুলতার সীমা অনেকখানি কমে যায় অর্থাৎ আমরা ইলেকট্রনটিকে ঠিক জায়গায় দেখতে পাই না। মোট কথা, ইলেকট্রনটির স্থিতি যদি নির্ভুলভাবে জানতে চাই, তবে ভরবেগ জানতে পারি না, আবার ভরবেগ যদি নির্ভুলভাবে জানতে চাই, তবে স্থিতি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করিতে পারি না।

হাইসেনবার্গের এই অনির্দেশ্য নীতি সমস্ত ফোটনের ক্ষেত্রে এবং ইলেকট্রন থেকে আরম্ভ করে সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু বৃহৎ পদার্থের ক্ষেত্রে অনির্দেশ্যতার পরিমাণ নিতান্তই কমে যায়

১৯২৮ সালে বোর হাইসেনবার্গের অনির্দেশ্য নীতিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে, আমাদের মাপজোকের নির্ভুলতার সীমা এবং আলোক ও পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেল। বোর বললেন, তরঙ্গবাদ বা কণিকাবাদ, একই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে চিন্তা করবার দুটি পরিপূরক পন্থা। একটি বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে জানতে গেলে আমাদের দুটি মতবাদেরই দরকার। কারণ অনির্দেশ্য নীতি অনুসারে একই পরীক্ষা দ্বারা একই সময়ে একটা বস্তুর সার্বিক পরিচয় আমরা পেতে পারি না। একে বোরের পরিপূরণ নীতি বলে।

অনির্দেশ্য নীতি ও পরিপূরণ নীতির সত্যতা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে কি বলা যায়? আলোর প্রকৃতি জানা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলেও দুরূহ। আলোর সম্বন্ধে সমস্ত খবর আমাদের অপ্রত্যক্ষভাবে নিতে হয়। আমাদের আশৈশব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি "আলো বন্দুক থেকে ছুটন্ত গুলির মত কতকগুলি কণিকার গতি" অথবা "জলের তরঙ্গের মত আলো একপ্রকার তরঙ্গের প্রবাহ"। কিন্তু পরিপূরণ নীতি অনুসারে এইভাবে একটা বিশেষ মতবাদকে গ্রহণ করা যায় না। আমরা বলতে পারি—"এই পরীক্ষায় আলোক যেন কণিকাসমষ্টির মত ব্যবহার করলো" এবং "এই পরীক্ষায় আলো যেন জল-তরঙ্গের মত ব্যবহার করলো।" আলোকের এই দ্বৈত প্রকৃতি কোন পরীক্ষায় আমরা একই সময়ে ধরতে পারি না। কাজেই আমরা বলতে পারি, ফোটন কিংবা তরঙ্গের ধারণা সমানভাবে প্রযোজ্য এবং প্রত্যেকটি ধারণাই নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।

# মূক ও বধিরদের বুদ্ধি কি কম?

### অঞ্জলি চক্রবর্তী

ছাত্রদের পড়াশুনায় দক্ষতা, লেখাপড়ায় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিবেচনা করে শিক্ষক কোন ছাত্রকে খুব বুদ্ধিমান বলেন, আবার কোন ছাত্রকে বলেন তার বুদ্ধি বড় কম। কোন ছাত্র অন্য ছাত্রদের চেয়ে অল্প সময়ে কোন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারে, কোন প্রশ্ন বা জটিল বিষয় অন্যদের চেয়ে তাড়াতাড়ি বুঝতে বা সমাধান করতে পারে—এই সব বিচার করেই শিক্ষক ছাত্রদের বুদ্ধির তারতম্য নির্ণয় করেন। কিন্তু এমনও হতে পারে—কোন ছাত্রের বেশ বুদ্ধি আছে, কিন্তু তার অলস স্বভাবই তার লেখাপড়ায় উন্নতির প্রতিবন্ধক। তবে সাধারণভাবে ছেলেদের নতুন বিষয় শিখবার দক্ষতা, নতুন পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে কাজ করবার ক্ষমতার ইতর-বিশেষ দেখেই তাদের বুদ্ধির তারতম্য স্থির করা হয়।

বুদ্ধির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু গবেষণা এবং আলোচনা হয়েছে। উইলিয়াম জেম্‌স্‌ বলেছেন, যে কাজে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, সে কাজের ভিতর দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে। একটি হলো কোন উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা, অন্যটি সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় নির্বাচন। বিনে (Binet) বুদ্ধি বিশ্লেষণ করে তার তিনটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন—১। বুদ্ধির কাজে বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, ২। বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌঁছাবার বুদ্ধির উপযোগী ক্ষমতা, ৩। আত্মসমালোচনা। এই দুই মতান্তরের ভিতর একটি তত্ত্ব নিহিত আছে এই যে, বুদ্ধির কাজে উদ্দেশ্য থাকবে এবং ইচ্ছানুযায়ী কাজ পরিবর্তনশীল বা নমনীয় হবে (Plasticity of Behaviour)। এই জন্যে বুদ্ধিজাত ক্রিয়া সাহজিক ও প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া থেকে পৃথক—এটা যান্ত্রিক ক্রিয়া নয়। প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া (Reflex) একটি যান্ত্রিক-ক্রিয়া, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়াকে (Instinct) হরমিক মনোবিদ্যায় পুরাপুরি যান্ত্রিক ক্রিয়া বলা যায় না। মানুষ তার বুদ্ধি বা যুক্তির সাহায্যে এর বিবিধ রূপ দিতে পারে।

ছেলেদের মধ্যে দেখা যায়, কেউ কেউ অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন আবার কেউ কেউ বা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন। সাধারণতঃ এও দেখা যায় যে, অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের চেয়ে নানা রকমের বিভিন্ন কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখায় এবং ভালভাবে সেগুলি সম্পন্ন করতেও পারে।

এই কারণে একদল মনোবিদ্ বুদ্ধির বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, বুদ্ধির ভিতর এমন উপদান (Factor) থাকে, যার কম-বেশীর উপর সাধারণতঃ ছেলেদের অল্প বুদ্ধি ও অধিকতর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিবিধ কাজে তাদের দক্ষতার ইতর-বিশেষ দেখা যায়। এই উপাদানকে বুদ্ধির সাধারণ উপাদান বা G factor বলা হয়। বুদ্ধির আর একটি উপাদান থাকে, যাকে বিশেষ উপাদান বা S factor বলে। এইসব মনীষীরা বুদ্ধির কোন সাধারণ সংজ্ঞা না দিয়ে বুদ্ধির উপাদানের সাহায্যে এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এই দলের অগ্রণী হলেন অধ্যাপক স্পিয়ারম্যান।

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, কোন এক বিষয়ে বুদ্ধির প্রাচুর্য ও বিশেষ দক্ষতা থাকলে অপর কোন বিষয়ে সেরূপ পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য থাকা সম্ভব নয়, সেখানে বুদ্ধির

স্বল্পতা ঘটে। এটা যেন এক ক্ষতিপূরণের নীতি। এই ধারণা যে ভুল, স্পিয়ারম্যান তা প্রমাণ করেন এবং তাঁর প্রমাণ পরিসংখ্যান সূত্র অনুসারে নির্ভুল, এটাও নির্ধারিত হয়েছে। বুদ্ধির সাধারণ উপাদান (General factor) এই প্রমাণের হেতু, যার জন্যে তাঁর প্রমাণ গাণিতিক যুক্তির দ্বারা পরিসংখ্যানসম্মত হয়েছে।

স্পিয়ারম্যান বুদ্ধির সাধারণ উপাদানের সাহায্যে বিবিধ মানসিক দক্ষতা বা ব্যুৎপত্তির পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে পরস্পরের মধ্যে একটা সদর্থক পারম্পর্য (Positive corelation) দেখিয়েছেন। দৈহিক শক্তি যেমন দাঁড় টানতে, কুস্তি করতে সক্ষম করে, বিদ্যুৎ যেমন পাখা চালায়, আলো জ্বালায়, যন্ত্র চালায় ও আরও নানারকম কাজ করে, বুদ্ধির এই সাধারণ উপাদানও তেমনি বিভিন্ন মানসিক দক্ষতা লাভে সাহায্য করতে পারে। বুদ্ধিমান ছাত্রেরা যদি অলস না হয়, তবে বিভিন্ন শিক্ষায় নিশ্চয়ই দক্ষতা দেখাতে পারে।

স্পিয়ারম্যানের মতে, বুদ্ধি দুই উপাদানে গঠিত—সাধারণ উপাদান ও বিশেষ উপাদান—G এবং S factor। স্পিয়ারম্যানের এই মতবাদের নাম দ্বি-উপাদান মতবাদ। সে জন্যে বুদ্ধি বলতে শিক্ষালাভের সাধারণ ক্ষমতা এবং কোন কোন বিষয়ে, যেমন—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, দর্শন বা সাহিত্য প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি বোঝায়।

বিনে ও সিমো (Binet, Simon) বয়ঃক্রম অনুসারে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে এই বুদ্ধি পরীক্ষার চেষ্টা করেছেন। যে ছেলে বা মেয়ে তার বয়সের উপযুক্ত আদর্শ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তার বুদ্ধি সাধারণ মানের সমান। যদি সে তার বয়স অপেক্ষা অধিক বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, তাহলে তার বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী। আর যদি সে তার বয়স অপেক্ষা কম বয়সের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়, তাহলে তার বুদ্ধি কম বলা হয়। একটি ৮ বছরের ছেলে যদি ৬ বছরের ছেলের উপযুক্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়, কিন্তু তার বেশী বয়সের নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারে, তাহলে তার প্রকৃত বয়স ৮ হলেও তার মানসিক বয়স (Mental age) ৬ ধরা হয়।

এই পদ্ধতিতে ৬ বছরের বালকের মানসিক বয়স ৮ হতে পারে। এইভাবে ছেলেদের মানসিক বয়স স্থির করে এক সূত্র অনুসারে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient বা I. Q.) নির্ণয় করা হয়। এই বুদ্ধ্যঙ্কই তাদের বুদ্ধির পরিমাণের নির্দেশক। ব্যালার্ড বলেন, এই বুদ্ধির বিকাশ প্রথমে খুব দ্রুত হয়, কিন্তু ১২ বছর বয়স থেকেই তার দ্রুততা কমতে থাকে এবং ১৬ বছরের পর আর এই বুদ্ধি বাড়ে না। এই মত অনুসারে বয়স্কদের সাধারণ বুদ্ধি এই প্রথায় পরিমাপ করলে দেখা যায় যে, ১৬ বছরের ছেলের বুদ্ধির চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু টমসন এই বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত করে এক আলোচনায় বলেছেন যে, প্রশ্ন রচনা ও তার জটিলতা যদি যথোচিত হয়, তবে পরিণত বয়স্কদের বুদ্ধির বৃদ্ধি ১৬ বছরের বালকদের চেয়ে বেশী দেখা যাবে।

মূক ও বধিরদের বুদ্ধি অন্যান্য স্বাভাবিক ছেলেদের মত একই প্রকার, না তাদের মধ্যে বুদ্ধির কম-বেশী বৈষম্য আছে? এটা নতুন প্রশ্ন নয়—তবে বিনের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হলে লোকের মনে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার আশা হয়েছিল। কিন্তু এই আশা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। পিন্টনার থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সকলের পরীক্ষায় পরস্পর বিরোধী ফল পাওয়া গেছে। বধিরদের বুদ্ধি কম—এরূপ মত অনেক মনোবিদ্ বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, যারা কানে শুনতে পায় আর

যারা বধির, তাদের ক্ষেত্রে একই রকমের পরীক্ষার বিষয়বস্তু প্রয়োগ করা অসঙ্গত। তাঁরা বলেন, বধিরদের শিক্ষা তাদের পরিবেশ, তাদের পক্ষে পরীক্ষকের উপদেশ বা নির্দেশ বুঝবার ক্ষমতা সাধারণ বালক-বালিকার মত নয়। সে জন্যে সাধারণ বালক-বালিকাদের পরীক্ষার বিষয়বস্তু তাদের পক্ষে অনুপযোগী।

সে জন্যে তাঁরা এরূপ পরীক্ষা-পদ্ধতির ফল অগ্রাহ্য করেন। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করলেও এরূপ একই প্রকারের পরীক্ষা পদ্ধতির অসুবিধা ও অনুপযোগিতা বধিরদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে দূর হয় না—এই কথা সত্য হলেও পরীক্ষার ফল অগ্রাহ্য করা তো ব্যাখ্যা নয়—সমস্যা তো থেকেই যায়, আসল প্রশ্নের ঠিক উত্তর হয় না। আবার স্বাভাবিক বালক-বালিকাদের চেয়ে বধিরদের বুদ্ধি কম না বেশী, এই প্রশ্নও যেন মনে হয় ভ্রান্তিমূলক। সব বুদ্ধিই এক রকমের বা জীবনের সফলতা নির্ভর করে কোন একটি বিশেষ মানসিক উপাদানের উপর—এইরূপ অনুমান করাই কি ঠিক? বধিরেরা স্বাভাবিক বালক-বালিকাদের চেয়ে তফাৎ—এটা সত্য। কিন্তু কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যদি তাদের সফলতা কম হয়, তা বলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও নিকৃষ্ট শ্রেণীর—একথা বলাও ঠিক নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে বধিরদের উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করা ক্রমশঃই খুব বেড়ে গেছে। কাজে এরা অন্যমনস্ক কম, এরা গোলমাল করে কম, অনুপস্থিতি এদের কম, এরা বিশ্বাস-যোগ্য ও দক্ষ কর্মচারী হয়। মনের কাজ ও দক্ষতা যখন নানা রকমের—তখন বধির ও স্বাভাবিক বালক-বালিকাদের মধ্যে কোথায় তাদের পার্থক্য ও কোথায় সাদৃশ্য এবং তা কি প্রকারের—এরূপ প্রশ্ন হওয়াই দরকার। এই বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলে তাদের শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনারও সুবিধা হয়।

বধিরদের কথা বলার অক্ষমতাই তাদের শিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক। আবার এই অক্ষমতার প্রধান কারণ তাদের বধিরতা। তারা কথা বা শব্দ শুনতে পায় না বলেই কথা বলতে পারে না। এই প্রতিবন্ধক যে পরিমাণে দূর হয়, তাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

বধিরদের শ্রবণশক্তির উন্নতিবিধানের জন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের চেষ্টা ও অবদান যথার্থই প্রশংসনীয়। শ্রবণশক্তি নিরূপণের যন্ত্র (Audiometer) প্রস্তুত হয়েছে। তাছাড়া উচ্চারিত শব্দের শক্তিবর্ধক নানাবিধ যন্ত্র, আবিষ্কৃত হয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের দানে ‘অঙ্গুলি লিপি’ (Finger spelling) প্রচলিত। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা বধিরদের স্পর্শানুভূতির সাহায্যে বার্তা জ্ঞাপনের নানাবিধ চেষ্টা করেছেন, যা দিয়ে শব্দ-তরঙ্গ অস্থি-র ভিতর দিয়ে গুরুমস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে পৌঁছায়। বধিরদের শিক্ষাদান পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র এবং শ্রমসাপেক্ষ। দৃষ্টিশক্তি, আঙুল বা হাতের স্পর্শানুভূতি এবং শ্রবণশক্তি—এই তিনটি অনুভূতির যথাযথ সাহায্য নিলে এদের শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়। ভালভাবে শিক্ষালাভ করলে এরা সাধারণ লোকের মুখের কথা ওষ্ঠ-পাঠের সাহায্যে বুঝতে পারে এবং নিজেদের কথাবার্তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারলে সাধারণ মানুষও এদের কথা বুঝতে পারে। ভাষার সাহায্যে বধিরদের বাক্‌শক্তির উন্নতি করতে পারলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও বর্ধিত হয়। বধিরদের কার্যক্ষম করবার উপযুক্ত শিক্ষার ভার এবং এই বিষয়ে তাদের ন্যায্য দাবী অনেক দেশে সরকারের উপর ন্যস্ত আছে।

বধিরতার কারণ জটিল, তবুও মেণ্ডেল নীতি যেন এখানেও কিছুটা প্রযোজ্য।

> "Blood, though it sleeps a time,
> yet never dies."
> (Chofenan : Widow's tears)

সে জন্যে সুস্থ পিতামাতার ভিতর যা সুপ্ত (Recessive) থাকে, পরের কোন এক পুরুষে তা প্রকাশ পেতেও পারে। পারিবারিক ইতিহাস পাওয়াও কঠিন। বধিরতার অন্যান্য আরও বহুবিধ কারণ আছে।

# যে জল বরফ হয় না

## সমীরকুমার ঘোষ

জলের মত সহজ—একথাটা প্রায়ই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে কোন জিনিসের সারল্য বোঝাতে আমাদের জলের শরণাপন্ন হতে হয়। আবার কোন দুটি জিনিষের অভিন্নতা বা অনন্যতা বোঝাতেও আমরা বলি 'As like as two drops of water'; কারণ দুই ফোঁটা বিশুদ্ধ জলের মধ্যে যে শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যই থাকে তাই নয়, রাসায়নিক সাদৃশ্যও তাদের মধ্যে আশা করা যায়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, এমন এক ধরণের জলও এই পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব, যা সাধারণ জল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এমন কি, সাধারণ জলের মধ্যে সেই জলের ফোঁটাটিকে ফেলে দিলে সেটি সহজেই ডুবে যাবে অথবা শীতলতম কোন মাধ্যমের মধ্যে থাকলেও সেই জল কখনই জমে বরফ হবে না—তাহলে আমাদের মনে বিস্ময় ও অবিশ্বাস উভয়ের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু বিস্ময়ের উদ্রেক যতই হোক না কেন, সত্যই এমন এক ধরণের জল পৃথিবীতে পাওয়া সম্ভব, যা কখনই জমে বরফ হয় না। তাই এই ধরণের জল সম্বন্ধে সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

কি প্রাকৃতিক জগতে, কি বৈজ্ঞানিক কার্যসূচীতে জলের ভূমিকা যে অপরিহার্য, তাতে সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উত্তাপ মাপবার যন্ত্র থার্মোমিটার তৈরি করবার সময় প্রথমে তার স্থিরাঙ্ক নির্ণয় করা হয় এবং তখন জলের প্রাকৃতিক ধর্মের (স্ফুটন ও জমাট বাঁধন) উপরেই নির্ভর করতে হয়। ঠিক একইভাবে জলের অন্যান্য ধর্মের উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞান সম্পর্কিত অন্যান্য অনেক কিছু জিনিষের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এক কথায় বলা যায় যে, জল বা তার ধর্মকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের আলোচনার কথা কল্পনাই করা যায় না। আসলে বিজ্ঞানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক নির্ণয়ের ব্যাপারে বা সংজ্ঞা দেবার কাজে জলের শরণাপন্ন হবার কারণ—প্রথমতঃ, জল খুবই সহজলভ্য এবং দ্বিতীয়তঃ, মোটামুটি একই প্রাকৃতিক পরিবেশে জলের ধর্ম সর্বত্রই সমান।

কিন্তু যে বিশিষ্ট প্রকৃতির জল আমাদের আলোচ্য বিষয়, সেই জল সাধারণ জলের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। কল্পনা করা যায় কি যে কিছু বিশুদ্ধ জল পাওয়া সম্ভব হয়েছে, যার ঘনত্ব সাধারণ জলের চেয়ে দেড়গুণ বেশী, যা চরম ঘনত্ব পায় আমাদের তথাকথিত ধারণা ৪° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের পরিবর্তে -৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে এবং যা আগেই বলেছি, কোন শীতলতম মাধ্যমের মধ্যে রাখলেও কখনও জমে বরফ হবে না? এই ধরণের জলের কথা আজ আর আমাদের কল্পনার বস্তু নয়। ১৯৬১ সালে সোভিয়েট বিজ্ঞানী নিকোলাই ফেডিয়াকিন এই নতুন ধরণের জলের নানারকম বিচিত্র ধর্ম লক্ষ্য করেন। সাধারণ জলের পাতন পরীক্ষা করবার সময় তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, ঐ বিচিত্র ধর্মের কয়েক ফোঁটা জল কাচের তৈরি পরীক্ষা-যন্ত্রের গায়ে জমাট বাঁধে। স্বভাবতঃই এই ভারী কয়েক ফোঁটা জল সম্বন্ধে তিনি প্রথমে অনুমান করেন যে, হয়তো কাঁচের পাত্রের গা থেকে কোন দ্রবণীয় কিছু জিনিষ নিয়ে ঐ জল

ভারী হয়ে থাকবে। এই ধারণা ঠিক কিনা জানবার জন্যে তিনি পরীক্ষার জলটি দুবার পাতন করে বিশুদ্ধ করে নেন, কিন্তু তবুও ঐ ভারী জল কিছু পরিমাণে সব সময়েই পেতে থাকেন। এমন কি, কাচের পাত্রের বদলে কোয়ার্ট্জের পাত্রের মধ্যে পরীক্ষা করেও ঐ ধরণের জল পাওয়ায় তিনি নিশ্চিত হন যে, এই ধরণের বিচিত্র ভারী জলের অস্তিত্ব শুধু কল্পনার ব্যাপার নয়—বাস্তব ঘটনা।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারী জল বলতে আমরা আর এক প্রকার জলের কথাও জানি—যার পরিচয় $D_2O$ হিসাবে; অর্থাৎ জলে হাইড্রোজেনের বদলে যদি ডয়েটেরিয়াম থাকে, তাহলেও জল ভারী হওয়া সম্ভব। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, ফেডিয়াকিনের আবিষ্কার করা এই ভারী জল আর $D_2O$ ভারী জল মোটেই এক নয়। $D_2O$ আবিষ্কার করেন ১৯৩২ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর উরে, যার জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। $D_2O$ সাধারণ জলের চেয়ে শতকরা ১০ গুণ ভারী কিন্তু আমাদের আলোচ্য ফেডিয়াকিনের জল সাধারণ জল অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৪০ গুণ ভারী। যাহোক, ফেডিয়াকিনের এই জলের রাসায়নিক গঠন কিন্তু সাধারণ জলের মতই এক এবং অভিন্ন। এই জলের অণু সাধারণ জলের অণুর মতই। কিন্তু আগেই বলেছি, এই জলের ঘনত্ব শুধু সাধারণ জল কেন, ভারী জল $D_2O$ অপেক্ষাও অনেক বেশী। এর সান্দ্রতা (Viscosity) সাধারণ জলের চেয়ে প্রায় ১৫।২০ গুণ বেশী। -১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেও এই জল সাধারণত: জমে বরফ হয় না, তবে অত ঠাণ্ডাতে এই জল সাধারণত: তার তারল্যভাব (Fluidity) হারিয়ে ফেলে এবং বেশ চক্চকে হয়ে পড়ে। এই জলকে যদি ক্রমশ: গরম করা যায়, তাহলে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি গিয়ে এই বিচিত্র প্রকৃতির জল এবং সাধারণ জলের মধ্যে আর ধর্মগত পার্থক্য বিশেষ দেখা যায় না।

ফেডিয়াকিন এই বৈচিত্র্যময় জলের অস্তিত্ব ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন বিজ্ঞানীমহল থেকে তাঁর এই আবিষ্কার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ফেডিয়াকিনের সেই জলের কোঁটাগুলির আকার এতই ছোট ছিল যে, সকলেই তার বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের দেশেই অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ক্রমশ: অন্য উপায়ে গবেষণার মাধ্যমে ঐ একই ধরণের ভারী জলের অস্তিত্ব পাওয়ায় এই বৈচিত্র্যময় ভারী জলের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—সাধারণ জলের মত রাসায়নিক গঠন এক হওয়া সত্ত্বেও এই জল এত ভারী হবার কারণ কি? একথা সকলেরই জানা যে, জল একটি অসঙ্কোচনীয় (Incompressible) পদার্থ। তবুও উপযুক্ত বলের দ্বারা জলকেও সঙ্কুচিত করা সম্ভব। এক কোঁটা জলের মধ্যে সাধারণত: তার অণুগুলি খুবই শিথিলভাবে পরস্পরের কাছাকাছি বাঁধা থাকে। এখন মনে করা যাক যে, কতকগুলি অণুকে আরো কতকগুলি অণুর কাছাকাছি না রেখে উপর উপর রাখা হলো। তাহলে এই অণুগুলি একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর অণুবিশিষ্ট (Polymerised) হলো। ফেডিয়াকিনের মতে, ঐ বৈচিত্র্যময় জলের তিন-চারটি অণু এভাবে একত্রে যুক্ত হয়ে থাকে। ফলে অণুগুলিকে প্রকাশ করা যায় $(H_2O)_3$ বা $(H_2O)_4$ লিখে। উপর্যুপরি অবস্থিত এই অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে এতই দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধে থাকে যে, সেগুলি সমষ্টিগত ভাবে একক হিসাবে কাজ করে—তিন-চারটি পৃথক জলের অণু হিসাবে নয়। এককোঁটা জলের

ভিতর এরূপ Polymerised জলের অণুর সংখ্যা যতই বেশী হবে, সেই জলের ফোঁটার ঘনত্ব হবে ততই বেশী বা এক কথায় ঐ বিশেষ ধরণের জলের ঘনত্ব খুবই বেশী হবে। এছাড়াও তিন-চারটি সংঘবদ্ধ অণুবিশিষ্ট এই ধরণের বিশেষ শ্রেণীর জলের অতিকায় অণুগুলি আকারে স্বভাবতঃই বেশ বড় হয় এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্য থাকে না। ফলে তাদের সান্দ্রতা বেড়ে যায়।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো এই যে, এই শ্রেণীর জল সহজে জমে বরফ হয় না কেন? এই প্রসঙ্গে প্রথমেই জানা দরকার যে, সাধারণ জল যখন তরল অবস্থায় অথবা কঠিন অবস্থায় থাকে ( বরফের আকারে ), তখন জলের প্রতিটি অণু শিথিলভাবে এবং এলোমেলোভাবে থাকে। শিথিলভাবে থাকলেও অবশ্য তারা অনিবদ্ধ (Amorphous) থাকে না। যখন শূন্য ডিগ্রী উষ্ণতায় এই জলকে নামানো হয়, তখন জলের অণুগুলির ভিতর এই শিথিলতার ভাবটুকু সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায় এবং তারা মোটামুটি একরকম সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় এসে যায়। এই অবস্থায় অণুগুলি বেশ শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে এবং তাদের গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে স্থাপিত হয়। শেষে তারা এক সুষম স্ফটিকে (Regular crystal) পরিণত হয়। এই অবস্থায় বরফের মধ্যে অণুগুলির ভিতর নৈকট্য বেশ কমে যায় এবং এই কারণেই বরফ জলের চেয়ে হাল্কা এবং জলের উপর ভাসে।

কিন্তু ফেডিয়াকিনের এই বৈচিত্র্যময় জলের ক্ষেত্রে তিন-চারটি অণুসমন্বিত জলের একক অণুগুলি কম উত্তাপের মধ্যে থেকেও নিজেদের সাংগঠনিক কোন পরিবর্তন করতে দেয় না। তারা স্বাভাবিক উত্তাপেও যেভাবে থাকে, কম উত্তাপেও ঠিক সেই ভাবেই থাকে। ফলে এদের ক্ষেত্রে সহজে স্ফটিকীভবন হয় না। আর এই কারণেই এই জল জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয় না। অবশ্য ঠাণ্ডা অবস্থায় এদের গতিশীলতা অনেক কমে যায় বলে এদের অণুগুলি কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে পড়ে।

এখন দেখা যাক, জলের এই বিচিত্র ধর্মের জন্যে কি কি অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। মনে করা যাক যে, পৃথিবীর সমস্ত জলই সাধারণ অবস্থার বদলে এই বৈচিত্র্যময় অবস্থায় রয়েছে—তাহলে কি হবে? পৃথিবীর অনেক কিছুই তাহলে আজকের অবস্থার বদলে নতুন এক অবস্থায় উপনীত হবে। এই জল জমে বরফে রূপান্তরিত না হওয়ায় মেরু অঞ্চলে আর কোন বরফ থাকবে না—সব গলে গিয়ে জল হয়ে যাবে। তাহলে পৃথিবী কি জলস্রোতে ভেসে যাবে? না সে ভয় নেই, পৃথিবী ভাসবে না—বরং সমুদ্রের জলের উপরিতল নীচু হয়ে যাবে। কথাটা খুব আশ্চর্যের মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক। কারণ, যেহেতু এই বিশিষ্ট প্রকৃতির জল সাধারণ জলের চেয়ে অনেকগুণ ভারী, সেহেতু সাধারণ জলের সমওজনের এই জল অনেক কম জায়গা দখল করবে—অর্থাৎ এর আয়তন যাবে কমে। সুতরাং পৃথিবীর সব বরফ গলে গেলেও সমুদ্রের উপরিতল নেমে তো যাবেই অধিকন্তু বহু দ্বীপ আর ছোট ছোট স্থলভূমির সৃষ্টি হবে সমুদ্রের মধ্যে। সমুদ্রের তটরেখার নতুন নিশানা হবে—ভৌগোলিক মানচিত্র বদ্‌লে যাবে।

পার্থিব জগতে প্রাণী ও উদ্ভিদ-রাজ্যেও ঘটবে এর প্রত্যক্ষ ফল। মাটির মধ্যে জলকণা যদি পৃথিবীর কোন অংশেই না জমে যায়, তাহলে বর্তমানে কোন কোন উদ্ভিদের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জড়ভাবে শীত কাটাবার (Hibernation) যে প্রথা আছে, সেটা আর থাকবে না। সুতরাং এই ধরণের জলের অস্তিত্ব উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছেও এই ধরণের জলের আকর্ষণ স্বভাবতঃই থাকবে, কারণ সাধারণতঃ জীবকোষের মধ্যে কোষের কার্যক্ষমতা ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গেই কমে আসে। কিন্তু এই জলের ঠাণ্ডা হবার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম উপায়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে যে, জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি শ্লথ করে মানব-দেহের আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক গঠনের বার্ধক্য রোধ করা যেতে পারবে। সুতরাং মানুষের বার্ধক্য নিয়ে আর কোন সমস্যাই থাকবে না। ব্যাপারটা খুবই চিত্তাকর্ষক। এভাবে হয়তো দুরারোগ্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে উপযুক্ত ওষুধ না পাওয়া পর্যন্ত প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে মোহাচ্ছন্ন করে রাখা যাবে। ফলে শারীরিক যন্ত্রের কোন ক্ষতি না হয়েই মানুষ বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্কটরোগাক্রান্ত এক ব্যক্তিকে এইভাবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা চলছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রোগীকে রাখবার প্রধান বাধা এখনকার দিনে এই যে, আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে কোষের মধ্যে যে জলীয় অংশটুকু আছে, তা যদি ঠাণ্ডায় জমে বরফে পরিণত হয়, তাহলে আন্তর্কোষীয় জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি হয় এবং ফলে রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু যদি এই জলীয় অংশটুকু সাধারণ জলের বদলে এই বৈচিত্র্যময় জলকণা দিয়ে ভরা থাকে, তাহলে ঠাণ্ডায় ঐ জলীয় অংশ কখনই না জমে গ্লিসারিন বা পিচের মত এক তরল পদার্থের রূপ নেবে। অবশ্য সেই অবস্থায় জলীয় পদার্থের দ্বারা অধিকৃত জায়গার আয়তন যাবে অনেক কমে। সুতরাং কে বলতে পারে যে, বার্ধক্যের জন্যে মানুষের শরীরে এখন যে কুঞ্চনের সৃষ্টি হয়, তা হয়তো শরীরের মধ্যে এই বিচিত্র জলের অস্তিত্বের জন্যেই কি না?

ফেডিয়াকিনের এই জলের অস্তিত্ব স্বীকার করলে আরো জটিল বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের সূত্রও ক্রমশঃ পাওয়া যাবে। দিগন্তের খুব কাছে রাতের দিকে রূপার মত যে মেঘকণা আকাশে দেখা যায়, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে অনেক জল্পনা-কল্পনা বহুদিন ধরেই চলে আসছে। নানা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা দিয়েই সৃষ্ট অথচ এই ধরণের মেঘগুলির উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০-৬০ মাইলের মত—যে উচ্চতায় সাধারণ জল কখনই জলের আকারে থাকতে পারে না (কম উত্তাপ ও কম চাপের জন্যে)। তাহলে ঐ উচ্চতায় কোন্ জলের পক্ষে জলের আকারেই থাকা সম্ভব? ফেডিয়াকিনের আবিষ্কারের পর এখন সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ শ্রেণীর মেঘকণা নিশ্চয়ই এই নতুন ধরণের জলকণা দিয়েই তৈরী। খুব ঠাণ্ডায় ঐ জলকণাগুলি কাচের মত স্বচ্ছ আকার ধারণ করে বলেই ঐ মেঘগুলিকে রূপার মত চক্‌চকে দেখায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এই নতুন জলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলে অনেক দিনের বিতর্কিত এক বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করা হয়তো সম্ভব হবে।

বর্তমানে এই বিশেষ ধরণের জল পৃথিবীতে অতি অল্প পরিমাণেই পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো কৃত্রিম উপায়ে এই জল প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা সম্ভব হবে আর সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক নতুন পথ উদ্‌ঘাটিত হবে। বিজ্ঞানীদের মতে, এর সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে রসায়ন-বিদ্যায় বহু নতুন চিন্তাধারা ও গবেষণার সুযোগ আসবেই। সে দিনের হয়তো আর খুব বেশী দেরী নেই।

# দুধ ও দুগ্ধজাত রোগ

মৃণালকান্তি ভৌমিক

খাদ্য হিসাবে দুধের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমরা সবাই উপলব্ধি করি। বিশেষতঃ শিশু ও রোগীর খাদ্য হিসাবে এর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে অবহিত। বিভিন্ন প্রাণীর দুধ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে ভারতবর্ষে গরু ও মহিষের দুধেরই প্রাধান্য। কিন্তু পৃথিবীর কতকগুলি দেশে জলবায়ু ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কারণে গো-পালনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। সেখানে বিভিন্ন প্রাণীর দুধ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন—উটের দুধ মিশর, আরব, সাহারা অঞ্চলে, ছাগদুগ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, ভেড়ার দুধ ইটালী, সুদান ও অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

দুধ এমন একটা পুষ্টিকর খাদ্য, যা অতি সহজেই হজম হয়। এতে প্রোটিন, চর্বি, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ দ্রব্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে বর্তমান। আবার দুধ থেকে নানাপ্রকার খাদ্য ও পানীয়, যেমন—মাখন, ঘি, পনির, দই, ছানা, আইসক্রীম, লস্যি, ঘোল প্রভৃতি তৈরি হয়। ঘি ও মাখনের ব্যবহার প্রায় সব দেশেই আছে। আবার দই, লস্যির ব্যবহারও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বহুল প্রচলিত। দুধের রাসায়নিক গঠন নিম্নোক্ত রূপ :—জল—৮৭'২৭%, কেজিন ও অ্যালবুমিন—৩'৩৯%, চর্বি—৩'৬৮%, ল্যাক্টোস—৪'৯৪%, খনিজ দ্রব্যাদি ০'৭২%। মহিষের দুধে অবশ্য চর্বির পরিমাণ গরুর দুধের চেয়ে বেশী—গড়ে ৬-৭%।

স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ উৎপাদন ও তার সরবরাহ বর্তমানে আমাদের দেশে এক বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশের গোয়ালা ও জনসাধারণের বিরাট অংশ অশিক্ষিত। সে জন্যে এই ব্যাপারে পূর্বের পদ্ধতি আজও অনুসৃত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখনও তাদের অজ্ঞাত। যেহেতু দুধ পুষ্টিকর খাদ্য, সেহেতু নানাপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাস বৃদ্ধির পক্ষে দুধ একটি স্বাভাবিক মূল উৎস। দুধ দোহন করবার সময় বিভিন্ন রোগের জীবাণু দুধকে সংক্রামিত করতে পারে। এই জীবাণুগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্যাথোজেনিক এবং (২) ননপ্যাথোজেনিক। প্যাথোজেনিক ব্যাক্টিরিয়াই দুধের মাধ্যমে নানা রকম রোগ বিস্তার করে' জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত করে। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) পশুরোগের জীবাণু—(১) মাইকো-ব্যাক্টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস (Micobacterium tuberculosis), ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস (Streptococcus—Pyogenes, Fæcalis, Viridaus, Aureus, Agalactiæ), (৩) ব্রুসেলা এবরটাস ও মেলিটেনসিস্‌ (Brucella abortus & melitensis), (৪) ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস, (৫) বি. কোলাই (B. Coli), (৬) ষ্ট্যাফাইলো-কক্কাস, (৭) গো-বসন্ত ও অ্যাক্টিনোমাইসিস (Actinomyces)।

(খ) মানুষের রোগের জীবাণু—(১) সান্নি-পাতিক জ্বর (Typhoid fever), (২) রক্তামাশয়, (৩) ডিপ্‌থেরিয়া, (৪) স্পর্শাক্রামক মসুরিকাজ্বর (Scarlet fever), (৫) ওলাউঠা, (৬) গলায় পচনশীল ঘা, (Septic sore throat) (৭) যক্ষা,

(৮) গ্রীষ্মকালীন উদরাময়, (৯) খাদ্য বিষাক্তকারী রোগ-জীবাণু।

দুগ্ধজাত রোগের উৎস—প্রথমতঃ, গরু বা মহিষের স্তনে বা বাঁটে ঘা থাকলে অথবা তাদের মলমূত্রের মাধ্যমে রোগ সংক্রামিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যদি দুধ দোহন করে অথবা দুধ দোহন করবার পাত্রাদিতে যদি কোন রোগের জীবাণু থাকে, তবে রোগের জীবাণু দুধকে সংক্রামিত করে। তৃতীয়তঃ, দূষিত জল যদি দুধ দোহন করবার জন্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তার মাধ্যমে দুধে বীজাণু সংক্রামিত হয়।

দুগ্ধজাত রোগগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) পশু থেকে মানুষে রোগ-জীবাণু সংক্রমণ

(১) যক্ষ্মা—বিজ্ঞানী শ্রোডার (Schroeder) প্রথমে দেখান যে, গরুর টি. বি. কিভাবে দুধের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়ে জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত করে। এর বহুকাল পরে পার্ক ও ক্রামউয়াইড (Park & Krumwiede) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, ৮% মানুষের টি. বি. দুধের মাধ্যমে পশু থেকে সংক্রামিত হয়। তাঁরা এটাও দেখান যে, পাঁচ বছরের কম শিশুর টি. বি-তে প্রায় ১০% মৃত্যু হয়। পরে এটাও প্রমাণিত হয় যে, ১৫% হাড়ের টি. বি., বৃক্কের (Kidney) টি. বি., অস্থিসন্ধির টি. বি. গরু বা মহিষের দুধের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

(২) মাল্টাজ্বর—এই রোগের নামকরণের একটা তাৎপর্য আছে। ১৯০৪ সালে বৃটেনের মাল্টা দ্বীপের সৈন্যেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোগের চিকিৎসাও চলতে থাকে, কিন্তু আরোগ্য লাভ হয় না। সরকার নিযুক্ত কমিশনের মাধ্যমে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ছাগদুগ্ধ থেকে এই রোগের উৎপত্তি এবং সৈন্যদের রোগের কারণও ছিল এই ছাগদুগ্ধ। ব্রুসেলা জীবাণুই পশুস্তনের মাধ্যমে দুধকে সংক্রামিত করে।

(খ) দুধের মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষে ব্যাধি সংক্রমণ।

(১) সান্নিপাতিক জ্বর (Typhoid fever) —ব্যাসিলাস টাইফোসাস (Basillus typhosus) জীবাণু থেকে এই রোগের উৎপত্তি। যদি গোয়ালার পরিবারে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তবে গোয়ালা নিজেই অথবা দুধ দোহন করবার পাত্রাদির সাহায্যে এই রোগ ছড়ায়। ১৯২১ সালে আমেরিকার মনট্রিয়াল প্রদেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পাঁচ মাস পর দেখা যায় যে, ৫০১৪ জন রোগীর মধ্যে ৪৮৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। কমিশন এটাই প্রমাণ করেন যে, নির্দিষ্ট কোন ডেয়ারী ফার্ম থেকে এই রোগের উৎপত্তি। দুধ যদি বিশুদ্ধ থাকে এবং বহির্ভাগের তাপমাত্রা ঠিক থাকে, তবে এই রোগের জীবাণু অনায়াসেই বাড়তে থাকে। দুধকে ১৪০° ফাঃ তাপমাত্রায় দু-মিনিট ফুটিয়ে নিলে এই রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

(২) প্যারাটাইফয়েড ও রক্তামাশয়—এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ সান্নিপাতিক জ্বরের মতই। অবশ্য এগুলির প্রাদুর্ভাব সান্নিপাতিক জ্বরের মত সচরাচর দেখা যায় না।

(৩) গলায় পচনশীল ঘা—ভারতবর্ষে এই রোগের প্রকোপ বেশী। গরু, মহিষের স্তন বা বাঁট থেকেই এই রোগ ছড়ায়। পশু যদি ম্যাস্টাইটিস (Mastitis) রোগে ভোগে, তবে এই রোগের জীবাণু দুধের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত যদি কেউ কোন ডেয়ারী ফার্মের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে তার মাধ্যমে সাধারণতঃ এই রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে।

(৪) ডিপথেরিয়া—করিনিব্যাক্টিরিয়াম ডিপ্-

থেরি (Corynebacterium diphtheriæ) জীবাণু এই রোগ ছড়ায়। এই জীবাণু সাধারণতঃ কাসি, হাঁচি ও কথা বলার সময় দুধের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ১৪০° ফাঃ তাপমাত্রায় দুধ ফুটিয়ে নিলেই এই রোগের প্রকোপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়

(৫) স্পর্শাক্রামক মসুরিকা জ্বর (Scarlet fever)—এই রোগের প্রকোপ সাধারণতঃ কম। রোগের জীবাণু আজও অজ্ঞাত। তবে এটা ঠিক যে, দুধের মাধ্যমে মানুষই সক্রিয়ভাবে এই রোগ ছড়ায় দুধের পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতির সাহায্যে এই রোগের প্রকোপ রোধ করা যায়।

(৬) ওলাউঠা—টাইফয়েড জ্বরের মতই এর প্রাদুর্ভাব ভারতবর্ষে বেশী। একই কারণে দুধের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়। কলেরা স্পাইরিলা (Cholera spirilla) জীবাণু এর উৎস।

(৭) পলিওমায়েলাইটিস (Poliomyelitis)—এর বিস্তার আমাদের দেশে বিরল। সাধারণতঃ মাছি মলমূত্র থেকে জীবাণু নিয়ে দুধকে দূষিত করে এই রোগের বিস্তার ঘটায়।

(৮) উদরাময়—বহুবিধ কারণে এই রোগের বিস্তার হতে পারে। তবে দুধকে প্রধান কারণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়া এই রোগের কারণ।

দুগ্ধজাত রোগসমূহের বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, এই রোগসমূহ নির্দিষ্ট কোন দুগ্ধ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে ছড়ায়। এই সংক্রামক ব্যাধিগুলি অতি সহজেই বিস্তার লাভ করে। নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ এই ব্যাধিগুলি সাধারণতঃ ধনী ব্যক্তিদের পরিবারে বেশী। কেন না, এঁরা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে নির্ভীকভাবে দুধ গ্রহণ করেন। এমনও দেখা গেছে যে, একই পরিবারে নারী ও ছোট ছেলেমেয়ে এই ব্যাধিগুলিতে বেশী আক্রান্ত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এক হিসাবে দুধ যেমন পুষ্টিকর খাদ্য, আবার অন্য হিসাবে এই দুধই অতি সহজে জনস্বাস্থ্য বিপর্যস্ত করতে পারে। এই বিপর্যয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে নিম্নোক্ত নিয়মবিধি অনুসরণ করা বিধেয়—

(১) পরীক্ষাগারে প্রত্যক্ষভাবে দুধ পরীক্ষা ;

(২) গরু বা মহিষের টিউবারকিউলিন (Tuberculin) পরীক্ষা ;

(৩) অসুস্থ গোয়ালার ডেয়ারী ফার্মে প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ ;

(৪) পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ বিশুদ্ধীকরণের ব্যবস্থা ;

(৫) ডেয়ারী ফার্মকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিষ্কার রাখা ;

(৬) গোয়ালাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান ;

(৭) গরু বা মহিষের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা।

# ভ্রূণের জন্মসম্পর্কিত মতবাদের দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান

রমেন দেবনাথ

জীব-বিজ্ঞানের একটি শাখা হলো ভ্রূণ-তত্ত্ব —যার সাহায্যে ভ্রূণের জন্ম-রহস্য, গঠন-প্রক্রিয়া এবং প্রাথমিক অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পরিণতির বিবরণ জানা যায়।

অ্যারিস্টটলের সময় থেকে ভ্রূণের জন্ম সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। ঐ দুটি মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছিল। এর সমাধান কেমন করে হলো এবং মতবাদ দুটিই বা কি—ইত্যাদি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

## (১) প্রিফরমেশন মতবাদ
## (Preformation Theory)

প্রথম থেকেই পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটি ডিম্বের মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে নিহিত থাকে এবং এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটিই আস্তে আস্তে আকারে বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। এই মতবাদানুযায়ী ডিম্বস্থ ক্ষুদ্রকায় প্রাণী (ভ্রূণ) ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—একমাত্র আকৃতি ছাড়া। একটি দেখতে ছোট, অপরটি বড়—অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সবই এক। ডিম্বস্থ ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটি (ভ্রূণ) যখন পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, তখন কোন নতুন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্ম হয় না, শুধু আকারে বড় হয়ে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে (এই মতবাদানুযায়ী) ডিম্বের মধ্যে প্রথম থেকে গঠিত ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটির নাম দেওয়া হয়েছে হোমানকুলাস (Homunculus)। মাইক্রোস্কোপ তৈরির পর লিউয়েনহুক (Leuwenhoek) কর্তৃক মানুষের শুক্রকীটের আবিষ্কার হবার ফলে প্রিফরমেশন মতবাদের সমর্থকগণ এক সমস্যার সম্মুখীন হন—সেটি হলো এই যে, হোমানকুলাস ডিম্বের মধ্যে থাকে, না শুক্রের মধ্যে থাকে? এক দলের মতে শুক্রের মধ্যে, অন্য দলের
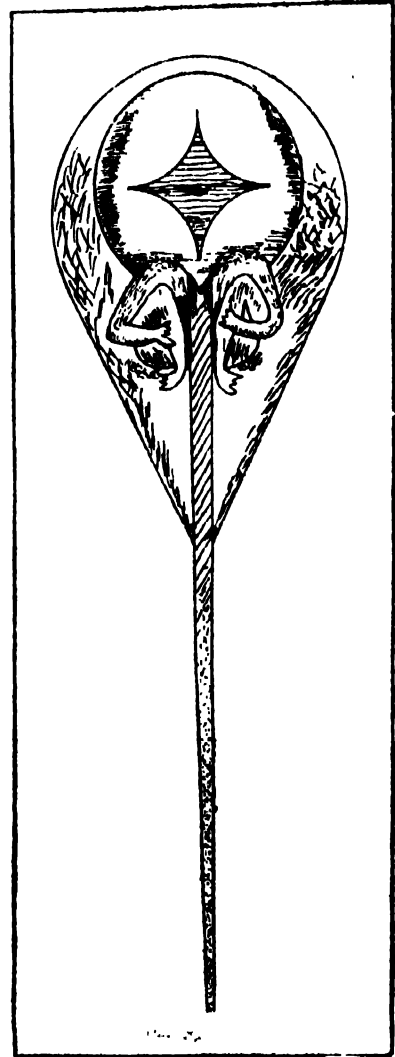
১নং চিত্র
ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য-ভ্রূণ।

মতে ডিম্বের মধ্যে। প্রথমোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হার্টসিকার (Hartsoeker) নামে এক অত্যুৎ-

সাহী বিজ্ঞানী (?) রটিয়ে বেড়াতে লাগলেন যে, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তিনি শুক্রের মধ্যে ক্ষুদ্রকায় মনুষ্য-শিশু (Homunculus) দেখতে পেয়েছেন এবং তার ছবিও তিনি এঁকে দেখিয়েছেন ( ১নং চিত্র )। এই ছবি নিয়ে তখন খুব সাড়া পড়ে যায়। অনেকেই উপরিউক্ত প্রথম মতটির ( শুক্রের মধ্যে ভ্রূণ থাকে )

## (২) এপিজেনেসিস মতবাদ

(Epigenesis Theory)

এই মতবাদ অনুযায়ী নিষিক্ত ডিম্বের সুনির্দিষ্ট কোষ-বিভাজন পদ্ধতির ফলে ভ্রূণের জন্ম হয় এবং গঠনমূলক প্রক্রিয়ার (Developmental process) সাহায্যে ভ্রূণ ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় রূপান্তরিত হয়—প্রথম থেকেই ডিম্বের
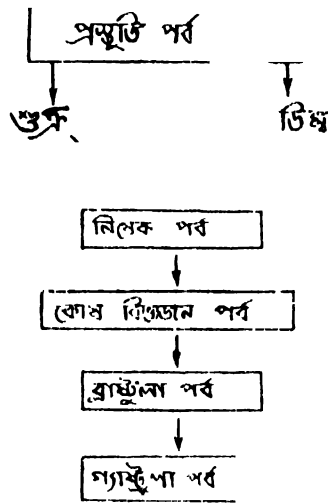
২নং চিত্র
প্রাথমিক ভ্রূণতাত্ত্বিক পর্ব

সমর্থক হয়ে পড়েন। এই দুই দলের দ্বন্দ্বের অবসান হয় বহু বছর পরে, বিজ্ঞানী স্প্যালানজানি (Spal'anjani) যখন ভ্রূণ-তাত্ত্বিক পরীক্ষার দ্বারা দেখালেন যে, ভ্রূণ তৈরির ব্যাপারে শুক্র এবং ডিম্ব উভয়েরই দরকার।

মধ্যে কোন প্রাণী তৈরি হয়ে থাকে না। যদিও অ্যারিষ্টটল এই মতবাদের প্রবর্তক, তবু বিজ্ঞানী উল্ফ-ই (Woulf) এই মতবাদকে ১৭৫৯ সালে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন।

উপরিউক্ত মতবাদ দুটির সমর্থনে দুটি বিখ্যাত পরীক্ষা আছে। জার্মান বিজ্ঞানী রৌক্স (Roux) ১৮৮৮ সালে ব্যাঙের ডিম নিয়ে

প্রিফরমেশনের পরীক্ষা করেন। নিষিক্ত ডিম কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবার পর একটি কোষকে তিনি গরম সূক্ষ্ম শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করে নষ্ট করে দেন এবং বিনষ্ট কোষটিসহ অন্য কোষটিকে বাড়তে দেওয়া হয়। এর ফলে দেখা গেল—একটি অর্ধ ভ্রূণের জন্ম হয়েছে রৌক্স মনে করেন, যেহেতু ডিম্বের মধ্যে প্রথম থেকেই একটি আস্ত ভ্রূণ তৈরি হয়েছিল, কাজেই ডিম্বের অর্ধেক অংশ নষ্ট করে দেবার ফলে বাকী অর্ধেকাংশে অর্ধ ভ্রূণের জন্ম হয়েছে, আস্ত প্রাণীর জন্ম সম্ভব হয় নি। ড্রীস্ (Dreisch) নামে অন্য একজন বিজ্ঞানী প্রায় একই রকম পরীক্ষা করে উল্টো ফল পেলেন। তিনি নিষিক্ত ডিম্বের দ্বি-কোষ পর্বের (2-Celled stage) ২টি কোষকে কেটে আলাদা করে পৃথক পৃথক ভাবে কোষ দুটির ভ্রূণতাত্ত্বিক পরীক্ষা করেন। রৌক্সের মত দুটি কোষের একটিকে তিনি নষ্ট করে ফেলেন নি এবং কোষ দুটিকে একত্র রাখেন নি। তিনি দেখতে পান যে, দুটি কোষ থেকেই দুটি আস্ত ভ্রূণের জন্ম হয়েছে। তাঁর মতে, নিষিক্ত ডিম্বের কোষ বিভাজনের ফলে ভ্রূণের জন্ম হয়—পূর্ব থেকেই ডিম্বের মধ্যে ভ্রূণ তৈরি হয়ে থাকে না।

উপরিউক্ত পরীক্ষা দুটির ফলে দুটি বিপরীত মতবাদের সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকেই নিজের মতবাদকে নির্ভুল মনে করে অন্যের মতবাদকে ভুল বলে প্রচার করতে সুরু করেন। বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় এই দুই মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা হয়েছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা উপরিউক্ত দুটি পরীক্ষারই পুনরাবৃত্তি করে দেখছেন যে, দুটিতেই আংশিক সত্যতা রয়েছে। একটি কর্তিত ডিম্বাংশ থেকে অর্ধ ভ্রূণ তৈরি হবে বা পূর্ণ ভ্রূণ তৈরি হবে অথবা আদৌ কোন ভ্রূণ তৈরি হবে কিনা, সেটা নির্ভর করে, কি ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে, তার উপর।

আধুনিক ভ্রূণতাত্ত্বিদের (Embryologist) মতে, প্রিফরমেশন ও এপিজেনেসিস-এর মধ্যে শেষোক্ত মতবাদটিই গ্রহণযোগ্য। পূর্ব থেকে ডিম্ব বা শুক্রাণুর মধ্যে কোন ভ্রূণ তৈরি হয়ে থাকে না—নিষিক্ত ডিম্বের সুনির্দিষ্ট কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই ভ্রূণের জন্ম হয়। কিন্তু বংশগতির দিক থেকে বিচার করলে আবার প্রিফরমেশন মতবাদকে স্বীকার করতে হয়। ভ্রূণ স্ত্রী হবে না পুরুষ হবে, লম্বা হবে না বেঁটে হবে, কোন বংশগত রোগ থাকবে কি না, গায়ের রং কালো হবে না ফরসা হবে, চুল সোজা হবে, না কোঁকড়ানো হবে—এই সব বংশগতি সম্পর্কিত গুণাবলী নিষেক-ক্রিয়ার (Fertilisation) সময় থেকেই নিষিক্ত ডিম্বের মধ্যে বিরাজমান। কারণ নিষেক-ক্রিয়ার সময় শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষের নিউ-ক্লিয়াস দুটি একীভূত (Fuse) হয়ে গিয়ে তাদের ক্রোমোজমগুলিও একত্রিত হয়ে জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয়ে যায় এবং ক্রোমোজমস্থিত জিনের (D. N. A.—Deoxyribose Nucleic Acid) মাধ্যমে বংশগতি সংক্রান্ত গুণাবলী ভ্রূণের জন্মের পূর্বেই নিষিক্ত ডিম্বের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়।

সুতরাং ভ্রূণ-গঠনে প্রিফরমেশন ও এপি-জেনেসিস—এই দুটি মতবাদেরই সত্যতা দেখা যায়। প্রজনন-বিজ্ঞানের দিক থেকে ভ্রূণটি পূর্ব-নির্ধারিত (Preformed) এবং গঠনমূলকতার (Development) দিক থেকে এপি-জেনেটিক অর্থাৎ নিষিক্ত ডিম্বের কোষ বিভাজনের ফলে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ ভ্রূণটি গঠিত হয়।

এপিজেনেসিসের মাধ্যমে যেভাবে নিষিক্ত ডিম্ব থেকে ধাপে ধাপে ভ্রূণ তৈরি হয়—সেই ধাপ বা পর্বগুলি যাবতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রেই

এক, তা সে চিংড়ি, পিঁপড়ে, অতিকায় ডাইনোসর বা মানুষ যে কেউ হোক। এই পর্বগুলিকে প্রাথমিক ভ্রূণতাত্ত্বিক পর্ব (Primary embryological stage) বলা হয়, চিত্র সহকারে (২নং চিত্র) তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো—

(১) প্রস্তুতি পর্ব (Preparatory stage)

(২) নিষেক পর্ব (Fertilisation stage)

(৩) কোষ-বিভাজন পর্ব (Cleavage stage)

(৪) ফাঁপা বল পর্ব বা ব্লাষ্টুলা পর্ব (Blastula stage)

(৫) গ্যাষ্ট্রুলা পর্ব (Gastrula stage)

প্রস্তুতি পর্ব—এই পর্বে প্রাণীর অণ্ডকোষ ও ডিম্বকোষ থেকে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু তৈরি হয়। দেহের অন্যান্য কোষে ক্রোমোজম জোড়াবদ্ধ থাকে এবং দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোজম (Diploid) থাকে, কিন্তু শুক্র ও ডিম্বের ক্ষেত্রে ক্রোমোজম সংখ্যা অর্ধেক এবং এরা বেজোড় (Haploid & unpaired) অবস্থায় থাকে।

নিষেক পর্ব—এই পর্বে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পরস্পর একীভূত হয়। ফলে যে কোষের সৃষ্টি হয় তাকে নিষিক্ত ডিম্ব বা জাইগোট (Zygote) বলে। এই নিষেক পর্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ফলে দ্বিগুণ সংখ্যক ক্রোমোজমের উৎপত্তি হয় ও বংশগতি সংক্রান্ত গুণাবলী নির্ধারিত হয়। সমস্ত জীবেরই জন্ম হয় আণবীক্ষণিক জাইগোট বা নিষিক্ত ডিম্ব হিসাবে—তা সে ক্ষুদ্রকায় পিঁপড়েই হোক, বিশাল বটবৃক্ষই হোক অথবা মানুষই হোক।

কোষ-বিভাজন পর্ব—এই পর্বে জাইগোটটি সাধারণ কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ায় (Mitosis) বিভক্ত হতে থাকে। প্রথমে দুটি কোষ পরে ৪, ১৬, ৩২, ৬৪—এইভাবে একটি কোষ থেকে অসংখ্য কোষ তৈরি হয়।

ব্লাষ্টুলা পর্ব—ক্লীভেজের পর বহু বিভক্ত কোষ মিলে একটি ফাঁপা গোলকের সৃষ্টি করে, যাকে ব্লাষ্টুলা বলা হয়।

গ্যাষ্ট্রুলা পর্ব—ব্লাষ্টুলা পর্ব গ্যাষ্ট্রুলা পর্বে রূপান্তরিত হয় প্রধানতঃ কোষের অন্তর্মুখীকরণ (Invagination) প্রক্রিয়ার সাহায্যে, যার ফলে ফাঁপা গোলকের এক প্রান্ত ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে এবং গোলকের অন্য প্রান্তকে স্পর্শ করে—একটি ফাঁপা রবারের বলের একদিকে আঙুল দিয়ে চাপ দিলে যেমন একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট গর্তের সৃষ্টি হয়, অনেকটা প্রায় সে রকম। গ্যাষ্ট্রুলা পর্বের শেষে তিনটি কোষস্তর (Cell-layer) তৈরি হয়, যথা—বহিস্তক (Ectoderm), মধ্যস্তক (Mesoderm) ও অন্তস্তক (Endoderm)। প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এই তিনটি আদি কোষবস্ত থেকে তৈরি হয়। সে জন্যে একে বীজ কোষস্তর (Germ layer) বলা হয়, কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বীজ (?) এর মধ্যে নিহিত থাকে।

# টেরিলিন

**সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত**

কৃত্রিম তন্তু টেরিলিনের জন্যে ১৯৬০-'৬১ সালে যেখানে ২'৬ কোটি টাকার মত বিদেশে গেছে, ১৯৬৪-'৬৫ সালে সেটা বেড়ে ১২'৬ কোটিতে দাঁড়িয়েছিল এবং এখন হয়তো আরও বেশী যাচ্ছে। যদিও সাধারণতঃ বলা হয়, এর সবটাই নাকি ফেরৎ আসে ঐ তন্তুজাত বস্ত্রাদি রপ্তানী করে। তবু যে দেশে মাথাপিছু বস্ত্রাদি ব্যবহারের পরিমাণ গত এক দশকে ( ১৯৫৬-'৬৫ ) প্রায় একই এবং খুব কম রয়ে গেছে ( বছরে ২'৩ কিলো। তুলনামূলকভাবে জাপানে ১০'৬, অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে ১০ এবং আমেরিকায় ১৬ কিলোর মত ) সেখানে সবটাই রপ্তানী করে অল্প দামের বস্ত্রাদির বেশী পরিমাণে ব্যবস্থা করাই হয়তো সমীচীন।

টেরিলিন জিনিষটা কি ? বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কারখানায় এর বিভিন্ন নাম। ইংল্যাণ্ডে বলে টেরিলিন, আমেরিকায় ডেক্রন, ভাইক্রন, টেরন, ফ্রান্সে তারগাল, জার্মেনীতে ত্রেভিরা, ডাইওলেন, রাশিয়ায় ল্যাভসন, জাপানে তেইজীন-তেতোরান, তোরে-তেতোরান এবং আরও কত কি! রাসায়নিক শ্রেণীবিন্যাসে বলা হয় পলিএষ্টার। এষ্টার জিনিষটা হলো জৈব অম্ল ও অ্যালকোহলের বিক্রিয়াজাত উৎপন্ন বস্তু। আবার যখন কোন বিশেষ রাসায়নিক এককের পৌনঃপুনিক সংযোজনের দ্বারা বৃহৎ কোন অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় পলিমার। উদাহরণস্বরূপ পলিথিনের নাম করা যেতে পারে। দুটি কার্বন পরমাণু ও চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি এককের পৌনঃপুনিক সংযোজনের ফলে এক অতিকায় আণবিক ওজনের অণু অর্থাৎ পলিথিনের সৃষ্টি হয়।

টেরিপ্থ্যালিক অম্ল ও ইথিলিন গ্লাইকল-এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ইথিলিন টেরিপ্থ্যালেট এষ্টার এবং এরই অসংখ্য পুনরাবৃত্তিতে এক বৃহৎ অণু পলিইথিলিন টেরিপ্থ্যালেট বা টেরিলিনের জন্ম। পেট্রোলিয়াম ন্যাপ্থা থেকে পাওয়া যায় প্যারাজাইলিন এবং তাকে জারিত করলে উৎপন্ন হয় টেরিপ্থ্যালিক অম্ল। আবার পেট্রোলিয়ামকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে দিলেও (ক্র্যাকিং) পাওয়া যায় ইথিলিন। এই ইথিলিন থেকেই তৈরি করা হয় ইথিলিন গ্লাইকল।

এইভাবে উৎপন্ন রাসায়নিকটিকে গলন্ত অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে সরু সুতার মত আকৃতি দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন মাত্রায় সম্প্রসারিত ( ড্রয়িং ) করে বস্ত্র-তন্তুর গুণবিশিষ্ট করা হয়।

এরপর রয়েছে রং করবার ঝামেলা। এতে এমন কোন যৌগ মূলক নেই যার সঙ্গে রঙের কোন সংযোগ করা যেতে পারে। আবার এর অণুগুলি পরস্পরের খুবই কাছাকাছি থাকে, উপরন্তু তুলাজাত তন্তুর মত জলে ফুলে গিয়ে রঙের অণুর জন্যে জায়গা করে দিতেও চায়। তাই রঙের অণুগুলিকে এর মধ্যে প্রবেশ করানোই সমস্যা। দুটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই কাজটি সমাধা করা হয়। প্রথমটিতে রঙের দ্রবণ না করে খুব ছোট ছোট রঙের কণাযুক্ত ফুটন্ত জলে তন্তুগুলিকে ভিজানো হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তন্তুগুলির উপর রঙের একটি সূক্ষ্ম প্রলেপ লাগিয়ে অল্প সময়ের জন্যে

সেগুলিকে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে যে রঙের অণুগুলি একবার তন্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেগুলি আর সহজে বেরোতে পারে না এবং রংও খুব পাকা হয়।

টেরিলিনের প্রধান গুণই হলো সহজে ভাঁজ পড়ে না। তুলা উত্তাপে গলে না, কিন্তু এর গলনাঙ্ক ২৪৯° সে.-এর মত। তাই টেরিলিনের কোন পোষাকে অল্প উত্তপ্ত ( ১৩০° সেঃ ) ইস্ত্রি দিয়ে যে কোন ভাঁজ বহুদিনের জন্যে পাকা করা যায়। এর জল ধারণের ক্ষমতা খুবই কম (প্রায় ০'৪%) এবং জলে—এমন কি, ফুটন্ত জলেও এর শক্তির বিশেষ তারতম্য হয় না। ফলে কাচলেও এর ভাঁজ অটুট থাকে এবং শুকায়ও খুব তাড়াতাড়ি। অবশ্য সামান্য কিছু অসুবিধাও আছে। এতে সহজেই স্থির-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ফলে ধুলাবালি ও ময়লা সহজেই আকৃষ্ট হয়। পোকামাকড় বা ছত্রাক এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আগুনে ক্রমাগত জ্বলতে থাকে না, যেটুকুতে লাগে গলে পড়ে যায়, বাকী অংশ অটুট থাকে।

টেরিলিন বেশীর ভাগ পোষাক-পরিচ্ছদেই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ক্ষেত্রে তুলাজাত তন্তু ও টেরিলিনের মিশ্রণ (টেরিকট) ও স্যুটিং-এর ক্ষেত্রে উল ও টেরিলিনের মিশ্রণ খুব ভাল কাজ দেয়। তাছাড়া জলে সহজে পচন ধরে না বলে দড়ি, মাছধরার জাল, নৌকার পাল তৈরিতেও এর প্রচলন আছে। ক্ষার বা খুব বেশী শক্তির অম্ল না হলে এর ক্ষতি হয় না বলে রবারের আস্তরণ দিয়ে পরিবহনের ফিতা ও অম্লরোধী কাপড় হিসেবে টিন-নিকেল প্লেটিং-এ অ্যানোড ব্যাগ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। বীজাণু জন্মাতে পারে না বলে জল পরিস্রবণের কাজেও এর ব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া উচ্চ তাপে ( ১২০° সে. পর্যন্ত ) এর প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে না বলে বিদ্যুৎ-অপরিবাহক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া আছে আরও হাজারো রকমের ব্যবহার।

রেশম, রেয়ন, নাইলন ইত্যাদি বিভিন্ন তন্তুর মধ্যে কোন্‌টা টেরিলিন বোঝা যায় কেমন করে? জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে সহজ দু-একটি পরীক্ষা করা চলতে পারে। রেয়ন, নাইলন বা রেশম গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অম্লে ৩০°-৩২° সে. তাপমাত্রায় দ্রবীভূত হয়ে যায়, আবার তুলাজাত তন্তু শতকরা ৭০ ভাগ সাল্‌ফিউরিক অম্লে এবং উল শতকরা ৫ ভাগ কষ্টিক দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু টেরিলিন এর কোনটাতেই দ্রবীভূত হবে না। উত্তপ্ত মেটাক্রেসল, ট্রাইফ্লুরো অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং আরও একটি রাসায়নিকে অবশ্য একে দ্রবীভূত করা যায়। তাছাড়া আগুনে পুড়িয়ে পোড়বার গন্ধ থেকে ও ধরণ দেখেও বিভিন্ন তন্তুগুলির পরিচয় আন্দাজ করা যায়।

কথায় আছে—প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস। তাই আজ প্রকৃতির উপর আর আমরা নির্ভরশীল থাকতে চাই না। উপযুক্ত আলো, জল ও সারের ব্যবস্থা করেও যেখানে এক টন তুলা পেতে লাগে ১০ একরের মত জমি, সেখানে মাত্র ৫ একরের মত জমির কাঠ থেকে পাওয়া যেতে পারে এক টন রেয়ন। তবু এতেও রয়েছে প্রকৃতির হাত। আমাদের দেশে যেমন খুব ভাল তুলা নেই, তেমনি বনজ সম্পদের পরিমাণও অল্প ( সমগ্র জমির মাত্র ২২% যেখানে পৃথিবীর গড় ৩৩% )। এই অবস্থায় আমাদের দেশে কৃত্রিম তন্তুর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল হওয়া উচিত। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির তন্তু ব্যবহারের তুলনা থেকেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

| পৃথিবীতে তন্তুর ব্যবহার | তুলা | উল | রেয়ন | কৃত্রিম |
|---|---|---|---|---|
| | ( সমস্ত তন্তুর শতকরা অংশ ) | | | |
| ১৯৫৩ | ৭১'৩ | ১০'৬ | ১৬'৫ | ১'৬ |
| ১৯৬৪ | ৬২'০ | ৮'৬ | ১৯'৪ | ১০'০ |
| ভারত | | | | |
| ১৯৫৩ | ৯৬'১ | ১'১ | ২'৮ | — |
| ১৯৬৪ | ৯১'১ | ০'৯ | ৬'৭ | ০'৮ |

ভারতে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের হিসাবে যেখানে সমস্ত তন্তুর ব্যবহার মিলিয়ে বছরে বৃদ্ধির হার শতকরা ৬ ভাগ, সেখানে বিভিন্ন তন্তুর আলাদা হিসাবে দেখতে পাই, তুলাজাত তন্তুর বৃদ্ধির হার শতকরা ৫ ভাগ, রেয়ন ১১ ভাগ এবং কৃত্রিম তন্তু প্রায় ৩০ ভাগ।

এবারে আমাদের বাণিজ্যিক দিকটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। নীচে তিন বছরের একটি হিসাব দেওয়া গেল।

| | ১৯৫৭ | ১৯৬০ | ১৯৬৪ |
|---|---|---|---|
| তুলা | ( কোটি টাকার হিসাবে ) | | |
| আমদানীকৃত তুলা | ৪৮'৫ | ৭৩'০ | ৫৬'০ |
| তুলাজাত কাপড়ের রপ্তানী | ৬৫'২ | ৬৩'৩ | ৫৭'১ |
| ঘাট্‌তি / জমা | +১৬'৭ | —৯'৭ | +১'১ |
| রেয়ন | | | |
| রেয়ন তৈরির উপযোগী কাষ্ঠমণ্ডের আমদানী | ১'৯ | ৪'২ | ৫'৪ |
| রেয়নজাত কাপড়ের রপ্তানী | ০'৪ | ২'৭ | ৭'১ |
| ঘাট্‌তি / জমা | —১'৫ | —১'৫ | +১'৭ |

খুব ভাল জাতের লম্বা আঁশের তুলা আমাদের দেশে উৎপন্ন সামান্যই হয়। রেয়নের ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষিতা আরও অনেক বেশী। অনেক দিন যাবৎই রেয়ন শিল্পের মূল উপাদান কাষ্ঠমণ্ডের সবটাই আমদানী করা হতো। এখন কেরালার বাঁশ দিয়ে কিছু কাষ্ঠমণ্ড তৈরি করা হচ্ছে, তবু প্রায় অর্ধেকের মত কাষ্ঠমণ্ডই আমদানী করতে হয়। ১৯৬৪ সালে এই বাবদ ৫ থেকে ৬ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয়েছে। কৃত্রিম তন্তুর বেলায় অবস্থাটা আরও শোচনীয় ছিল। ১৯৬১ সালে যেখানে ১৯ লক্ষ কেজি ( ২'৮ কোটি টাকা ) কৃত্রিম তন্তুর আমদানী হয়, সেখানে ১৯৬৪ সালে করতে হয়েছে প্রায় ৬৭ লক্ষ কেজি ( ৯'৭ কোটি টাকা )। কিছু পরিমাণ কৃত্রিম তন্তু এদেশে তৈরি করা আরম্ভ হলেও অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও মূল উপাদান, নাইলনের বেলায় ক্যাপ্রোল্যাকটাম ও টেরিলিনের বেলায় ডাইমিথাইল টেরিপ্থ্যালেট ( ডি. এম. টি. ) সবটাই আমদানী করতে হতো। অল্প কিছুদিন হলো কয়ালিতে অবস্থিত গুজরাট অ্যারোমেটিক্স নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় ৫০০০ টন ডি. এম. টি. উৎপাদন করছে এবং

এর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে বছরে প্রায় ২৪,০০০ টন করবার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অপর উপাদান ইথিলিন গ্লাইকল বোম্বের ন্যাশন্যাল অর্গ্যানিক কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিস তৈরি করছে। আপাততঃ বোম্বেস্থিত আই. সি. আই-এর একটি শাখা কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফাইবার লিঃ বছরে প্রায় ৪,৫০০ টনের মত টেরিলিন তন্তু উৎপাদন করছে। বর্ধিত পরিমাণ মূল উপাদান ডি. এম. টি. উৎপাদনের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে ঐ কারখানাটির উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও প্রতিটি ৬,১০০ টন উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট নতুন ৩টি কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

কৃত্রিম তন্তুর মূল উপাদানগুলি তৈরি করতে প্রধানতঃ কয়লা ও পেট্রোলিয়ামজাত বিভিন্ন রাসায়নিকের প্রয়োজন হয়। তুলার জন্যে দরকার ভাল জমি, রেয়নের জন্যে কাঠ—এর কোনটিই আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নেই। কিন্তু পলিএষ্টার ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্তুর প্রয়োজনীয় উপাদান কয়লা ও পেট্রোলিয়াম আমাদের আছে। উপরন্তু ঐগুলি তৈরির সময় অসংখ্য উপজাত দ্রব্য পাওয়া যাবে, যা বিভিন্ন শিল্পের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সুশৃঙ্খল শিল্পোদ্যোগ টেরিলিন তথা কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রে এক বিরাট ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে।

# চূর্ণধাতু-প্রযুক্তিবিদ্যা

উদয় চট্টোপাধ্যায়

ধাতুনির্মিত অংশ ব্যবহার করতে হয় আমাদের নানা প্রয়োজনে, যেগুলির প্রয়োজনীয় রূপ দেবার জন্যে প্রচলন রয়েছে নানাবিধ প্রক্রিয়ার। গলিত ধাতুকে ছাঁচে ঢেলে রূপ দেবার নাম ঢালাই প্রক্রিয়া। কঠিন ধাতুকে গরম করে ও পিটিয়ে প্রয়োজনীয় আকারে নিয়ে আসবার প্রক্রিয়াও বহুল প্রচলিত। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়া (পাউডার মেটালার্জি) এগুলি থেকে স্বতন্ত্র। এই প্রক্রিয়ায় প্রারম্ভিক উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় ধাতু-চূর্ণের। ধাতু-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে চূর্ণধাতুর ব্যবহার খুব সাম্প্রতিক কালের ঘটনা নয়। কিন্তু সম্প্রতি ধাতুবিদ্যার এই বিশেষ শাখার বিস্তৃতিলাভ ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে, বিশেষতঃ বিগত তিন-চার দশকে সমস্ত পৃথিবীতে নতুনভাবে কর্মোদ্যম চলেছে এই বিষয়ে নতুন নতুন প্রয়োগ আর আবিষ্কারের সম্ভাবনায়। প্রক্রিয়ার সারল্য আর ক্ষেত্রবিশেষে এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ধাতব অংশাদির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্বভাবতঃই ধাতুবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রক্রিয়ার সারল্য এনেছে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্র-নির্ভরতার সুযোগ। অবসিতপ্রায় ধাতুর অপচয় আর প্রস্তুত অংশাদির চূড়ান্ত যন্ত্র-সমাপ্তির (মেসিন ফিনিসিং) অপ্রয়োজনীয়তা হেতু এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে বিরাট অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের ইঙ্গিত। সরাসরি কাজে লাগাবার মত ধাতব অংশ প্রতি আধ মিনিটে একটি করে উৎপাদনের মত উচ্চ হার একমাত্র এই প্রক্রিয়াতেই পাওয়া সম্ভব।

চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ায় মূল উপাদান ধাতুচূর্ণ। এই ধাতুচূর্ণ লৌহাশ্রয়ী (ফেরাস) বা লৌহেতর (নন্-ফেরাস) উভয় প্রকারই হতে পারে। সাধারণ ধাতু-নিষ্কাশনের বেলায় ধাতুকে আমরা পাই গলিত অবস্থায়। গলিত ধাতুকে জল বা অন্য

কোন তরল পদার্থের উচ্চ চাপ প্রয়োগে চূর্ণ অবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। এছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে ধাতুচূর্ণ প্রস্তুত করা যেতে পারে। আর এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাতু-নির্ভর। তবে ধাতুচূর্ণ-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত ধাতু লোহা আর তামা চূর্ণ অবস্থায় লাভ করা হয় প্রধানতঃ তাদের অক্সাইড যৌগকে হাইড্রোজেন বা অনুরূপ বিজারক পদার্থের দ্বারা বিজারিত (রিডাকশন) করে। ধাতু চূর্ণ থেকে ধাতব অংশ তৈরির কাজ এর পর অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার। প্রয়োজনীয় অংশের আদর্শে তৈরি ছাঁচে (ডাই ও পাঞ্চ) ধাতুচূর্ণকে উচ্চ চাপের সাহায্যে ঘন সংবদ্ধ করা হয়। এর জন্যে প্রতি বর্গ-সেণ্টিমিটারে চাপ দেওয়া হয় সাধারণতঃ দুই থেকে বারো টন পর্যন্ত। স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের ধাতব অংশ তৈরি এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। ঘন সংবদ্ধকরণের এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংঘনন (কম্প্যাকটিং)। ঘন সংবদ্ধ অবস্থায় ধাতব অংশটির নাম গ্রীন কম্প্যাক্ট। গ্রীন কম্প্যাক্টের শক্তি খুবই নিম্নমানের, সে জন্যে একে সরাসরি কাজে লাগানো যায় না। চুল্লীতে সুনিয়ন্ত্রিত বিজারক পরিবেশে গ্রীন কম্প্যাক্টকে কিছু সময় গরম করলে ধাতুচূর্ণের পারস্পরিক বন্ধনহেতু অংশটির শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই তাপ প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সিনটারিং। সিনটারিং-এর পর ধাতব অংশটির ঘনত্ব আর শক্তি কঠিন ধাতুর সমপর্যায়ে আসে। এই অবস্থায় অংশটিকে সরাসরি কাজে লাগানো সম্ভব, চূড়ান্ত যন্ত্রসমাপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়।

ছোটখাটো আকারের নানা ধরণের ধাতব অংশ আজকাল চূর্ণধাতু প্রযুক্তি-প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হচ্ছে। বহুল প্রয়োগের দিক থেকে সর্বপ্রথম উল্লেখ দাবী করতে পারে মোটর গাড়ী শিল্প। একটি মোটর গাড়ীতে প্রায় এক-শ'-এরও বেশী ধাতব অংশ ব্যবহার করা হয়, যেগুলি চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ায় নির্মিত। প্রধানতঃ নানা আকারের গিয়ার, ক্যাম, লিভার এই শ্রেণীভুক্ত। বস্ত্রশিল্পে ব্যবহার্য বয়নযন্ত্রের ববিন রিং জাতীয় অংশাদি এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত। এই ধরণের অংশগুলি ক্ষুদ্র আকারের অথচ জটিল, প্রচলিত যন্ত্রসমাপ্তি-প্রক্রিয়ায় এদের নির্মাণ সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। যন্ত্রশিল্পে ব্যবহার্য অংশাদির মধ্যে চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ার আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান সেলফ্-লুব্রিকেটিং বিয়ারিং। বৈদ্যুতিক পাখা এবং আরও অনেক যন্ত্র, যেখানে বিয়ারিং-এর ব্যবহার অপরিহার্য অথচ যেখানে নিয়মিত-ভাবে সেলফ্-লুব্রিকেটিং-এর সুযোগ সীমিত, সেখানে দীর্ঘকাল ব্যবহারোপযোগী সেলফ্-লুব্রিকেটিং বিয়ারিং বহু সমস্যার সমাধান করেছে। চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ায় এই সব বিয়ারিং তৈরির সময় ধাতুচূর্ণের সঙ্গে বিশেষ তৈলবাহী পদার্থ কিছু পরিমাণে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়। টাংষ্টেন কার্বাইড নির্মিত উচ্চগতিতে কাটবার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক বাল্বের টাংষ্টেন ফিলামেণ্ট তার—এগুলিও চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ার প্রয়োগের উদাহরণ।

সাধারণ দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্র ছাড়াও চূর্ণধাতু-প্রযুক্তি-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেছে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার নতুন নতুন ক্ষেত্রে। বর্তমান জেটের যুগে জেট বিমানকে অবতরণের পর উচ্চগতি থেকে অল্প সময়ের মধ্যে স্থিরতায় আনবার জন্যে প্রয়োজন বিশেষ ধরণের ব্রেকের। চূর্ণধাতু প্রক্রিয়া এই প্রয়োজন মেটাচ্ছে ধাতুচূর্ণের সঙ্গে অধাতুচূর্ণের মিশ্রণে, অন্য কোন উপায়ে যা সম্ভব নয়। প্রচলিত ধাতুচুম্বকের ক্ষেত্র প্রায় সম্পূর্ণ দখল করেছে চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত ফেরাইট চুম্বকের অংশাদি। পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের অক্সাইড যৌগ—জ্বালানী শলাকা

প্রস্তুত করা হয় চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ায়। পরমাণু গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রেও চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ায় নির্মিত অংশাদির ব্যবহার প্রচুর। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে মানুষের উদ্যম আজ নিত্য নতুন পথচারী। মহাকাশ অভিযানে বায়ুমণ্ডল ও তার উপরের স্তরের চাপ আর অবস্থার তারতম্য হেতু রকেট বা মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। মহাশূন্য থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় বায়ুস্তরের সঙ্গে প্রচণ্ড-সংঘাতে মহাকাশযানের সামনের অংশ উত্তপ্ত হয়ে লালবর্ণ ধারণ করে, তাপমাত্রা হয় প্রায় ৩৫০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। প্রচলিত ধাতব অংশের ব্যবহার এই অবস্থায় অচল। চূর্ণধাতু-প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট ধাতব অংশ এই সব ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী। হাল্কা অথচ উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কম্পোজিট মেটিরিয়াল, যা মহাকাশ নির্মাণে অপরিহার্য, তাও এই প্রক্রিয়ার অবদান।

আজকাল ধাতুচূর্ণকে রোলিং পদ্ধতিতে সরাসরি ধাতব পাতে পরিণত করবার প্রচেষ্টা কয়েকটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চলেছে। এই পদ্ধতির কয়েকটি নিজস্ব সুবিধা রয়েছে, যার মধ্যে প্রধানতম অনেকগুলি অন্তর্বর্তী প্রক্রিয়ার বিলুপ্তিসাধন। তামা আর নিকেলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সুদূরপ্রসারী। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় নিকেলের মুদ্রা প্রস্তুতে ধাতুচূর্ণের রোলিং পদ্ধতির ব্যবহার আছে।

ভারতে চূর্ণধাতু-প্রযুক্তিবিদ্যা এখনও শৈশবাবস্থায়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি সংস্থা এই প্রক্রিয়ায় ধাতব অংশাদি নির্মাণে ব্রতী আছে। তবে ভারতে এই প্রক্রিয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় নির্মিত বহুবিধ যন্ত্রাংশ বহু বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আমরা আমদানী করে থাকি, যেগুলি বহুলাংশে জাতীয় উদ্যমে এদেশেই তৈরি করা সম্ভব। ভারতের ধাতুবিদ্ আর শিল্পপতিরা আজ সেই সম্ভাবনার কথাই বিশেষভাবে অনুভব করতে সুরু করেছেন।

# বিজ্ঞান-সংবাদ

## যকৃতের চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতি

যকৃতের গোলমাল হলে নানারকম অসুখ দেখা দেয়। তাই যকৃৎকে যদি চোখে দেখবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ডাক্তারদের পক্ষে চিকিৎসা করবার সুবিধা হবে। অনেক চিন্তা করে পশ্চিম জার্মেনীর দু-জন ডাক্তার ডুবো-জাহাজের পেরিস্কোপের মত এক যন্ত্র বানিয়েছেন। এই যন্ত্রের নাম দিয়েছেন তারা ল্যাপারো-স্কোপ। রোগীর পেট দেড় সেন্টিমিটারের মত কেটে আয়নার মত এই যন্ত্রটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এর সঙ্গে জোড়া থাকে একটি বিশেষ ধরণের রঙীন টেলিভিশন ক্যামেরা। যকৃতের ছবি তুলে কাচ-তন্তুর তার দিয়ে ক্যামেরাটি পর্দার উপর ছবি পাঠায় আর তখন ডাক্তারেরা তন্নতন্ন করে পর্যবেক্ষণ করেন আসলে গোলমালটা কোথায় এবং রোগ নির্ণয় হলে ঠিকমত ওষুধ পড়বে, ফলে রোগও তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

## নতুন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ

বন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাবলিউ. গ্রোথ ও তাঁর সহকর্মীরা মিলে এক নতুন উপায়ে বর্তমানে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার চেয়ে দশ গুণ কম খরচে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করবার উপায় আবিষ্কার করেছেন।

খাদ্যবস্তুকে একটি কামরায় রেখে খুব আস্তে গ্যাস ও বাতাস ছাড়া হয়। ফলে খুব জোর বা কম তাপ কিম্বা অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব খাদ্যকে নষ্ট করতে পারে না। শুকনো ঘরের ছোট ছোট গ্যাস বুদ্‌বুদ্‌গুলিকে এবার বাষ্প দিয়ে ভরে শোষণ উপাদান দিয়ে পূর্ণ দ্বিতীয় কামরায় পাঠানো হয়, যেখানে ঐ গ্যাস আর এক দফা শুকনো করা হয়। তারপর ঐ গ্যাসকে একটি ফিল্টারের মাধ্যমে প্রথম কামরায় কয়েক বার চালালে খাদ্যবস্তুর সমস্ত জল আস্তে আস্তে টেনে নেয়। অবশেষে যেটা পড়ে থাকে, সেটা একটা মিহি পাউডারের মত পদার্থ হলেও তাতে খাদ্যের যাবতীয় ভিটামিন ও পুষ্টিকর উপাদান পুরা বজায় থাকে।

শুক্‌নো অন্যান্য পদ্ধতিতে জান্তব প্রোটিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদানের যে বিপুল অপচয় হয়, নতুন পদ্ধতিতে তা সম্পূর্ণ এড়ানো যাবে। ভারতে এই পদ্ধতিতে প্রায় পঞ্চাশটি শুক্‌নো কামরা চালালে বিদেশে গুঁড়া ফল চালান করেই বছরে ৯০০ ডলার রোজগার করা যায়। আর শুধু ফল কেন ডিম, দুধ, মাছ, আলু, মাখন সবই এভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

## শক্তিশালী জীবাণুনাশক

আড়াই বছর ধরে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লণ্ডনে জীবাণুর বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নতুন হাতিয়ারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বিচিত্র ধরণের জীবাণুর বিরুদ্ধে এটি কার্যকরী হবে।

বারোজ ওয়েলকাম-এর এই নতুন ওষুধের নাম দেওয়া হয়েছে সেপ্‌ট্রিন (Septrin)। এটি জীবাণুনাশক কিন্তু অ্যাণ্টিবায়োটিক নয়। টিমেথোপ্রিম ও সালফোনামাইড গোষ্ঠীর একটি রাসায়নিকের সমন্বয়ে এই নতুন ওষুধটি প্রস্তুত।

ব্রঙ্কাইটিস ও মূত্রনালীর জীবাণু সংক্রমণে প্রতিদিন দুটি করে সেপ্‌ট্রিন ট্যাবলেট গ্রহণ করলে পাঁচ দিনে নিরাময় হতে দেখা গেছে। এই ট্যাবলেট গ্রহণে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না বা রোগীর-দেহে অন্য উপসর্গ দেখা দেয় না।

জীবাণু সনাক্তকরণ ছাড়াও এই ওষুধ রোগীকে দেওয়া যেতে পারে এবং শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ রোগী আরোগ্য লাভ করে পাঁচ দিনের মধ্যে। বাকী ১০ বা ২০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে আরও চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়।

# পরলোকে রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন

৩রা মে '৬৯ শনিবার বেলা ১১টা ২০মিনিটে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেনের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে।

ডক্টর জাকির হোসেন ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি। ১৯৬৭ সালের ১৩ই মে তিনি রাষ্ট্রপতিরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন।

ডাঃ হোসেন ১৮৯৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হায়দরাবাদের এক পাঠান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ হোসেনের পরিবার বহু শতাব্দী যাবৎ উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার কোয়াইগঞ্জে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

ডাঃ হোসেনের পিতা ছিলেন একজন আইনজীবী। ডাঃ হোসেনের আট বছরের সময় তাঁর পিতা উত্তর প্রদেশের এটাওয়ায় চলে আসেন। তাঁর বিদ্যালয়জীবন এটাওয়ার ইসলামিয়া হাই স্কুলে অতিবাহিত হয়। এর পর তিনি আলিগড় এম.এ.ও. কলেজে যোগদান করেন। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অসহযোগ আন্দোলন সুরু হবার পর ডাঃ হোসেন আইন পড়া ছেড়ে দেন এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া (মুসলিম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) স্থাপনে সাহায্য করেন এবং সেখানকার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

জামিয়া মিলিয়ায় দুই বছর শিক্ষাদানের পর ১৯২২ সালে ডাঃ হোসেন বৃটেনে যাবার ছাড়-পত্র নিয়ে ভারত ত্যাগ করেন, কিন্তু জাহাজ ইটালী বন্দরে ভিড়লে তিনি সেখানে থেকে যান এবং সেখান থেকে জার্মেনী যাবার ব্যবস্থা করেন। জার্মেনীতে প্রথমে তিনি তিন সপ্তাহ থাকবার অনুমতি লাভ করেন, কিন্তু পরে তার মেয়াদ তিন বছর বর্ধিত হয়।

ডাঃ হোসেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তিনি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি রচনা এবং বক্তৃতা প্রদানে প্রবৃত্ত হন। ডাঃ হোসেন গালিবের কাব্যসংগ্রহ দেওয়ান-ই-গালিব প্রকাশ করেন। তিনি সঙ্গীত ও চিত্রকলারও কিছু চর্চা করেছিলেন।

জার্মেনীতে থাকবার সময় ১৯২৪ সালে ডাঃ হোসেন জানতে পারেন যে, অর্থাভাবে জামিয়া মিলিয়া বন্ধ হতে চলেছে। তখন তিনি এর পরি-চালকদের নিকট অনুরোধ জানান—তিনি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু জামিয়া মিলিয়ার কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত করেছেন। সুতরাং তাঁরা ভারতে না ফেরা পর্যন্ত যেন জামিয়া মিলিয়া বন্ধ করা না হয়। জামিয়া মিলিয়া বন্ধ হলো না। ১৯২৫ সালে জামিয়া মিলিয়া আলিগড় থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় এবং গান্ধীজী অর্থ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯২৬ সালে ভারতে ফিরে এসে ডাঃ হোসেন জামিয়া মিলিয়ার উপাচার্যের পদে নিযুক্ত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯ বছর। দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ তিনি এই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় জামিয়া মিলিয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে।

ডাঃ হোসেন এবং তাঁর সহকর্মীরা ভারতে বৃটিশরাজ থাকা পর্যন্ত জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া থেকে প্রতি মাসে অনধিক ১০০ টাকা বেতন

নেবার সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। শৈশবেই ছাত্রদের মধ্যে মানবিক শিক্ষার ভিৎ স্থাপন করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

ডাঃ হোসেনের বাগান করবার খুব সখ ছিল—অবসর সময়ে তিনি এই কাজ তদারক করতেন। জামিয়া মিলিয়ার ফুলের গাছ, লতা-গুল্ম ও তৃণাচ্ছাদিত উদ্যান বলতে গেলে তাঁরই হাতের তৈরী। জীবাশ্ম, চিত্র ও প্রস্তর সংগ্রহের সখ ছিল ডাঃ হোসেনের। সময় পেলেই ডাঃ হোসেন নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি রচনা করতেন। এবং ছোটদের জন্যেও লিখতেন। প্লেটোর 'রিপাব্লিক' গ্রন্থটি তিনি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন। "এডুকেশন রিকনষ্ট্রাকশন ইন ইণ্ডিয়া" এবং এডউইন ক্যাননন-এর "এলিমেণ্টস্ অব ইকনমিক্স" পুস্তকও তিনি অনুবাদ করেছেন।

১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন চালু হয়—গান্ধীজি তখন তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করবার কথা সরকারকে বলেন। গান্ধীজি ডাঃ হোসেনকে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধীয় জাতীয় কমিটির সভাপতিত্ব করবার জন্যে আহ্বান জানান। এই কমিটির কাজ ছিল বুনিয়াদী শিক্ষার বাস্তব পরিকল্পনা রচনা করা।

দেশ স্বাধীন হবার পর তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ডাঃ হোসেনকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ জানান। ১৯৪৮ সালে ডাঃ হোসেন এই পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকবার সময় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কমিশন এবং প্রেস কমিশনের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৫২ সালে ডাঃ হোসেন রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে তিনি বিহারের রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ইউনেস্কোতে (UNESCO) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৫৬-'৫৮ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার কার্যনির্বাহক বোর্ড-এর সদস্য ছিলেন।

১৯৬২ সালে তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতির পদাধিকার বলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হিসাবে ডাঃ হোসেন সকলের কাছ থেকে প্রশংসা ও সম্মান অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি ভারতরত্ন উপাধি লাভ করেন।

১৯৬৭ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন।

# কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

## জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৬৯

২২শ বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
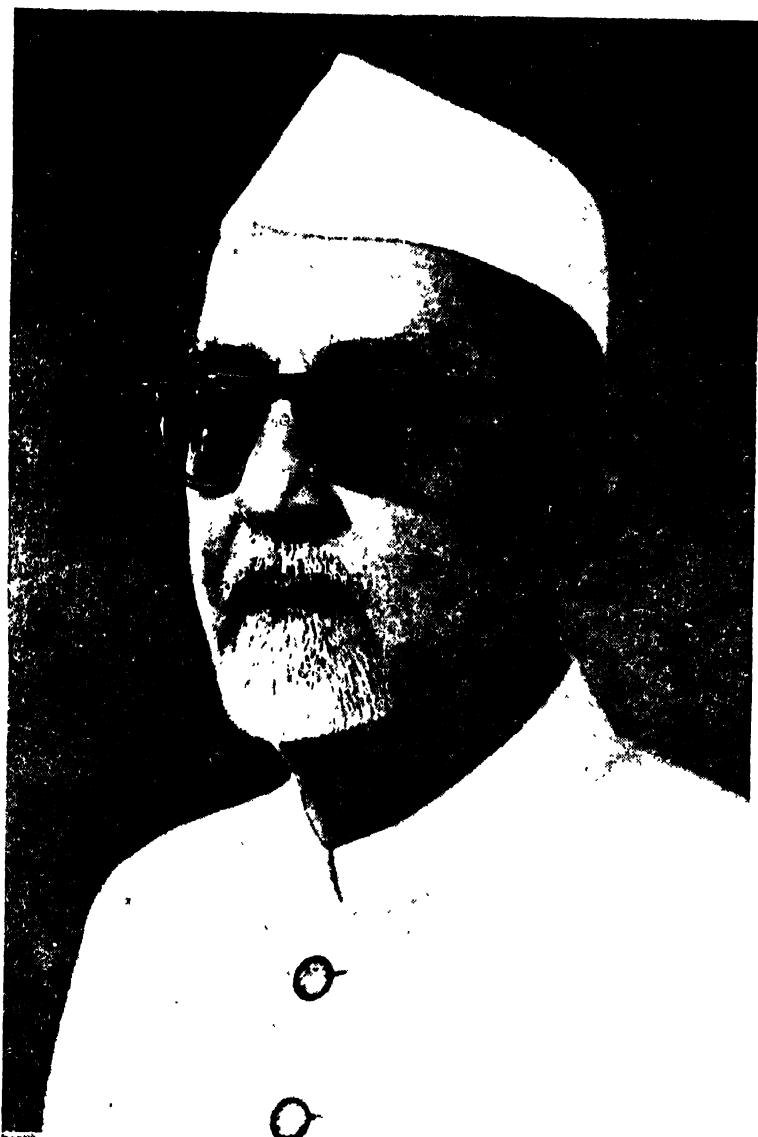
ডাঃ জাকির হোসেন

জন্ম—৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ মৃত্যু—৩রা মে, ১৯৬৯

# যে শব্দ শোনা যায় না

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস ও অ্যারিষ্টটলের সময় থেকেই শব্দের গতি-প্রকৃতি নিয়ে পর্যবেক্ষণ সুরু হয়। বলতে গেলে অ্যারিষ্টটলই শব্দ-তরঙ্গের আবিষ্কর্তা। গ্যালিলিওর ( ১৫৬৪-১৬৪২ ) সময় থেকেই এই বিষয়ে জোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। তারপর নিউটন ( ১৬৪২-১৭২৭ ) গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে ব্যাপারটা আরো এক ধাপ এগিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, শব্দ-তরঙ্গ এক প্রকার শক্তি এবং এই তরঙ্গ যে কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের সাহায্যে প্রবাহিত হতে পারে। সেকেণ্ডে ১৬ থেকে ১৬০০০ তরঙ্গবিশিষ্ট শব্দই আমরা কানে শুনতে পাই। যে শব্দের তরঙ্গ সেকেণ্ডে ১৬০০০-এর বেশী, তাদের বলা হয় আলট্রাসনিক (Ultrasonic)। এই উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দের আজকাল বহুল ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। সাধারণ শব্দের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো—এর কম্পনাঙ্ক অনেক বেশী, তাই এর শক্তিও অনেক বেশী। হিসাব করে দেখা গেছে, একজন লোক যদি ১৫০ বছর ধরে সমানে কথা বলে চলে তবে তাথেকে যে শক্তির উদ্ভব হবে, তাতে বড় জোর এক কাপ জল গরম করা যায়, অপর দিকে এই আলট্রা-সনিক তরঙ্গ জলের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা ডিম সিদ্ধ করা যেতে পারে। তুলনামূলক বিচারে এর শক্তি কিরূপ তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

আলট্রাসনিক তরঙ্গের দ্বারা অনেক কিছু হচ্ছে। ধাতব পাত্ কিংবা রবারের টায়ারের মধ্যে কোথাও ফাঁপা জায়গা আছে কিনা, এর সাহায্যে তা সহজেই ধরা যায়। সমুদ্রের বুকে সঙ্কেত পাঠানো, সমুদ্রের নীচে সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয়, মাটির নীচে খনিজ পদার্থের সন্ধান, রেডার, টেলিভিশন, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ—সব কিছুই আজকাল হচ্ছে আলট্রাসনিক তরঙ্গের সাহায্যে। এমন কি, ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার খুব কম নয়। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে এর ব্যবহার তো আছেই! এমন সব যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে, যার সাহায্যে কোন পদার্থকে কেটে যেমন খুশী জটিল আকার দেওয়া যেতে পারে। ঝাংঝাল দেওয়া বা ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রোপ্লেটিং থেকে সুরু করে কাপড় কাচা বা রং করা—সবই হচ্ছে আজকাল এই আলট্রাসনিক তরঙ্গের সাহায্যে।

যে কম্পনাঙ্ক আমাদের দরকার, ইলেকট্রনিক অসিলেটরে সেই কম্পনাঙ্ক প্রথমে সৃষ্টি করে তাকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় Transducer-এর সাহায্যে। Transducer-টা যখন কোন মাধ্যমের কাছে রাখা হয়, তখন তার কম্পনের ফলে মাধ্যমে একটা তরঙ্গ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কোয়ার্ট্জ্ জাতীয় কতকগুলি

কেলাসে (Crystal) বিজ্ঞানীরা এক অদ্ভুত ধর্ম লক্ষ্য করেছেন। কেলাসের বিপরীত তলে বৈদ্যুতিক বিভবের প্রভেদ সৃষ্টি করলে এর আকারের কিছু বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা যদি সব সময় সমান না হয়, তাহলে স্বভাবতঃই কেলাসের আকারও বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মধ্যে যদি স্পন্দন (Pulse) সৃষ্টি করা যায়, তবে কেলাসের মধ্যেও একটা কম্পন অনুভূত হয় এবং উভয়ের কম্পনাঙ্কই সমান হয়। তাছাড়া কতকগুলি পদার্থ আছে, যেগুলিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে গেলে তাদের আকারের কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পদার্থগুলিকেও আমরা Transducer হিসাবে কাজে লাগাতে পারি।

সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, ঘড়ির পার্টস, যন্ত্রপাতির গীয়ার (Gear), বল পয়েণ্ট পেন প্রভৃতি পরিষ্কারের কাজে আলট্রাসনিক তরঙ্গ আজকাল হামেশাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হাসপাতালের অপারেশনের যন্ত্রপাতিগুলিও আজকাল এইভাবে পরিষ্কার করা হয়। আলট্রাসনিক তরঙ্গে যে Cavitation-এর সৃষ্টি হয়, তার ফলেই এসব সম্ভব হয়ে থাকে। এই Cavitation জিনিষটা কি? শব্দ তরঙ্গ যখন কোন মাধ্যমে প্রবাহিত হয়, তখন সেই মাধ্যমের অণুগুলি পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে উচ্চচাপ ও নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। এই শব্দ-তরঙ্গকে যদি কোন তরলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়, তাহলে নিম্নচাপের জায়গার তরল গ্যাসীভূত হয়ে বুদ্‌বুদের আকার ধারণ করে। পরক্ষণেই বুদ্‌বুদ্‌গুলি ফেটে যায়, আর এই ফেটে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয় এক প্রচণ্ড চাপ—বায়ুমণ্ডলের চাপের কয়েক-শ' গুণ। সঙ্গে সঙ্গে তরলের তাপমাত্রাও অনেক বেড়ে যায়। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ময়লাগুলিও এর ফলে পৃথক হয়ে পড়ে। আলট্রাসনিক বার্নারও ব্যবহার করা হচ্ছে আজকাল। কয়লা বা ধোঁয়ার কোন ঝামেলা নেই সেখানে। Transducer-টা খুব সরু ছিদ্রযুক্ত একটা নলের সঙ্গে লাগানো থাকে, যার মধ্য দিয়ে জ্বালানী তেল সরবরাহ করা হয়। Transducer-এর কম্পনে জ্বালানী তেল খুব ছোট ছোট কণায় ভেঙে গিয়ে ধোঁয়ার মত হয়ে যায়। এটা সহজেই জ্বলে আর তাথেকেই তাপের সৃষ্টি হয়।

ধাতব পাত্‌ বা রবারের টায়ারের মধ্যে কোন স্থান ফাঁপা রয়েছে কিনা, সেটা দেখবার জন্যে পরীক্ষাধীন পদার্থটিকে দুটা Transducer-এর মাঝখানে বসানো হয়—এর একটি প্রেরক-যন্ত্র অপরটি গ্রাহক-যন্ত্র। গ্রাহক-যন্ত্রটি একটি কম্পন-নির্দেশক যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো থাকে। প্রেরক-যন্ত্রের তরঙ্গ আমরা হুবহু দেখতে পাব গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দায়। পরীক্ষাধীন পদার্থের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে তা তরঙ্গের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করে। গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দার নিশানা থেকে সেটা আমরা সহজেই ধরতে

পারবো। সমুদ্রের নীচে কয়লার স্তর অনুসন্ধানের কাজেও বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন।

জিনিষপত্র শুকাবার কাজেও আলট্রাসনিক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। কোন তরলের বাষ্পীভবন নির্ভর করে তার চারদিকের বায়ুর চাপ আর তরলের উপরকার বায়ু-প্রবাহের উপর। চাপ যত কম হবে, বাষ্পীভবন হবে ততই দ্রুত আর বায়ুর প্রবাহ যত বেশী থাকবে, বাষ্পীভবনও হবে তত তাড়াতাড়ি। কোন ভিজা জিনিষের উপর দিয়ে যখন আলট্রাসনিক তরঙ্গ পাঠানো হয়, তখন বাতাসের স্তরে স্তরে উচ্চ চাপ ও নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়। এই নিম্নচাপ খুব কম না হলেও ব্যাপারটা ঘটে খুব দ্রুত গতিতে—সেকণ্ডে কয়েক হাজার বার। ফলে এটা কাজ করে একটা পাম্পের মত। তাছাড়া উপরকার বাতাসে ছোট-বড় যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তার ফলে বাতাস ও জলীয় বাষ্পের মধ্যে সংমিশ্রণটা হয় খুব সহজে—বাষ্পীভবনও হয় দ্রুতগতিতে। কাচ শিল্পে, রাসায়নিক দ্রব্য নির্মাণে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধ জাহাজে আলট্রাসনিকের ব্যবহার ছিল। এর সাহায্যে শত্রুপক্ষের সাবমেরিনের অবস্থান নিরূপণ করা হতো। সাবমেরিনে প্রতিফলিত শব্দ-তরঙ্গ থেকে সাবমেরিনের আকৃতি ও অবস্থান সবই নির্ধারণ করা সম্ভব হতো।

চোর ধরবার যন্ত্র নির্মাণেও আলট্রাসনিককে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রেরক-যন্ত্র থেকে একটা নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্কে শব্দ-তরঙ্গ পাঠানো হয়। শব্দ-তরঙ্গ ঘরের ছাদ ও দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট শক্তি নিয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে সাড়া জাগায়। ঘরের কোথাও কোন অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলনেও বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে গ্রাহক-যন্ত্রও সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি পায় না। এথেকে সহজেই একটা সঙ্কেত সৃষ্টি করা সম্ভব। এই একই উপায়েই এক প্রকার যন্ত্র তৈরি করা চলে, যার সাহায্যে কোথাও আগুন লেগেছে কিনা, সেটা তখনই জানতে পারা যাবে।

কারিগরী শিল্পের ক্ষেত্রে আলট্রাসনিকের ব্যবহার এনে দিয়েছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই দিকে দিকে এর ব্যবহার বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক শিল্প-সংস্থা এই সব যন্ত্রপাতি নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে এর ব্যবহার সবে সুরু।

উদিতা চৌধুরী

# চুম্বক আবিষ্কারের কাহিনী

প্রাচীন কালে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জানতে পেরেছিল যে, এক টুক্‌রা এবোনাইট বা রজনকে উলের দ্বারা ঘর্ষণ করে তার কাছে যদি কোন হাল্‌কা বস্তু আনা হয়, তাহলে হাল্‌কা বস্তুগুলি নাচতে নাচতে এবোনাইট বা রজনের দিকে ছুটে আসে।

সে সময়ে মধ্য এশিয়ার ম্যাগ্‌নেশিয়া প্রদেশে এক রকম পাথর পাওয়া যেতো, যেগুলি লোহার টুক্‌রা আকর্ষণ করতে পারতো। ঐ প্রদেশের নাম অনুসারে ওই পাথরকে বলা হতো ম্যাগ্‌নেটাইট।

মানুষ চিরদিনই খেয়ালী। তাই সে একদিন ওই ম্যাগ্‌নেটাইটকে সুতায় ঝুলিয়ে অবাক হয়ে দেখলো, পাথরটা এদিক-ওদিক কয়েক বার পাক খেয়ে একদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। যতবার যত জোরেই তাকে ঘোরানো হলো ততবারই পাথরটির দুটি মুখ ঠিক দুটি নির্দিষ্ট দিকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। বৈজ্ঞানিকেরা পাথরটির এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে দু'টি মুখের আলাদা আলাদা নাম দেন। তাঁরা উত্তর দিকের মুখকে বললেন উত্তর মেরু বা North pole এবং দক্ষিণ দিকের মুখকে বললেন দক্ষিণ মেরু বা South pole।

এর পর বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের নজরে পড়লো ওই ম্যাগনেটাইট পাথরটি। তিনি পাথরের এই বিস্ময়কর আচরণ লক্ষ্য করে সেই পাথরের সাহায্যে উদ্ভাবন করেন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র—যা সমুদ্রপথের দিশাহারা নাবিকদের পক্ষে সঠিক দিক নির্ণয়ের সহায়ক হলো।

তাছাড়া সে যুগের বৈজ্ঞানিকেরা ওই পাথর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ওই পাথরের দ্বারা অন্য লোহার টুক্‌রাকে ঘর্ষণ করলে সেটিও অনুরূপ আকর্ষণ শক্তি লাভ করে। একেই বলা হয় চৌম্বক শক্তি। শুধু তাই নয়, সেই লোহার টুক্‌রাটাকে যদি আরও ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা হয়, তাহলে তাদের মুখও নির্দিষ্ট দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। এটাই হলো প্রতিটি ম্যাগ্‌নেটের ধর্ম।

বৈজ্ঞানিকেরা তখন এই নিয়ে রীতিমত গবেষণা সুরু করলেন। একটা টেবিলের উপর লোহার চূর্ণ ছড়িয়ে তার মধ্যে একটি ম্যাগ্‌নেট রেখে দেখলেন—লোহার চূর্ণগুলি সারিবদ্ধভাবে এক-একটি রেখায় দাঁড়িয়ে পড়লো। বৈজ্ঞানিকেরা এই

রেখাগুলির নাম দিলেন চৌম্বক রেখা। ক্রমশঃ ম্যাগ্‌নেটের নানা সংস্করণ হলো। একটি জোরালো ম্যাগ্‌নেটকে টেবিলের উপর সাদা কাগজে বসিয়ে তার একটি মুখের নিকট ঘড়ির কাঁটার মত ছোট একটি চুম্বকের কাঁটা রাখা হলো। তারপর কাঁটা যেই ঘুরলো, তখনই একটি দাগ কাটা হলো। এভাবেই বৈজ্ঞানিকেরা চুম্বকের আচরণ লক্ষ্য করে চৌম্বক ক্ষেত্রের (Magnetic field) মানচিত্র তৈরি করেন।

তারপর তড়িৎ-শক্তির দ্বারা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হবার ফলেই তড়িৎ-বিজ্ঞানের নব অধ্যায়ের সূচনা হলো।

সুনীল সরকার

# ক্যালকুলাসের জনক—লাইব্‌নিজ

আজকের দিনে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে চমকপ্রদ যে সব ঘটনা একের পর এক সংঘটিত হয়ে চলেছে, তার মূলে কলনশাস্ত্র বা ক্যালকুলাসের যে একটি বড় রকমের ভূমিকা রয়েছে, তা আমাদের অজানা নয়। এই ক্যালকুলাসের উদ্ভাবক হিসেবে যে দু-জনের নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে, তাঁরা হলেন উইলহেল্‌ম্‌ গটফ্রীড লাইব্‌নিজ এবং নিউটন। এখানে আমরা লাইব্‌নিজের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বিশ্বের ইতিহাসে লাইব্‌নিজের মত এমন বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তির সন্ধান খুব বেশী পাওয়া যায় না। আইন, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত ইত্যাদি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৬৪৬ সালের ২১শে জুন ( মতান্তরে ১লা জুলাই ) জার্মেনীর লাইপ্‌জিগ শহরে তাঁর জন্ম হয়। লাইব্‌নিজ যখন লাইপ্‌জিগের নিকোলাই স্কুলে ভর্তি হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র চার বছর। কিন্তু ছয় বছর বয়সে বাবাকে হারাবার পর বাড়ীতে তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক হন। জ্ঞানার্জনের বাসনা তাঁর তখন প্রবল। কিন্তু হলে কি হবে, ভাষা একটি বড় প্রতিবন্ধক। ঐ বয়সে জার্মান ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানা নেই, তাই হাতের কাছে জার্মান ভাষায় লেখা কোন বই পেলেই আদ্যন্ত পড়ে ফেলেন। জার্মান ভাষায় লেখা বই পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাষা শিক্ষাও চলতে থাকে সমান তালে। আট বছর বয়সেই ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর লাইব্‌নিজের গ্রীক ভাষা শিক্ষা সুরু হয়।

বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে পনেরো বছর বয়সে লাইবনিজ আইন পড়বার

জন্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানেই তিনি ফ্রান্সিস বেকন, কার্ডান, গ্যালিলিও, ডেকার্তে প্রমুখ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। এঁদের চিন্তাধারা লাইব্‌নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিছুদিনের মধ্যেই আইন পড়া স্থগিত রেখে তিনি গণিতবিদ্যা অধ্যয়ন সুরু করেন। কুড়ি বছর বয়সে আবার আইন পড়ায় মনোনিবেশ করেন এবং কিছুকালের মধ্যেই ডক্টর অব্‌ ল ডিগ্রির জন্মে আবেদন করেন। কিন্তু বয়স কম হওয়ায় সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। এতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন। জন্মস্থান লাইপ্‌জিগ শহর চিরদিনের জন্মে পরিত্যাগ করে লাইব্‌নিজ আলত্‌দর্ফে চলে আসেন। এখানে ঐ ডিগ্রি পেতে তাঁর কোন অসুবিধা তো হলোই না, উপরন্তু অনতিবিলম্বে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্মে অনুরুদ্ধ হলেন। মনঃপূত না হওয়ায় অবশ্য সে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখান করেন।

এবারে লাইব্‌নিজ গণিত, দর্শন, আইন প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত হন। শোনা যায়, একবার ট্রেনের কামরায় বসেই আইন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। অনেকের মতে, এই একটি প্রবন্ধেই আইন সম্পর্কে লাইব্‌নিজের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

এর কিছুকাল পরে লাইব্‌নিজ ফ্রান্সে যান। ফ্রান্সে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে থাকলেও রাজনীতি কখনই তাঁর বিজ্ঞানী মনকে চাপা দিতে পারে নি। তাঁর বিজ্ঞানী মন নব নব আবিষ্কারে সতত নিয়োজিত থাকতো। একবার তিনি এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যার সাহায্যে একাধিক রাশির গুণ, ভাগ ও বর্গমূল ইত্যাদি অনায়াসে নিষ্পন্ন করা যেত। লাইব্‌নিজের প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৬৭৩ সালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে সদস্য মনোনীত করেন।

লণ্ডনে থাকবার সময় রবার্ট বয়েল, জন পেল প্রমুখ দিক্‌পাল গণিতবিদ্‌দের সঙ্গে লাইব্‌নিজের পরিচয় হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময়েই গণিত সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা নতুন খাতে বইতে সুরু করে। ঐ বছরেই প্যারিসে ফিরে এসে তিনি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হাইজেনের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর জ্যামিতি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। কিছুকাল পরেই গণিতের রাজ্যে যুগান্তর সাধিত হয়—আবিষ্কৃত হয় ডিফারেন্সিয়াল ও ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস। এই আবিষ্কার লাইব্‌নিজকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। অবশ্য ঐ একই সময়ে ইংল্যাণ্ডে নিউটনও স্বতন্ত্রভাবে বিষয়টির উদ্ভাবন করেন। উভয়ে যখন একই বিষয় নিয়ে গবেষণাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একে অপরের গবেষণার কথা জানতেন না। বৃটিশ গণিতবিদ্‌দের দাবী, আবিষ্কারের কৃতিত্বের সিংহভাগ নিউটনের প্রা:,, কারণ বিষয়টি সম্পর্কে নিউটন অনেক আগেই

চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ্যে তা তখন প্রকাশ করেন নি। বৃটিশ গণিতবিদেরা যাই বলুন, অধিকাংশ ব্যক্তির মতে এই আবিষ্কারের জন্যে উভয়েই সমকৃতিত্বের অধিকারী।

প্যারিসে ফিরে আসবার তিন বছর পরে লাইব্‌নিজ ব্রান্সউইকের ডিউকের অনুরোধে গ্রন্থাগারিকের চাকুরি নিয়ে হ্যানোভারে চলে যান। অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশ কালই লাইব্‌নিজ ব্রান্সউইকের রাজপ্রাসাদে গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির অনুরোধে তিনি ব্রান্সউইকের রাজপরিবারের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ সুরু করেন। এই কাজের জন্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁকে দীর্ঘ তিন বছরব্যাপা দক্ষিণ জার্মেনী পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল। এতে কিন্তু তাঁর একটা সুবিধা হয়ে যায়। পরে যখন আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে এক গবেষণামূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন, তখন ঐ দলিলপত্র তাঁকে প্রভূত সহায়তা করে।

কিন্তু লাইব্‌নিজের জন্যে বোধ হয় দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছিল। একটানা ষোল বছর চাকুরি করবার পর যে কারণেই হোক, রাজপরিবারের লোকেরা লাইব্‌নিজকে তাঁর কাজের অনুপযুক্ত মনে করতে লাগলেন। এরূপ মনে করবার দলে স্বয়ং ডিউকও ছিলেন। এপর্যন্ত যে সম্মান এবং শ্রদ্ধা লাইব্‌নিজ পেয়ে আসছিলেন, সেই সম্মান এবং শ্রদ্ধায় ভাঁটা পড়তে দেখে তাঁর মন আহত হলেও তাঁর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ তিনি কখনো করেন নি। তাঁর মতে—দুঃখ, দৈন্য, দুর্বিপাক সব ঈশ্বর-প্রদত্ত—এগুলিকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র হলেও একজনের নিকট লাইব্‌নিজ ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়। তিনি ইংল্যাণ্ডের অধিপতি প্রথম জর্জের ভগ্নী সোফিয়া শার্লট। এঁর সঙ্গে লাইব্‌-নিজের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মায়। এই বন্ধুত্বই ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়। রাজপরিবারের ভিতরে ও বাইরে সোফিয়ার ছিল অপরিসীম প্রভাব। এই বিদুষী মহিলার প্রচেষ্টায় ১৭০০ সালে বার্লিন অ্যাকাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে লাইব্‌নিজই হন তার প্রথম সভাপতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই অ্যাকাডেমী প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরেই পৃথিবী থেকে সোফিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করেন। সোফিয়ার মৃত্যু লাইব্‌নিজের অন্তরে নিদারুণ আঘাত হানে। শোকজর্জর হৃদয়ে বার্লিন ত্যাগ করে তিনি দু-বছর ভিয়েনায়

থাকেন। কিন্তু সেখানেও শান্তি পেলেন না। ঠিক এই সময়েই আবার একদল গণিতবিদ্ দাবী তোলেন, লাইব্‌নিজের আগেই নিউটন ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেছেন। অতএব লাইব্‌নিজের এতে কোন কৃতিত্ব নেই। লাইব্‌নিজ এতে খুবই ব্যথিত হন। এসব অসহনীয় ঘটনাবলীই তাঁর শেষ জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। ভগ্নহৃদয়ে এই মানুষটি জার্মেনীর হ্যানোভারে ১৭১৬ সালের ১৪ই নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ একজন ছাড়া তাঁর মৃত্যুতে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন করবার মত আর কেউ ছিলেন না। অদ্বিতীয় সেই ব্যক্তি হলেন একান্ত সচিব ফন একহার্ট।

ব্যক্তিগত জীবনে লাইব্‌নিজ অত্যন্ত সদালাপী ও বিনয়ী ছিলেন। সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও প্রত্যেকের মতামতকে তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন। শেষ জীবনে অর্থের প্রতি তাঁর নাকি অত্যন্ত আসক্তি জন্মেছিল। কিন্তু প্রথম জীবনে অর্থের প্রতি তাঁর যে বিশেষ মোহ ছিল না, তাঁর কার্যাবলীতেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যে সব উদ্ভাবন করেছিলেন, অনায়াসেই তার দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি।

লাইব্‌নিজ অদ্ভুত কর্মঠ পুরুষ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও মুহূর্তের জন্যে বিশ্রাম নেবার কথা কখনো তিনি চিন্তা করেন নি, নিত্য নব আবিষ্কারে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। কথিত আছে, যখন তিনি ট্রেনে বা বাসে ভ্রমণ করতেন, তখনও বিভিন্ন জটিল গাণিতিক সমস্যাবলী সমাধানে মগ্ন থাকতেন। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়, এই লাইব্‌নিজ জীবদ্দশায়, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে প্রায় অনাদর ও উপেক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। আজকের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা তাঁর প্রতিভার পরিমাপ করছেন।

সঞ্জীবকুমার ঘোষ

# ঈস্ট

ঈস্ট মৃতজীবী ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। ইহা শর্করা জাতীয় দ্রব্যে, যেমন—আঙুর, খেজুর ইত্যাদির রসে জন্মায়।

ঈস্ট এককোষী উদ্ভিদ, আকারে অনেকটা ডিম্বাকৃতি। ইহাদের কোষ-প্রাচীর অতি সূক্ষ্ম। কোষের মধ্যে দানাদার সাইটোপ্লাজম ও একটি নিউক্লিয়াস থাকে। ঈস্টের নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি বড় ভ্যাকুয়োল দেখা যায়। নিউক্লিয়াসের এই ভ্যাকুয়োলটি কেবলমাত্র নিউক্লীয় জালিকার দ্বারা পূর্ণ থাকে বলিয়া ইহাকে নিউক্লীয় ভ্যাকুয়োল বলে। গ্লাইকোজেন, প্রোটিন এবং তৈলবিন্দু সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যরূপে থাকে।

ঈস্ট প্রধানতঃ শর্করা জাতীয় দ্রব্যকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। শ্বাসকার্যের জন্যে ঈস্টের কোন বিশেষ যন্ত্র নাই। সমগ্র কোষটি এই কার্যে অংশগ্রহণ করে এবং সব সময়ে গ্যাসের আদান-প্রদান চলিতে থাকে।

ঈস্ট আর একটি উপায়ে শ্বাসকার্য চালায়। ইহাকে সন্ধান-প্রক্রিয়া (Fermentation) বলে। এই সময়ে ইহারা শর্করা জাতীয় দ্রব্যকে কোহল ও অঙ্গারাম্ল গ্যাসে পরিবর্তিত করে এবং উৎপন্ন শক্তিকে জীবনধারণের কাজে লাগায়। রেচনক্রিয়ার জন্যে কোন বিশেষ যন্ত্র না থাকিলেও ঈস্ট-কোষের দূষিত পদার্থগুলি সূক্ষ্ম কোষ-প্রাচীরের মধ্য দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ঈস্ট তিনটি পদ্ধতিতে প্রজনন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে, যথা—(১) অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction), (২) অযৌন জনন (Asexual reproduction), (৩) যৌন জনন (Sexual reproduction)।

(১) অঙ্গজ জনন (Vegetative reproduction):—অনুকূল অবস্থায় ঈস্ট মুকুলোদ্‌গম প্রক্রিয়ার দ্বারা অঙ্গজ জননক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই সময় কোষের কোন একটি স্থান হইতে একটা ছোট স্ফীত অংশ বাহির হইতে থাকে। এই অংশটিকে মুকুল বলে। তখন ইহার নিউক্লিয়াসটি অনেকটা ডাম্বেলের মত আকার ধারণ করে। ইহার পর নিউক্লিয়াসটি দুইটি অসমান অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। বড় অংশটি মাতৃকোষে থাকিয়া যায় এবং ছোট অংশটি, কিছু সাইটোপ্লাজম ও সঞ্চিত খাদ্য মুকুলের মধ্যে চলিয়া যায়। ক্রমে মুকুল এবং মাতৃকোষের মধ্যবর্তী অংশ সঙ্কুচিত হইতে থাকে। পরে মুকুলটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মাতৃকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

(২) অযৌন জনন (Asexual reproduction):—প্রতিকূল অবস্থায় ঈস্ট অ্যাস্কোস্পোর (Ascospore) গঠন-প্রক্রিয়ার দ্বারা অযৌন পদ্ধতিতে প্রজননক্রিয়া করিয়া থাকে। এই সময় ঈস্টের দেহ-কোষটি বড় হয় এবং ইহার নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তিন বার বিভাজিত হইয়া আটটি অংশে বিভক্ত হয়। দেহ-কোষের সাইটোপ্লাজমও আটটি অংশে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস একটি করিয়া সাইটোপ্লাজম লইয়া আটটি অ্যাস্কোস্পোর প্রস্তুত করে। মাতৃকোষটিকে অ্যাস্কস (Ascos) বলে। অ্যাস্কসের কোষ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া অ্যাস্কোস্পোরগুলি বাহির হয় এবং অনুকূল পরিবেশে মুকুলোদ্গম পদ্ধতিতে প্রজননক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(৩) যৌন-জনন (Sexual reproduction):—দুইটি কোষের সংযোজনের (Conjugation) দ্বারা ঈস্টের যৌন-জনন সম্পন্ন হয়। ঈস্টের দুইটি দেহকোষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গায়ে গায়ে মিলিত হয়। এই সময় দুইটি দেহকোষের মিলনের স্থান হইতে একটি করিয়া ক্ষুদ্র অংশ বাহির হয়। পরে এই দুইটি ক্ষুদ্র অংশ পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সংযোগ নালী (Conjugation Tube) গঠন করে। এই সময় সংযোজনে লিপ্ত প্রত্যেকটি দেহকোষ হইতে নিউক্লিয়াসটি ঐ নালীতে প্রবেশ করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। উহাদের মিলনের ফলে একটি জাইগোস্পোরের সৃষ্টি হয়। ইহার পর সংযোজন নালীটি প্রশস্ত হইয়া যায়। জাইগোস্পোরের নিউ-ক্লিয়াসটি তিন বার বিভাজিত হইয়া আটটি অপত্য নিউক্লিয়াসের জন্ম দেয়। প্রত্যেকটি নিউক্লিয়াস কিছু সাইটোপ্লাজমসহ আটটি অ্যাস্কোস্পোর তৈরি করে। মাতৃকোষটিকে অ্যাস্কস বলা হয়। অবশেষে অ্যাস্কসের কোষ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া অ্যাস্কোস্পোরগুলি বাহির হয় এবং অনুকূল অবস্থায় মুকুলোদ্গম-প্রক্রিয়ায় নূতন ঈস্টের জন্ম হয়।

শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী

# প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। চৌম্বক ঝটিকা কি?

কেকা বসু, ভারতী বসু
মালদহ

প্রশ্ন ২। (ক) ডিমের উপাদান ও তার উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলুন।
(খ) ডিম ভাল কি খারাপ, বোঝবার উপায় কি?

অঞ্জলি দাসশর্মা, অমিতাভ দাসশর্মা
ও সুপ্রভা বসুমল্লিক, বোলপুর

প্রশ্ন ৩। চা-গাছ থেকে তোলা চা-পাতা এবং আমরা যে চা-পাতা চা তৈরির জন্যে ব্যবহার করি—এদের মধ্যবর্তী রূপান্তরের প্রস্তুতিপর্ব কি? মানুষের শরীরে চা-পানের প্রভাব কি?

দীপান্বিতা সেন, মাঝেরহাট
আনোয়ারা বেগম, মুর্শিদাবাদ

উঃ ১। তোমরা জান যে, একটা তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তারের চারদিকে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। সূর্য থেকে প্রতিনিয়তই তড়িদাহিত বস্তুকণা আমাদের পৃথিবীর দিকে আসছে। এই সব বস্তুকণা পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌছুলে পৃথিবীপৃষ্ঠে এক শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে (পৃথিবীর নিজের চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়াও)। যতই এই কণা পৃথিবীতে এসে পৌছায়, চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক ও শক্তি ততই পরিবর্তিত হতে থাকে। সৌরোৎপাত ও সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবের সময় এই হঠাৎ এবং অনিয়মিত পরিবর্তন বেশী দেখা যায়। এরই নাম চৌম্বক ঝটিকা। এর ফলে অনেক সময় বেতার-বার্তা ও টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

উঃ ২। (ক) পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে দুধের পরেই আমরা ডিমের নাম করতে পারি। দেহের পুষ্টি ও সুষম বৃদ্ধির জন্যে যে সব উপাদানের প্রয়োজন হয়, তাদের প্রায় সবগুলিই আমরা ডিমের মধ্যে পাই। সাধারণতঃ ডিম বলতে হাঁস অথবা মুরগীর ডিমের কথাই বলছি। হাঁস ও মুরগীর ডিমের মধ্যে সাধারণভাবে কোন প্রভেদ নেই, তবে মুরগীর ডিমে কুসুমের অংশ বেশী থাকায় এটি অপেক্ষাকৃত বেশী ফলদায়ক। ডিমের প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে ভিটামিন-বি$_২$ ভিটামিন-এ, লোহা, ফস্‌ফরাস,

প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। ডিমের সাদা অংশে জলের পরিমাণ শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশী এবং কুসুমে জলের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক। মুরগীর ডিমের কুসুমে জলের পরিমাণ হাঁসের ডিমের তুলনায় কিছু বেশী। কুসুম ও শ্বেতাংশে জলের পরিমাণ ডিমের বয়স অনুযায়ী বাড়ে, সাদা অংশে প্রোটিন শতকরা প্রায় ১০ ভাগ এবং কুসুমে ১৫ ভাগ থাকে। ডিমের কুসুমে লিভেটিন ও ভাইটেলিন নামে দুই রকম প্রোটিন পাওয়া যায়। এগুলি ছাড়াও কুসুমে এনা অয়েল, লেসিথিন ও নানারকম অজৈব পদার্থ থাকে। লেসিথিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ ডিমের সাদা অংশে প্রায় থাকে না বললেই চলে। কুসুমে এর পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ। ডিমের সাদা অংশে গ্লোবিউলিন, ওভগলবুমিন, ওভোমিউকয়েড, কোন্যালবুমিন ইত্যাদি প্রোটিন থাকে। শতকরা তিন ভাগ ছাড়া ডিমের অবশিষ্টাংশ আমাদের শরীরে মিশে যায়। লৌহঘটিত লবণ থাকায় রক্তশূন্যতা রোগে ডিম বিশেষ ফলপ্রদ। সুস্থ শরীর গঠনের জন্যে ডিম খাওয়ার প্রয়োজনীতা খুবই বেশী। তবে সহজে হজম করবার জন্যে আধা সিদ্ধ ডিম খাওয়া উচিত। ডিমকে যত বেশী ফুটানো যায়, সেটা তত বেশী দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে। অত্যধিক ডিম খাওয়ার ফলে মুত্রাশয়ে ইউরিক অ্যাসিড জন্মে ও তার ফলে উরুদেশে বেদনা অনুভূত হয়। একমাত্র ডিম ও দুধ ছাড়া সহজে গ্রহণীয় ক্যালসিয়াম লবণ অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যে বিশেষ নেই।

(খ) নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ-মিশ্রিত জলে ভাল ডিম ডুবে যায়, কিন্তু পচা ডিম অপেক্ষাকৃত হাল্কা হবার দরুণ জলের উপর ভাসতে থাকে।

ভাল ডিমকে আলোর সামনে ধরলে ডিমের মাঝখানটা স্বচ্ছ দেখায়। কিন্তু ডিম খারাপ হলে মাঝখানটা ঘোলা এবং দু-ধার স্বচ্ছ বলে মনে হয়।

উঃ ৩। মানসিক বা শারীরিক উত্তেজনার পর চা পান করলে দেহ অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে। যতদূর জানা যায়, চা-পানের প্রচলন বোধ হয় চীনদেশেই প্রথম হয়েছিল। ভারতবর্ষে আসাম, নীলগিরি, দেরাদুন, দার্জিলিং, হাজারীবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর চায়ের চাষ করা হয়।

চায়ের চাষের জন্যে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, চাষের জমির অবস্থান ও আবহাওয়া। বৃষ্টিবহুল আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া, যে সকল জমির মাটি হাল্কা ও সহজেই চূর্ণীকৃত হয় এবং যেখানে জল দাঁড়াতে পারে না, সেই সকল জমি চা-চাষের উপযোগী।

গাছ থেকে তুলে আনবার পর চায়ের পাতাগুলিকে রোদ ও বাতাসের সংস্পর্শে রেখে দেওয়া হয়। এই সময় একটা প্রারম্ভিক গাঁজানো বা ফারমেনটেশন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার সময়কে দীর্ঘ অথবা কম করে চায়ের গন্ধের পরিবর্তন করা হয়। এভাবে রেখে দেবার কয়েক দিন পরে চায়ের পাতায় বাদামী

রঙের ছোপ ধরে। এরপর চায়ের পাতা সেঁকা হয়। সেঁকবার পর হাতের সাহায্যে পাকিয়ে পাতা থেকে রস নিষ্কাশন করা হয় ও কাঠকয়লার আঁচে পাতাগুলিকে শুকানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে চা-পাতা তৈরি হয়, তার রং কালো। চায়ের পাতার রং সবুজও হতে পারে। গাঁজানোর প্রক্রিয়ার আগে যদি চা-পাতা সেঁকা হয়, তবে চায়ের রং সবুজ হয়।

চায়ের গন্ধের জন্যে ক্যাফিন, ট্যানিন ও অন্য একটি উদ্বায়ী জৈব পদার্থ দায়ী। দেখা গেছে যে, বিভিন্ন চায়ের পাতার ট্যানিনের ধর্ম আলাদা। চায়ের মধ্যে থিন-কফি, গুয়ারানা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান থাকে।

শরীরের উপর চায়ের প্রভাবের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আজও মেলে নি। তবে ক্যাফিন ইত্যাদি পদার্থ থাকবার জন্যে চা শরীরের মধ্যে একটা সাময়িক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

চা-পানে যেমন শরীরের অবসন্নতা দূর হয়, কাজে উৎসাহ বাড়ে, তেমনই অত্যধিক চা-পানের ফলে নিদ্রাহীনতা, স্নায়বিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয়। অত্যধিক ট্যানিন শরীরের মধ্যে গেলে হজমশক্তি কমিয়ে দেয় ও আন্ত্রিক কাজে বিঘ্ন ঘটায় যার ফলে ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়।

শ্যামসুন্দর দে

# বিবিধ

### অ্যাপোলো-১০-এর চন্দ্রলোক যাত্রা এবং যাত্রীদের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

১৮ই মে তিনজন আরোহীসহ অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযান চাঁদের দিকে অভিযান করে।

চাঁদের যে স্থানটিতে ভবিষ্যতে মানুষ পদার্পণ করবে, সেই স্থানটি একবার চোখে দেখবার উদ্দেশ্যে অ্যাপোলো-১০ মহাকাশ যানে চড়ে চন্দ্রলোক অভিযান করেন তিনজন—টমাস. পি ষ্টাফোর্ড, ইউজীন এ. সারনান ও জন ডারিউ ইয়ং।

চাঁদে পদার্পণের একটি পূর্ণাঙ্গ মহড়ার সব কিছু অ্যাপেলো-১০-এর চন্দ্রলোক অভিযানের প্রস্তুতিতে রয়েছে। আগামী ১৮ই জুলাই মহাকাশ-চারী মহাকাশচারী নীল আর্মষ্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডুইন অ্যালড্রিনের অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানে চড়ে চন্দ্রলোকে যাবার এবং চাঁদে পদার্পণের কথা আছে। রকেটের প্রথম পর্যায় জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল, অ্যাপোলো-১০-কে পৃথিবীর আকাশে তুলে দিল। ঠিক এই সময় দ্বিতীয় পর্যায় চালু হলো অ্যাপোলো-১০ পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ সুরু করে।

আড়াই ঘণ্টার পর রকেটের তৃতীয় পর্যায়টি চালু করা হলো। পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন

ছিন্ন করবার জন্যে ঘণ্টায় অন্ততঃ ২৩ হাজার মাইল গতিবেগ চাই।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রকেট স্যাটার্ন-৫-এর সাহায্যে অ্যাপোলো-১০ মহাকাশ-যানে চড়ে মহাকাশচারীত্রয় পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেলেন।

পরবর্তী সংবাদে জানা যায়—সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্র প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করে অ্যাপোলো-১০ ২৬শে মে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে (ভারতীয় সময় রাত্রি ১০টা ২২ মিনিট) প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে অবতরণ করেছে। অ্যাপোলো-১০ মহাকাশযান চন্দ্রলোকে যাত্রা সুরু করবার ঠিক আট দিন পরে উদ্ধারকারী রণতরী প্রিন্সটনের তিন মাইল দূরে মহাকাশযানের ঘণ্টাকৃতি কমাণ্ড ক্যাপস্যুলটি জলে নেমে আসে।

মহাকাশযান জলে নামবার ২৯ মিনিট পরে তার ঢাক্‌নাটি খুলে যায় এবং মহাকাশচারীদের হেলিকপ্টারে তুলে নেওয়া হয়।

## কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ পরিকল্পনা

আগামী অক্টোবরের শেষাশেষি পুণার কাছে আরভিতে ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ ঘাঁটি চালু হলে সমগ্র আন্তর্জাতিক টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় আন্তর্জাতিক টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিগ্রাফ ও বেতার ছবি চমৎকারভাবে পাওয়া যাবে বলে যোগাযোগ বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক টেলিভিশন রিলে করবার ব্যবস্থাও সম্ভব হবে।

উপগ্রহ প্রকল্পে ব্যয় হবে ৭৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে ৩০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারিগরী দিক সম্পর্কে এবং উপগ্রহ ঘাঁটির পরিচালনা ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্যে কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে বৈদেশিক যোগাযোগ বিভাগের এক ইঞ্জিনীয়ার দলকে ক্যানাডায় পাঠানো হয়েছে।

## শুক্রগ্রহ থেকে বেতার-সঙ্কেত

পৃথিবী থেকে সাড়ে পনেরো কোটি মাইল পরিক্রমা শেষে মানব-আরোহীহীন সোভিয়েট মহাকাশ-যান ভেনাস-৫ ১৬ই মে শুক্রগ্রহে পৌঁচেছে, এবং সেখান থেকে বেতার-সঙ্কেত পাঠাতে সুরু করেছে। এই দীর্ঘ পর্যটনে সময় লেগেছে চার মাস।

১৬ই মে বৃটেনের জড্‌রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দির থেকে এই সংবাদ প্রচার করে বলা হয়, মহাকাশ-যানখানা শুক্রের বাষ্পমণ্ডলে প্রবেশ করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ একটি ক্যাপস্যুল শুক্রপৃষ্ঠে নামিয়ে দেয়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৬৪ সালে অক্টোবরে আর একখানা মহাকাশযান শুক্রে নামিয়ে দিয়েছিল—কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে সে কোন বেতার-সঙ্কেতই পাঠাতে পারে নি।

এর আগেই কয়টি মহাকাশযান সেই রহস্য-লোকের দিকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির কোনটি লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে, আবার কোনটি শুক্রের মৃত্তিকা স্পর্শে ভেঙেচুরে খান খান হয়ে গিয়েছে।

দু-বছর আগে একটি আন্তর্গ্রহ মহাকাশ-যান শুক্রের কাছাকাছি পথ দিয়ে যাবার কালে জানিয়ে-ছিল, গ্রহটি অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের দ্বারা প্রায় পুরাপুরি ঢাকা।

বাষ্পমণ্ডলের চাপ হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের ২০ গুণ বেশী। পৃথিবীর চতুর্দিকে যে বিকিরণ বলয় রয়েছে, শুক্রগ্রহে তেমন কিছু নেই। পৃথিবীর মত তার কোন চৌম্বক ক্ষেত্রও নেই।

## শুক্রগ্রহে মহাকাশযান ভেনাস-৬

সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৭ই মে ঘোষণা করেছে, ব্রহ্মাণ্ড বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অবদান হিসাবে গ্রহে-উপগ্রহে বিচরণকারী স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান ভেনাস-৬ পৃথিবী থেকে প্রায় ১৬ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে শুক্রগ্রহে গেছে।

মাসের পর মাস শূন্যলোকের মধ্য দিয়ে ছুটে যাবার কালে ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ শূন্যলোক সম্পর্কে নানা বার্তা পাঠিয়েছে। তারপর শুক্রের বাষ্পমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নামবার কালেও প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তার রাসায়নিক গঠন, বাষ্পের চাপ ও ঘনত্ব সম্পর্কে বার্তা পাঠিয়েছে। ভেনাস-৬ যে স্থানটিতে নেমেছে, তার মাত্র দু-শ' মাইল দূরে ১৬ই মে ভেনাস-৫ নেমেছে।

পৃথিবীর নিকটতম গ্রহে পৃথিবী থেকে প্রেরিত দুটি সক্রিয় যন্ত্রাধারের উপস্থিতি ইতিপূর্বে আর ঘটে নি।

ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ শুক্রগ্রহ থেকে এমন সব তথ্য পাঠাচ্ছে, যেগুলি সংগ্রহ করা অন্য কোন পদ্ধতিতেই সম্ভব ছিল না। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এগুলির মূল্য অপরিসীম। শুক্রগ্রহ এমন উত্তপ্ত এক বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে ডুবে আছে যা ভেদ করে নিষ্প্রাণ যন্ত্রপাতি পাঠানোও কঠিন।

## তারাপুরে পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন

গত ১লা এপ্রিল তারাপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভারতে প্রথম পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। তারাপুর বোম্বাইয়ের ৭০ মাইল উত্তরে।

পণ্ডিত নেহরু এবং ডাঃ হোমি ভাবার স্বপ্ন সফল করে ১লা এপ্রিল রাত্রি ৮-১৫ মিনিটে তারাপুর কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সুরু হয়।

প্রথম ঘণ্টায় বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় প্রায় ১৫ হাজার কিলোওয়াট। ১০ হাজার কিলোওয়াট তারাপুর কেন্দ্রেরই লাগে। বাকী ৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের গ্রিডে চালিয়ে দেওয়া হয়।

## প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে দি অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স একটি ইংরেজী প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। যে কোন ভারতীয় নাগরিক এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। রচনার বিষয়—"দি ন্যাশন্যাল থট্‌স্ ইন সলভিং আনএমপ্লয়মেণ্ট প্রবলেমস্ ইন ইণ্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু টেকনিক্যাল প্রফেশনস"। রচনা ২৫০০ শব্দের মধ্যে টাইপ করে পাঠাতে হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী সমিতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত বিচারক মণ্ডলীর নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের লেখক ২০০ টাকা পুরস্কার পাবেন। রচনাটি অ্যাসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার কোন প্রবেশ মূল্য নেই। রচনা নিম্নলিখিত ঠিকানায় ২৮শে জুনের মধ্যে পাঠাতে হবে। অবৈঃ সম্পাদক, দি অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স। ২৪নং নেতাজী সুভাষ রোড। কলিকাতা-১ ( ফোন নং ২২-৬৭১৪ )

# এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। রামনারায়ণ চক্রবর্তী
ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন
৪, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
কলিকাতা-৩২

২। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বি-৩, সি. আই. টি বিল্ডিংস
৩০, মদন চাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭

৩। শ্রীগদাধর মাহাত
রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম
ডাকঘর—বেলঘরিয়া,
জেলা—২৪ পরগণা

৪। অঞ্জলি চক্রবর্তী
৩১, হরিনাথ দে রোড
ফ্ল্যাট নং এ-৫
কলিকাতা-৯

৫। সমীরকুমার ঘোষ
( পদার্থবিদ্যা বিভাগ )
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
শান্তিনিকেতন, বীরভূম

৬। মৃণালকান্তি ভৌমিক
বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজ
কলিকাতা-৩৭

৭। রমেন দেবনাথ
ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ
পোঃ রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

৮। সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২৮৬, মহারাজা নন্দকুমার রোড (সাউথ)
কলিকাতা-৩৬

৯। উদয় চট্টোপাধ্যায়
ধাতুপ্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ
আই. আই. টি
খড়্গপুর, মেদিনীপুর

১০। উদিতা চৌধুরী
রেণ্ট্যাল ফ্ল্যাট জে-৩
৩৭, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৩৭

১১। সঞ্জীবকুমার ঘোষ
১৩বি, শীল লেন
কলিকাতা-১৫

১২। শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী
২নং লরেন্স স্ট্রীট
পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী

১৩। সুনীল সরকার
B. P. C. Technical School
P. O. Krishnagar
Dist. Nadia

১৪। শ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ ;
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

---

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত